রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত

সুখাসনে সুখাহার

ড. রমেন মজুমদার

যাঁরা যোগাসন করেন তাঁরা জানেন, সুখাসন মানে মেরুদণ্ড সোজা রেখে 'বাবু' হয়ে বসা। এইভাবে বসলে সুখ হয় বলেই সুখাসন। অভিধান বলে, সুখাসন মানে আরামপ্রদ আসন অর্থাৎ যে আসনে বসলে আরাম হয় সেই আসন।

সুখ শব্দের আর-একটি অর্থ তৃপ্তি এবং সুখাহার মানে তৃপ্তিকর আহার। আবার, আহার বলতে সাধারণত খাদ্যই বোঝায়। খাদ্যগ্রহণও বলা যেতে পারে অর্থাৎ খাওয়া।

তাহলে সুখাসনে সুখাহার অর্থ, সহজ কথায় বলা যায়, আরাম করে বসে তৃপ্তি করে খাওয়া।

কিন্তু আরাম করে বসে তৃপ্তি করে খাব কেন?

তারই উত্তর আছে এই গ্রন্থে। তার আগে আছে—বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য চাই, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাদ্য চাই, অকালমৃত্যু আর অবাঞ্ছিত জরা ঠেকিয়ে দীর্ঘদিন সুস্থ সবল নীরোগ কর্মঠ হয়ে বেঁচে থাকতে হলে যে খাদ্য চাই সেই খাদ্য যোগাড় করতে যে বেশি পয়সা লাগে না, লাগে একটু সুস্থ ভাবনা আর একটু সবল জ্ঞান—সেইকথা।

তারও আগে আছে—মানুষের দেহযন্ত্রের বিবরণ আর প্রয়োজন, খাদ্যের ইতিহাস আর প্রকার, কোন্ খাদ্যের কোন্ গুণ, কোন্ খাদ্য কোন্‌ভাবে শরীরের কাজে লাগে আর কেমন করে রোগপ্রতিরোধ ও রোগনিরাময় করে এবং কোন্ খাদ্যের অভাবে কোন্ রোগ শরীরে বাসা বাঁধে। এককথায়, খাদ্যের প্রায় পরিপূর্ণ এক ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থ।

Approved for ISEJ
[illegible]
২৯।৭।৯১

সুখাসনে সুখাহার

ড. রমেন মজুমদার

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশক
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৮৩
দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল, ১৯৯০
তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট, ১৯৯০

প্রচ্ছদ শ্যামদুলাল কুণ্ডু

দাম ৪৫ টাকা

মুদ্রক
শ্রীঅজিত কুমার চৌধুরী
সাধনা প্রেস
৪৫/১এফ বিডন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

আমার মা শ্রীমতী বীণা মজুমদার
শ্রীচরণেষু—

ভূমিকা

'বিজ্ঞান-সাক্ষরতা' (scientific literacy) বলে একটা কথা উঠেছে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ আর-কিছুই নয়, বিজ্ঞান-সচেতনতা। কোনও দেশের বিজ্ঞানের মান কত উঁচু তা পরিমাপ করতে গেলে তার মানদণ্ড হওয়া উচিত সে দেশে কত নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী আছেন তা নয়, বড় বড় যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ কত গবেষণাগার আছে তা-ও নয়—আসল মাপমাঠি হওয়া উচিত সে.দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-সচেতনতা কতখানি আছে তা-ই। একেই বোধ হয় বলা হচ্ছে scientific literacy.

ভারতের মত দেশে আজ বিজ্ঞানের মান বাড়াতে গেলে প্রথম এবং আশু যা প্রয়োজন তা হল এই দেশে বিজ্ঞান-সাক্ষরতা বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া। ডঃ রমেন মজুমদারের লেখা 'সুখাসনে সুখাহার' বইখানি সেইদিকে এক সার্থক পদক্ষেপ। বইখানি পড়বার সময় বারে বারে কেবল এই কথাটাই মনে হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের কাছে খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে কত কঠিন কথা কত সরলভাবে, কত সহজবোধ্য ভাষায় এবং কত ঘরোয়া ভঙ্গিতে গল্পের ছলে বলা যায়।

খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান গত প্রায় একশ বছরে অনেক নতুন তথ্য আমাদের দিয়েছে, কিন্তু খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই সেই তথ্যগুলি জেনেশুনে তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করেছে। এর কারণ যে শুধুই অজ্ঞতা তা কিন্তু নয়। কিছুটা কুসংস্কার আর কিছুটা ভুল ধারণাও এর জন্য দায়ী। তাই খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানের তথ্যগুলি যদি সহজ কথায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে হয়ত এই অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর ভুল ধারণার অবসান হবে। 'সুখাসনে সুখাহার' বইটি সেদিক দিয়েও একটা সার্থক পদক্ষেপ।

আমাদের দেশে মানুষের পুষ্টির মান আজ বেশ নিচে। শুধু খাদ্যাভাবই কি তার জন্য দায়ী ? আমি বলব : না। আমরা অনেকেই জানি না যে, পরিমিত খাদ্যও যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণ করা যায় তাহলেও সম্যক পুষ্টিসাধন হয়। আবার, আজকের পুষ্টিবিজ্ঞানের আর-একটা বিরাট অবদান, metabolic diseases বা বিপাকঘটিত বিভিন্ন রোগ (যার সঠিক ওষুধ খুব বেশি নেই, থাকলেও সে চিকিৎসা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ) খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যায়। পশ্চিমের দেশগুলিতে যেখানে খাদ্যের

অভাব নেই সেখানেও যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে তার কারণ পুষ্টির অভাব বা **undernutrition** নয়, ত্রুটিপূর্ণ পুষ্টি বা **malnutrition** তার জন্য পুরোপুরি দায়ী।

ডঃ মজুমদারের বইটিতে এই বিষয়গুলির উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সহজ ও ঘরোয়া ভঙ্গিতে লেখা বইখানি সকলেরই পড়া দরকার। আমি বিশেষ করে বলছি সেইসব পাঠকপাঠিকাদের, বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের হয়ত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। তাঁদের কাছেই বইখানির প্রকৃত মূল্যায়ন হবে—এবং হচ্ছে যে তার প্রমাণ এই দ্বিতীয় সংস্করণ।

জগৎজীবন ঘোষ
শতবার্ষিকী অধ্যাপক, জীবরসায়ন বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১২ মার্চ, ১৯৯০

প্রকাশকের নিবেদন

বাঙালী আজ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। রোগব্যাধি আর অকাল-বার্ধক্যে তার শরীর জীর্ণ। অফিসে-আদালতে সে ঝিমোয় এবং কাজ করার চেয়ে কথা বলে বেশি। কিন্তু তার গলায় জোর নেই, মনে নেই প্রত্যয়। তার চিন্তায় দৈন্য। একটুতেই তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে, ব্যবহার রুক্ষ হয়, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সহিষ্ণুতা শব্দটির অর্থ সে ভুলেই গেছে।

কিন্তু কেন এমন হল? বাঙালীকে কি আবার সোজা করে তার নিজের পায়ে দাঁড় করানো যায়? জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত তার শরীরে ও মনে আবার বল সঞ্চার করা সম্ভব? সম্ভব তার হৃত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা? প্রতিরোধ্য আর প্রতিকার্য রোগব্যাধি থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে তার অকাল জরা আর মৃত্যু রোধ করা?

খুব কঠিন কিছু না।

খাদ্যই মানুষের জীবনের মূল কথা। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য চাই, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্য চাই। সুস্থ সবল নীরোগ কর্মক্ষম হয়ে বেঁচে থাকতে হলে যে খাদ্য চাই তার ব্যবস্থা করতে বেশি পয়সা লাগে না। লাগে একটু সুস্থ ভাবনা। তার আগে একটু সবল জ্ঞান। সেই জ্ঞানেরই আকর এই গ্রন্থ। এমন গ্রন্থ বাংলায় আর একটিও নেই। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে বলেই বিশ্বাস।

২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮২ — অরুণ পুরকায়স্থ

শ্রীভূমি কর্তৃক প্রকাশিত এই লেখকের

আর-একখানি বই

নলজাতকের উপাখ্যান

(টেস্ট-টিউবে শিশুর জন্মকথা)

দাম ১৫ টাকা

গ্রন্থকারের নিবেদন

স্বাস্থ্য মোটেই আকাশ-কুসুম নয়। আমাদের হাতের নাগালের মধ্যেই আছে তা। হাত বাড়ালেই তাকে ধরা যায়। তবে হাতটা বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, ঠিকমতো জীবনযাপন করে যেমন নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করা যায় তেমনি স্বাস্থ্য রক্ষাও করা যায়। স্বাস্থ্য রক্ষা করার চেয়ে নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করা অনেক বেশি কঠিন; অপুষ্টিজনিত রোগ নিবারণের চেয়ে অপুষ্টিজনিত রোগ সারানো অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই নয়, জীবনধারণের জন্যও সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাদ্য। মানুষ স্বভাবে সর্বভুক, ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু উৎপন্ন হয় তার প্রায় সবই তার ভক্ষ্য। কিন্তু গত সত্তর-আশি বছরে পুষ্টিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে তাতে দেখা গেছে, সুস্থ সবল নীরোগ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য চাই সঠিক খাদ্য। আজ আমরা পুষ্টি সম্বন্ধে যত কথা জেনেছি তাতে একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, যা খেতে ইচ্ছা করে তা খেলেই জীবন চলে যায়। অথচ, আজও কোটি কোটি মানুষ ইচ্ছা দিয়েই স্থির করেন, কী খাবেন আর কী খাবেন না। আহারেচ্ছা দিয়েই তাঁদের আহারনির্বাচন। তাঁরা জানেন না, সুপূর্ণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে সুখোপযোগী স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্য নির্বাচন করা যায় না।

এই গ্রন্থে সেই জ্ঞানেরই অভিমুখে এক শীর্ণ পথরেখা অঙ্কনের চেষ্টা হয়েছে। আর, সে চেষ্টায় উৎসাহ দিয়েছেন শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানির বিজ্ঞানোৎসাহী স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অরুণ পুরকায়স্থ। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীত মুখোপাধ্যায়, এম. সি-এইচ. ই., এম. এন. এস. (কর্নেল), এ. এম. আই. ই., এ. এম. আই. আই. সি-এইচ. ই. এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের শারীরবৃত্ত বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, এম. ডি., ডি. জি. ও.। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের পরামর্শ আমি যথাসাধ্য কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। তবু যদি কোথাও কোনো ভুলত্রুটি থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সে দায় আমার। সেই ভুলত্রুটির প্রতি যদি কেউ পুনর্বার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

এ বই যখন ছাপা শুরু হয় তখন আমি বিদেশে। কোনো বই যখন ছাপা

হয় তখন লেখকেরও কিছু দায়িত্ব থাকে। সে দায়িত্ব পালনের ভার বিদেশ থেকেই আমি চাপিয়েছিলাম কলকাতা দূরদর্শনের বিজ্ঞানবিভাগের প্রযোজক ডঃ অলোক সেনের উপর। অলোক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অত্যধিক ব্যস্ততার মধ্যেও গোড়ার দিকে আমার অনুপস্থিতিকালে এই বইয়ের অনেকটা প্রুফ সে দেখে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কখনও কখনও রাত জেগে বিজ্ঞানের নানা বই ঘেঁটে আমার লেখা মিলিয়ে দেখেছে। অলোকের সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক যে, তাকে আমি ধন্যবাদ দিতে পারি না। তাই সে চিন্তা মনে স্থানও দিচ্ছি না।

পরিশেষে, ছাপাখানার ভূত বড়ো কঠিন জীব। তাকে পুরোপুরি তাড়াতে পারে, এমন সরষে দুর্লভ—বিশেষ করে, আমাদের মাটিতে। মুদ্রাকরের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর ছাপাখানার ভূতটাকে ভিটেছাড়া করা যায় নি, তবে তাকে তাড়িয়ে ভিটের সীমানায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাই মুদ্রণপ্রমাদ খুব কমই চোখে পড়বে। এখানে-ওখানে যে দুটো-একটা চোখে পড়বে তার জন্য 'শুদ্ধিপত্র' যোগ করার দরকার নেই। পাঠক নিজেই তা শুদ্ধ করে নিতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

বড়োদিন, ১৯৮২ রমেন মজুমদার
কলকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

১৯৮৭ সালে এই বইটির জন্য যখন রবীন্দ্রপুরস্কার ঘোষণা করা হয় তখন কর্মোপলক্ষে আবার আমি বিদেশে। বিদেশেই প্রকাশক শ্রীযুক্ত অরুণ পুরকায়স্থ আমাকে জানান, রবীন্দ্রপুরস্কার ঘোষণার পর বইটি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অবিলম্বে বইটির পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন। কিন্তু জ্ঞান ক্রমপ্রসারমাণ, প্রথম মুদ্রণের পর থেকে এই ক'বছরে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি আরও প্রসারিত হয়েছে—সুতরাং পুনর্মুদ্রণ নয়, এই বইয়ের নতুন সংস্করণই ছিল আমার কাম্য।

বছরখানেক পরে দেশে ফিরে সংস্করণের কাজে হাত দিতে গিয়ে দেখি, এই দুরূহ কর্ম সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বইটি 'আউট অভ প্রিন্ট' হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অরুণবাবু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে সময় দিতে রাজী হলেন। আমি সংস্করণের কাজে হাত দিলাম।

এই বইটি এখন প্রকৃত অর্থেই 'সংস্কৃত'। বইটির আমূল সংস্কার করা হয়েছে। পুরনো অধ্যায়গুলির শুধু সংস্কারই নয়, বহু নতুন তথ্য সংযোজনের পর পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে—এবং অনেক নতুন অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরিশিষ্ট-১ পর্যায়ের সমস্ত-অধ্যায়ই নতুন সংযোজন। তাই আগের তুলনায় ছোটো হরফে ছাপা হলেও বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে।

নতুন সংস্করণের বইটির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়ন বিভাগের শতবার্ষিকী অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী শ্রীযুক্ত জগৎজীবন ঘোষ, পি-এইচ. ডি., ডি. এস-সি.। ডঃ ঘোষ আমার গুরুতুল্য সুহৃৎ। অত্যধিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার অনুরোধ স্বীকার করে নিয়ে শুধু যে বইটির পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন এবং বহু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে আমাকে সাহায্য করেছেন তা-ই নয়, বইটির নতুন একটি ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ প্রথম সংস্করণের বইটির পাঠকপাঠিকাদের কাছে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ বইটির সমালোচকদের কাছে যাঁরা আমাকে উদ্দীপিত করেছেন। আর, প্রথমবারের মতো এবারেও বলি, অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কোথাও কোনো ভুলত্রুটি থেকে গিয়ে থাকে, সহৃদয় পাঠক (এবং

পাঠিকা) সেই ভুলত্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

অনেক পাঠকপাঠিকা আমাকে জানিয়েছেন, এই বই পড়ে তাঁরা উপকৃত হয়েছেন। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

মানুষ আজ বুঝতে আরম্ভ করেছে, "Food is the staff of life." তাই অনেকেই এখন খাদ্য সম্পর্কে তাদের বহুকালের ভুল ধারণা সংশোধন করছে। তারা এখন 'eating for health'.

কিন্তু এখনও কোটি কোটি মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে রয়ে গেছে এবং অনেকে অনেক জেনেও কেবল উদরপূর্তি অথবা রসনাতৃপ্তির জন্যই খেয়ে চলেছে। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে আধুনিক খাদ্যবিজ্ঞানের জনক আন্তোয়ান লাভোয়াশিয়ের বলেছিলেন, "People must eat what they need, but in real life they choose what they like." তার কারণ, এফ. ই. ডীথারেজ নামে একজন খ্যাতনামা খাদ্যবিজ্ঞানীর কথা উদ্ধৃত করেই বলি, "Humans are fastidious eaters and what they are willing to cousume depends on esthetics, social customs, and personal opinions about palatability...Man, being a social animal as well as one of habit, has developed many of his customs around the enjoyment of food."

এবং এই বিংশ শতাব্দীর শেষক্ষণেও অনেকের ধারণা, তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব চিকিৎসকদের। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অসামান্য উন্নতির ফলেই মনে হয় পৃথিবীর বহু অংশে এই ধারণা ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। তাই রোগপ্রতিরোধের চেষ্টার চেয়ে রোগনিরাময়ের চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে বেশি। কিন্তু কে তাদের বোঝাবে, স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বটা নিজে নিলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনই হয় না অনেক সময়—এবং 'Cost of treating malnutrition is much higher than its prevention'!

এই বইয়ে এবার সেই প্রিভেনশনের উপরই আরও বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আশা করি, পাঠকপাঠিকারা এবার আরও বেশি উপকৃত হবেন।

রমেন মজুমদার

১৩ মার্চ, ১৯৯০

তৃতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

খুব অল্পসময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের সমস্ত বই শেষ হয়ে গেছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের গ্রন্থগারগুলিতে দেবার জন্য একসঙ্গে প্রচুর বই কিনেছেন। মানুষের শরীরস্বাস্থ্যের প্রতি রাজ্য সরকার যে দৃষ্টি দিতে শুরু করেছেন, এ একটা শুভ লক্ষণ। পাঠকরাও যে সচেতন হয়ে উঠেছেন, এ-ও আশার কথা।

পাঠকদের চাহিদার দিকে তাকিয়ে প্রকাশক আধুনিক মুদ্রণশিল্পের সহায়তায় আশাতীত কম সময়ের মধ্যে বইটির পুনর্মুদ্রণ নয়, আর-একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

এই তৃতীয় সংস্করণও প্রকৃত অর্থেই সংস্করণ। এই সংস্করণেও বইটির কতকগুলি স্থানে সংস্কার করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কিছু নতুন তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে, কতকগুলি নতুন চিত্র সংযোজন করা হয়েছে, কয়েকটি নতুন চার্ট যোগ করা হয়েছে, এমন কি বইটির প্রচ্ছদও বদলে দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই বইটির কলেবর আরও বৃদ্ধি পেয়েছে—এবং সেইসঙ্গে অনিবার্যভাবে মূল্যও।

মূল্যবৃদ্ধির ব্যাপারে বলি, এই দুর্মূল্যের বাজারে প্রকাশকের অবস্থা বিবেচনা করে পাঠকপাঠিকারা তাঁকে মার্জনা করবেন আশা করি।

১৫ আগস্ট, ১৯৯০

রমেন মজুমদার

সুখাসনে সুখাহার

এক : মানুষ আসলে কী

বাইবেলে আছে, "In the beginning God created the heaven and the earth." আরও আছে, "And God said, Let us make man in our image··· So God created man in his own image···"

পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই বলে, ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন ; এই জগৎ, এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর তাবৎ জীবকুল—বৃক্ষ লতা গুল্ম পশু পাখি কীট পতঙ্গ মানুষ সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলে, এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এক মহাবিস্ফোরণের ফলে। বিজ্ঞানীরা সেই মহাবিস্ফোরণের নাম দিয়েছেন 'বিগ ব্যাং'। সেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে।

সেই ১৫০০ কোটি বছর আগে, সেই মহাবিস্ফোরণের আগে কী ছিল কেউ জানে না। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তখন অতি ক্ষুদ্রায়তন এক বিশ্ব ছিল—অবশ্য যদি তাকে বিশ্ব বলা যায়। কত ক্ষুদ্র তার আয়তন তাঁরা চিন্তা করতে পারেন না। আজকের এই মহাবিশ্বে আমরা যত তেজ আর যত পদার্থ দেখি তার সবই ঐ ক্ষুদ্রবিশ্বের মধ্যে ঘন সন্নিবদ্ধ ছিল।

কতদিন কতযুগ এইভাবে কেটেছিল, হিসাব পাওয়া যায় না। তারপর অকস্মাৎ ঐ বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণে যেমন বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা সৃষ্টি হয়েছিল (বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন, fundamental constituents of all fundamental particles of nature) তেমনি ক্ষুদ্রবিশ্ব প্রসারিত হয়েছিল। সেই প্রসার আজও থামে নি। আজও সমানে এই বিশ্ব প্রসারিত হয়ে চলেছে।

বিস্ফোরণের পর প্রায় $১০^{-৪৫}$ সেকেণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ একের পর পঁয়তাল্লিশটা শূন্য দিলে যত কোটি হয়, এক সেকেণ্ডকে তত কোটি ভাগে ভাগ করে তার একভাগ নিলে যে সময় হয় সেই সময়ের মধ্যে সমস্ত কিছু চূড়ান্ত সীমায় প্রসারিত হয়েছিল। সেই $১০^{-৪৫}$ সেকেণ্ডের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু করে জানতে আরম্ভ করেছেন।

বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, বর্তমান বিশ্ব সৃষ্টির জন্য যা-কিছু ঘটা দরকার সবই ঘটে গিয়েছিল বিস্ফোরণের পর মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে। বিস্ফোরণের পর

প্রথম তিন মিনিটের মধ্যে যা ঘটেছিল, পরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোটা ইতিহাসে আর কখনও তা ঘটে নি। আজকের বিশ্বে আমরা যা-কিছু দেখি তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তখন।

বিস্ফোরণের প্রায় এক কোটি বছর পরে প্রোটো-স্যুপারগ্যালাকসি আর প্রোটো-গ্যালাকসি তৈরি হতে শুরু করেছিল।

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে। পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে তখন হাইড্রোজেনের আধিক্য, পৃথিবী তখন ডুবে আছে অতিবেগুনী রশ্মির সাগরে, তার আকাশে তখন ঘন ঘন প্রচণ্ড তড়িৎমোক্ষণ অর্থাৎ ইলেকট্রিক ডিসচার্জ। তারপর আস্তে আস্তে পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হল।

পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি বছর ধরে নানা কণিকার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল নানারকম পরমাণু, তারপর নানারকম অণু। সেই অণু ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হল। তারপর একসময় সৃষ্টি হল এককোষী জীব। সহজ তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, সরল তার আচার-আচরণ আর অবয়ব।

সেই প্রথম এককোষী জীব থেকে কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই বহুকোষী জীবের সৃষ্টি। জীব বলতে যার জীবন আছে, যেমন উদ্ভিদ আর প্রাণী।

আজ থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে এককোষী জীবের সৃষ্টি। জীবসৃষ্টির পর জীবজগৎ ক্রমে ক্রমে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেল—একটি উদ্ভিদ-জগৎ আর একটি প্রাণিজগৎ। কিন্তু বিবর্তনের গোটা ইতিহাসে দুই জগতের সীমানায় অধিক্রমণও ঘটেছে বার বার, ইংরেজীতে যাকে ওভারল্যাপিং বলে তা-ই ঘটেছে। অর্থাৎ, সুস্পষ্টভাবে উদ্ভিদও না আবার প্রাণীও না এমন জীবও সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাণিজগতে বিবর্তনের ধারায় সবশেষে এসেছে মানুষ। মানুষ একবারে আসে নি, বিবর্তনের ধারায় সেই প্রথম এককোষী জীবের রূপান্তর ঘটতে ঘটতে একেবারে শেষে মানুষের আবির্ভাব। রূপান্তরের ধারায় আজ থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর আগে মানুষকে প্রথম মানুষ বলে চেনা গেছে। মানুষ তখনও অরণ্যচারী পশুশিকারী।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রাণিজগতে বিবর্তনের ধারায় মানুষ সবার শেষে এলেও

সবার চেয়ে উন্নত প্রাণী। অর্থাৎ, ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মানুষ সর্বশেষ প্রাণী এবং প্রাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ।

কিন্তু মানুষ কাকে বলে, এই প্রশ্নের সহজ উত্তর আজও কোনো মানুষের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হয় নি।

প্রকৃতিতে প্রাণিকুলে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষ আসলে কী? যুগ যুগ ধরে এই প্রশ্ন মানুষকেই ব্যতিব্যস্ত করেছে। দার্শনিক আর ধর্মশাস্ত্রবেত্তারা এ নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছেন। শারীরবিজ্ঞানীরা মানুষের দেহ ছিঁড়েখুঁড়ে দেখতে চেয়েছেন কী দিয়ে এ দেহ তৈরি। সমাজবিজ্ঞানীরা মানুষকে সর্বপ্রকারে বিশ্লেষণ করে জানতে চেষ্টা করেছেন তার স্বভাবচরিত্র কেন এমন। অধ্যাপকেরা গভীর অধ্যবসায়ে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন কীকরে মানুষ কিছু শেখে, কিছু বোঝে, কিছু জানে। কিন্তু সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট সুপূর্ণ উত্তর আজও মেলে নি। মানুষ আজও মানুষেরই কাছে দুর্জ্ঞেয়।

বিবর্তনের পথে মানুষের চরিত্র বদলেছে, প্রকৃতি বদলেছে, বৈশিষ্ট্য বদলেছে —কিন্তু তার শারীরবৃত্ত রয়েছে অপরিবর্তিত। মানুষ বেঁচে আছে, কেন আছে কেউ জানে না। এই বেঁচে থাকার মূলে আছে খাদ্য। গুণে মানে প্রকৃতিতে খাদ্য আছে বহুতর এবং বিচিত্রতর। বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমূল্যও বিভিন্ন। আদিম-কালের মানুষ খাদ্যাখাদ্যের বিচার বড়ো একটা করে নি, যা পেয়েছে তা-ই খেয়েছে। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যেও এসেছে বিবর্তন। মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে, পরীক্ষানিরীক্ষা দিয়ে বুঝতে পেরেছে, কোন্‌টা খাদ্য আর কোন্‌টা অখাদ্য, অথবা কোন্‌টা সুখাদ্য আর কোন্‌টা কুখাদ্য —এবং খাদ্যের বিভিন্নতা কোথায়। অভিজ্ঞতাই তাকে বলে দিয়েছে, স্বাস্থ্যের জন্য কোন্ খাদ্য তার প্রয়োজন আর কোন্ খাদ্য নয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মানুষ জানত না, কোন্ খাদ্যে কোন্ গুণ এবং কীভাবে তা শরীরের অতি বিচিত্র, অতি জটিল কর্মপ্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

মানুষের জিজ্ঞাসু মন সব সময়েই সব বিষয়েই প্রশ্ন করেছে: 'এটা কী?' 'এটা কেন?' 'কীভাবে এটা হল?' খাদ্যের ব্যাপারে এইসব প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে সে যা পেয়েছে, সাজিয়ে-গুছিয়ে তা দাঁড় করালে এক আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ইতিহাস পাওয়া যায়। সে বিজ্ঞান পুষ্টিবিজ্ঞান।

আমরা যে খাদ্য খাই এবং যেভাবে তা শরীরে ব্যবহৃত হয়, এককথায় তাকেই পুষ্টি বলা যায়। আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন বেঁচে থাকার জন্য,

শরীরের বৃদ্ধির জন্য, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, মন ও বুদ্ধির বিকাশের জন্য এবং কাজকর্ম আর খেলাধুলার শক্তি পাবার জন্য।

স্বাস্থ্যরক্ষা আর শরীরের বৃদ্ধির জন্য যে বিভিন্ন পুষ্টিকর পদার্থ দরকার তা দিয়েই আমাদের খাদ্য তৈরি। খাদ্যের মাধ্যমেই শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টিকর পদার্থ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন সমবায়ের খাদ্য একটা সুষম খাদ্যের রূপ নিতে পারে। সাধারণত কোনো একটি খাদ্যেই পূর্ণবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টিকর পদার্থ থাকে না। শরীরে প্রতিটি পুষ্টিকর পদার্থেরই কতকগুলি করে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন আছে এবং অধিকাংশ পুষ্টিকর পদার্থের ক্ষেত্রেই ভালো ফল পাওয়া যায় যদি সেগুলি আলাদা আলাদাভাবে না খেয়ে একসঙ্গে খাওয়া যায়।

সারা জীবন ধরে প্রত্যেক মানুষেরই একই ধরনের পুষ্টিকর পদার্থ প্রয়োজন, কিন্তু বিভিন্ন পরিমাণে। বয়সভেদে, নারীপুরুষভেদে, আকারভেদে, কাজকর্ম আর স্বাস্থ্যের তারতম্য অনুসারে সেই পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

খাদ্য যেভাবে উৎপন্ন করা হয়, সংরক্ষণ করা হয় এবং রান্না করা হয় তার উপর পুষ্টির হেরফের খানিকটা নির্ভর করে। খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ এবং কোন্ খাদ্য শরীরের পক্ষে নিরাপদ তা-ও অনেকখানি এই বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি পুষ্টিকর পদার্থেরই একটি সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন আছে। অনেক ক্ষেত্রে সে গঠন বেশ জটিল। তবে গঠন যা-ই হোক না কেন, শরীরের মধ্যে সমস্ত পুষ্টিকর পদার্থেরই অতি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়।

মানুষের দেহটাকে যদি রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, এই দেহ গঠিত হয়েছে বিবিধ উপাদানে, যেমন কার্বন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন অকসিজেন ক্যালসিয়ম ফসফরস ম্যাগনেসিয়ম সালফার সোডিয়ম পটাসিয়ম ম্যাঙ্গানীজ সিলিকন লোহা তামা দস্তা সীসা লিথিয়ম কোবল্ট মলিব-ডেনাম সেলেনিয়ম প্রভৃতি। এইসব রাসায়নিক পদার্থের অধিকাংশই সংযুক্ত হয়ে দু'জাতীয় যৌগ গঠন করে—অজৈব যৌগ আর জৈব যৌগ। অজৈব যৌগ হচ্ছে খনিজ যৌগ আর জৈব যৌগ হল কার্বন যৌগ। মানুষের শরীরে এইসব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে লোহা তামা কোবল্ট আয়োডিন ফ্লুরিন দস্তা ম্যাঙ্গানীজ মলিবডেনাম সেলেনিয়ম ইত্যাদি থাকে নামেমাত্র অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণে। কিন্তু তাদের প্রয়োজন অসামান্য। মানুষের শরীরে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য।

ঐ যে অজৈব যৌগের কথা বলেছি, ঐ অজৈব যৌগগুলি শরীরের মধ্যে থাকে অ্যাসিড, অ্যালক্যালি ও লবণের আকারে, যেমন—পাচক-রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাড়ে ক্যালসিয়ম ফসফেট (লবণ), প্রস্রাবে অ্যামোনিয়া (অ্যালক্যালি) প্রভৃতি।

জৈব যৌগ দু প্রকার—নাইট্রোজেন জাতীয় ও অ-নাইট্রোজেন জাতীয়। নাইট্রোজেন জাতীয় যৌগ বলতে প্রোটিন আর অ-নাইট্রোজেন জাতীয় যৌগ বলতে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট।

এইসব অজৈব ও জৈব যৌগ দিয়েই মানুষের শরীর গঠিত। এইসব যৌগ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে খাদ্যের মাধ্যমে। খাদ্য উপযুক্ত যৌগে পরিবর্তিত হয় পরিপাকক্রিয়ার সাহায্যে। তারপর তা রক্তধারায় প্রবেশ করে। রক্তই তা বহন করে দেহের সমস্ত কোষে পৌঁছে দেয়।

সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কাজ এবং রক্তপ্রবহণ, শ্বসন প্রভৃতি জীবন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যাবতীয় কর্ম সজ্ঘটিত হয় দেহের ক্ষতিসাধন করে, দেহের টিস্যুতে যে বিভিন্ন যৌগ আছে তার অকসিডেশন অর্থাৎ ধীর-দহন ঘটিয়ে। কাজের জন্য যে তাপ আর শক্তির প্রয়োজন তা উৎপন্ন হয় এই ধীর-দহন থেকে। ধীর-দহনের দরুন সৃষ্ট হয় জল, কার্বন ডাই-অকসাইড, ইউরিয়া প্রভৃতি সরল যৌগ। ঘাম, নিশ্বাস, মল আর প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়, কার্বন ডাই-অকসাইড বার হয় নিশ্বাসের সঙ্গে আর ইউরিয়া প্রস্রাবের সঙ্গে। এইভাবে সারা জীবন ধরে শরীরের বৃদ্ধি হয়, দহন হয়, ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হয়—এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্য, জল আর বাতাস।

মানুষের দেহও এই তিনটি জিনিস দিয়ে তৈরি—বাতাস, জল আর খাদ্য। আমাদের শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, 'পঞ্চমহাভূতশরীরিসমবায় পুরুষ ইত্যুচ্যতে'। এই পঞ্চমহাভূত হল—জল বায়ু মাটি তেজ ও আকাশ। বিজ্ঞানীদের কথার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের কথার বিশেষ পার্থক্য নেই। বাতাস আর জল ঠিকই আছে, খাদ্য প্রস্তুত হয় মাটিতে এবং তাতে আকাশ থেকে আগত তেজের প্রয়োজন হয়।

বহু ক্ষুদ্র প্রাণীর মৃতদেহ রাসায়নিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু তার ফলাফল মানুষের ক্ষেত্রে সর্বথা প্রয়োজ্য হয় নি। মানুষের মৃতদেহের পূর্ণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ একটা বিরাট ব্যাপার। তবু তা-ও করা হয়েছে অনেক, কিন্তু বয়স ও নারীপুরুষ ভেদে যত করা দরকার ছিল, করা যায় নি। তা সত্ত্বেও

মোটামুটিভাবে বলা যায়, ৬৫ কিলোগ্র্যাম ওজনের একজন সাধারণ মানুষের দেহে আছে—

প্রোটিন	১১	কিলোগ্র্যাম	১৭·০%
ফ্যাট	৯	কিলোগ্র্যাম	১৩·৮%
কার্বোহাইড্রেট	১	কিলোগ্র্যাম	১·৫%
জল	৪০	কিলোগ্র্যাম	৬১·৬%
খনিজ পদার্থ	৪	কিলোগ্র্যাম	৬·১%

খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়ম ১·৫%, ফসফরস ১%, ম্যাগনেসিয়ম ০·০৫%, লোহা ০·০০৪%, আয়োডিন ০·০০০০৪% এবং তামা ম্যাঙ্গানীজ দস্তা ফ্লুরিন মলিবডেনাম ইত্যাদি নামেমাত্র।

এই যে প্রোটিন ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট জল আর খনিজ পদার্থ, এর সবটাই মানুষের শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নয়। একটা অংশ রিজার্ভ বা মজুত ভাণ্ডার হিসাবে শরীরে জমা থাকে যাতে ভবিষ্যতে দরকারের সময় ব্যবহার করা যায়। ঐ যে শরীরে ৯ কিলোগ্র্যাম চর্বি আছে তার মধ্যে খুব বেশি হলে ১ কিলোগ্র্যাম শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক, বাকি ৮ কিলোগ্র্যাম মজুত থাকে, দরকারের সময় কাজে লাগে। যত মোটা মানুষ তত মজুত চর্বি। দেহের ওজনের শতকরা ৭০ ভাগও চর্বি হতে পারে।

প্রোটিনের অধিকাংশই কোষের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান, তবু শরীরের বড়ো রকমের কোনো ক্ষতি না ঘটিয়ে ২ কিলোগ্র্যাম মতো প্রোটিন অপচয় হতে দেওয়া যেতে পারে। কার্বোহাইড্রেট অপচয় হতে দেওয়া যেতে পারে খুব বেশি হলে ২০০ গ্র্যাম। অনাহারের সময় কার্বোহাইড্রেটের ক্ষয়-হতে-থাকা ভাণ্ডার অবিরাম পূর্ণ হতে থাকে—এবং তা হয় মজুত প্রোটিন আর চর্বির সংশ্লেষণ থেকে। শরীরে কার্বোহাইড্রেটের চেয়ে প্রোটিন আর চর্বির মজুত ভাণ্ডারই বেশি।

শরীরে মোট যত জল থাকে তার ১০ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হতে দেওয়া যেতে পারে এবং খনিজ পদার্থ নষ্ট হতে দেওয়া যেতে পারে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ। তাতে শরীরের সাঙ্ঘাতিক রকমের কোনো ক্ষতি হবে না।

বাড়ি তৈরি করতে যেমন ইট কাঠ লোহা পাথর সিমেণ্ট বালি প্রভৃতি লাগে এবং নির্ভেজাল আর সঠিক পরিমাণ জিনিস দিয়ে বাড়ি তৈরি করে ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করলে সেই বাড়ি যেমন অনেকদিন ভালোভাবে টেকে, মানুষের দেহের বেলায়ও তা-ই। মানুষের দেহের উপাদান—বাতাস, জল আর খাদ্য।

এই উপাদানগুলি যদি ঠিকমতো নির্বাচন করা হয় এবং ঠিকমতো ব্যবহার করা হয় তাহলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করা কঠিন কিছু না।

স্বাস্থ্য আর রোগ জীবনের দুই বিপরীত দশা। কোনোটাই অকস্মাৎ আসে না। যাঁরা জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে সম্ভবমতো প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলেন তাঁরাই স্বাস্থ্যের অধিকারী হন আর যাঁরা জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির নিয়ম না মেনে শরীরের তানলয় নষ্ট করেন তাঁরা রোগব্যাধির শিকার হন।

স্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড়ো অপহারক বেঠিক খাদ্য। অতিভোজন স্বাস্থ্যের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। প্রতিদিন আমাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য দরকার। সেই খাদ্য আমাদের শরীরের পুষ্টিবিধান করে, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে। যদি আমরা সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি খাই এবং কোন্ খাদ্যের সঙ্গে কোন্ খাদ্যের অমিল তা না জানি তাহলে তা সুখের বদলে অসুখের কারণ হয়। অসুখ আসলে অ-সুখ অর্থাৎ সুখের অভাব। ইংরেজী disease-কেও এইভাবে লেখা যায় dis-ease, অর্থাৎ a lack of ease.

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস বলেছিলেন, "Old persons need less fuel (food) than the young." এই প্রাচীন সত্যটি অনেকে বোঝেন না বলে কষ্ট পান। হিপোক্রেটিস আরও বলেছিলেন, "In winter abundant nourishment is wholesome ; in summer a more frugal diet." এ সত্য চিরন্তন। হিপোক্রেটিসের আর-একটি কথা, "Complete abstinence often acts very well if the strength of the patient can in any way maintain it." উপবাসের পূজারী ভারতকে একথা বলে বোঝাতে হয় না। হিপোক্রেটিস বুঝিয়েছিলেন, "Natural powers are the healers of disease." কিন্তু আজকের মানুষ একথা বড়ো একটা বোঝে না। রোমের পতনের পর একথা মানুষ ভুলে গেছে।

তবে কখনও-সখনও যে মনে করে নি তা অবশ্য নয়। ১১০১ সালে সালের্নোর মেডিক্যাল স্কুল থেকে 'উইলিয়ম দি কঙ্কারার'-এর পুত্র রবার্টকে যে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়েছিল তা আজও স্মরণীয়—

Salerno's school in conclave high unites
To counsel England's king and thus indites :
If thou to health and vigor wouldst attain,
Shun mighty cares, all anger deem profane ;

From heavy suppers and much wine abstain ;
Nor trivial count it after pompous fare
To rise from table and to take the air.
Shun idle noonday slumbers, nor delay
The urgent calls of nature to obey.
These rules if thou wilt follow to the end,
Thy life to greater length thou may'st extend.

শুধু খেলেই হয় না, খাওয়ার পর উদরে যা অবশিষ্ট থাকে, যা বর্জনীয় হয় তা নিয়মিত বার করে দিতে হয়। না হলে সেই সুখের বদলে অসুখ। অনেক অসুখের কারণই কোষ্ঠকাঠিন্য। সুতরাং নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা দরকার। কোষ্ঠে বর্জ্য হিসাবে যা থাকে তা আসলে অপ্রয়োজনীয় খাদ্যাবশেষ ও অন্ত্র থেকে ক্ষরিত কিছু পদার্থ।

দুই : স্বাস্থ্য ধরাছোঁয়া যায় না

বহুকালের ধারণা, মানুষের আয়ু তিন কুড়ি দশ অর্থাৎ ৭০ বছর। কিন্তু কিছু লোক তার চেয়েও বেশি বাঁচে। অস্ট্রেলিয়ার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং গবেষক ডঃ আর্থার এভরিট ১৯৮৭ সালের শেষদিকে বলেছেন, ইচ্ছা করলে মানুষ ১২০ বছর কি তারও বেশি বাঁচতে পারে। মানুষের স্বাভাবিক জীবনকাল ১১০ থেকে ১২০ বছর। মানুষ এতদিন যে বাঁচে না তার প্রধান কারণ অতিভোজন। মানুষ যদি তার আহারের পরিমাণ কমায় তাহলে ১২০ বছরেরও বেশি বাঁচতে পারে।

ডঃ এভরিট বলেছেন বটে মানুষের কথা, কিন্তু গবেষণা করেছেন ইঁদুরের উপর। ইঁদুরের উপর গবেষণা করে তিনি দেখেছেন, খাদ্যের পরিমাণ অর্ধেক কমালে বার্ধক্যের হার এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়। মানুষের উপর তিনি যে পরীক্ষা করতে পারেন নি তার কারণ মানুষ এত কম খেতে রাজী নয়।

যা-ই হোক, মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকালে ৭০, ৮০, ৯০, এমন কি ১০০ বছর অথবা তারও বেশি আয়ুর মানুষের সন্ধান মিলবে অনেক জায়গায়। মানুষের আয়ুষ্কাল আগেও যা ছিল, এখন এই আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের যুগেও প্রায় তা-ই আছে। বড়ো একটা বাড়ে নি। বাড়াবার অভিপ্রায়ও নেই, তাই চেষ্টাও নেই। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে উন্নততর খাদ্যের গুণে এবং রোগমহামারীর কবল থেকে মুক্ত হবার উপায় উদ্ভাবিত হবার ফলে বহু মানুষ অকালমৃত্যুর হাত এড়িয়ে পূর্ণবয়সের দ্বারে পৌঁছতে পারছেন, জরার পথ আটকে অধিক বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকতে পারছেন।

মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করার প্রত্যক্ষ কোনো লক্ষ্যই আধুনিক বিজ্ঞানীদের নেই। যদি কেউ সে লক্ষ্যের দিকে তাকান তাহলে তাঁকে হয়তো পৌরাণিক যুগের অমৃতধারার সন্ধান করতে হবে। তবে সে সন্ধান মিলবে কিনা, মিললে কবে মিলবে কেউ জানে না। সুতরাং যতদিন বাঁচি, স্বাস্থ্য বজায় রেখে যাতে বাঁচতে পারি সেই চেষ্টাই করতে হবে।

স্বাস্থ্য কী এককথায় বলা কঠিন। তবে সহজ করে বলা যায়, স্বাস্থ্য যতক্ষণ থাকে টের পাওয়া যায় না, চলে গেলেই হাড়ে হাড়ে মালুম দেয়। ব্যাখ্যা করে

বলা যেতে পারে, স্বাস্থ্য এমন একটা জিনিস যা ধরাছোঁয়া যায় না এবং যা না থাকলে শরীরমন স্বচ্ছন্দে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না। স্বাস্থ্যবান মানুষ যতক্ষণ-না তার দেহের কোনো অংশকে কাজে লাগাতে চায় ততক্ষণ তার দেহসচেতনতা থাকে না। তার মনের উপর কোনো চাপ না, টান না।

ঐ যে ধরাছোঁয়া যায় না জিনিসটা, সেটা আমরা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। খাদ্যের সাহায্যে পারি বেশ খানিকটা। স্বাস্থ্যের জন্যই চাই পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু ডঃ টি এ লয়েড ডেভিস বলেছেন, "Health has little to do with freedom from hunger, pain or unhappiness so feared by man." আবার ১৭৫৫ সালে ডঃ জনসন তাঁর ইংরেজী অভিধানে লিখেছেন, 'health is the state of being hale, sound or whole, or freedom from sickness, pain or disease.' অর্থাৎ, 'welfare of mind, moral wellbeing, a state of salvation, purity, goodness or Divine Grace.' অতি আধুনিককালে, ১৯৪৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity.'

স্বাস্থ্য অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে, যেমন—খাদ্য, বংশগতি, জলবায়ু, পরিবেশ, পরিশ্রম প্রভৃতি। এর মধ্যে খাদ্যই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কথাটা বহুকাল থেকে জানা থাকলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে প্রথম প্রমাণ করেন সার্ রবার্ট ম্যাকক্যারিসন, ১৯২০-র দশকে। সার্ রবার্টের পরীক্ষাস্থল ছিল ভারত।

ভারত এক বিশাল দেশ। এখানে বহু জাতির বাস। এখানকার মানুষের শারীরিক গঠনে যেমন বৈষম্য তেমনি শারীরিক শক্তি বা কর্মশক্তির ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা। পাঠান আর শিখরা দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান। বাঙালীরা নাতিদীর্ঘ, শীর্ণকায়। দক্ষিণ ভারতীয়রা কিঞ্চিৎ খর্বদেহী। মারোয়াড়ীরা স্থূলদেহী, খর্বকায়। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের গোর্খারা অতি খর্বকায় হলেও তাদের দেহ সুগঠিত ও বলশালী।

এই প্রকারভেদের কারণ কী? জাতি, জীবনধারণপ্রণালী, জলবায়ু—কোন্‌টা? সার্ রবার্ট উতলা হয়ে উঠলেন। কারণ অনুসন্ধানে পরীক্ষা শুরু করে দিলেন।

সার্ রবার্ট একই বর্গের ১২টি ইঁদুর নিলেন। একই বয়সের, একই আকৃতির,

একই রকম স্বাস্থ্যের। দুটি দুটি করে ছটি ভাগে ভাগ করে তাদের তিনি একই জলবায়ুতে একই পরিবেশে রাখলেন। তাদের সব কিছুই হল এক, শুধু খাদ্য আলাদা। এক-একজোড়া ইঁদুরকে ভারতের এক-একজাতির খাদ্য খেতে দিলেন। একজোড়াকে দিলেন দক্ষিণ ভারতের খাদ্য—আতপ চালের ভাত, কারি আর রসুন। মাঝে মাছে একটু ডিম আর মাছ। দুধ না, শাকসবজি না। আর-একজোড়াকে এই একই খাদ্য দিয়ে তার সঙ্গে যোগ করলেন কিছু তেল, মসলা, শুকনো মাছ আর শর্করা। অন্য একজোড়াকে দিলেন উত্তর ভারতের খাদ্য—হাতে-গড়া রুটি, ডাল, কাঁচা এবং রান্না-করা শাকসবজি, মটরশুঁটি, ফল আর মাঝে-সাঝে একটু-আধটু দুধ ও ঘি।

মাস কয়েক পরে দেখা গেল, ছ জোড়া ইঁদুর আকারে-প্রকারে সম্পূর্ণ আলাদা হয়েছে। কতকগুলি বেশ বড়োসড়ো মোটাসোটা, জায়গায় জায়গায় খানিকটা জায়গা জুড়ে রুক্ষ ধূসর লোম; আবার কতকগুলি রোগাপাতলা, নিস্তেজ। এই দু দলই বেঁচে ছিল অল্পদিন, তাদের বাচ্চাও হয়েছিল সংখ্যায় কম। আবার, কতকগুলি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সারা গায়ে সমানভাবে মসৃণ চিক্কণ লোম। অসংখ্য সন্তানসন্ততি তাদের। তাদের খাদ্য ছিল উত্তর ভারতের মানুষের খাদ্য।

সার্ রবার্টের এই পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল, স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি আর শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে খাদ্যের ভূমিকাই সর্বাধিক। ইঁদুরগুলি প্রমাণ করে দিল, বংশগতি এক হলেও এবং একই জলবায়ুতে একই পরিবেশে বাস করলেও খাদ্যের কারণে শরীরস্বাস্থ্যে বিভিন্নতা আসতে পারে।

সুস্বাস্থ্য কেবল অ-রোগে অ-শোকে নয়, শারীরিক ও মানসিক শ্রীসাধনেও—এবং এই সুস্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে কী খাব আর কী খাব না তার উপর।

রামবাবু কি শ্যামবাবু অমুক খাদ্য খেয়ে দিব্যি আছেন, সুতরাং আমি কেন থাকব না?—এ যুক্তি মূর্খের যুক্তি। স্বাস্থ্য রাখতে চাইলে জানতে হবে, আমাদের সকলের ক্ষমতা আর অক্ষমতা সমান নয়। সব মানুষই মূলত এক, কিন্তু আলাদা আলাদা করে দেখলে পার্থক্য অনেক: "Fundamentally, human beings are alike, but individually they vary greatly."

তিন : খাদ্য শুধুই খাদ্য নয়

এঞ্জিন চালাতে যেমন কয়লা ও জলের দরকার তেমনি আমাদের দেহ সচল রাখতে চাই খাদ্য ও জল। খাদ্য থেকেই আমাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি। অর্থাৎ, জীবকোষের ক্ষয়পূরণ ও নতুন জীবকোষ সৃষ্টি করে খাদ্য, আর তার ফলেই আমাদের শরীরে উত্তাপ, কর্মশক্তি ও রোগপ্রতিরোধক্ষমতা জন্মায়। এক-কথায়, বেঁচে থেকে জৈবকর্ম সম্পাদন করার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না।

যদিও কিছু লোক 'খাওয়ার জন্য বাঁচে', বেশির ভাগ লোকই 'বাঁচার জন্য খায়'। বাঁচতে হলে খেতেই হবে। কিন্তু খাদ্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনই নয় শুধু, তাকে ছাড়িয়ে আরও কিছু। বার্চ, স্পেন্সার এবং ক্যামেরন যথার্থই বলেছেন, "Food is not just a basic necessity of life ; it is something that is woven into the fabric of life in many different ways and it has great significance apart from its food value. Eating is not just a nutritional exercise ; it is a social occupation and it forms an indispensable part of hospitality in all parts of the world. We may or may not subscribe to the Indian belief that food cooked with love tastes better than food cooked with indifference, but we recognize that emotional forces do play a part in our attitude to food."

একথার প্রমাণ পাই যখন আমরা দেখি, মা তাঁর সন্তানকে খাইয়ে আনন্দ পান এবং অনেক সময় বেশি খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন। বাড়িতে যতই দাসদাসী আর সূপকার থাক, স্ত্রী মাঝে মাঝে নিজের হাতে রান্না করে স্বামীকে খাওয়াতে চান। গৃহে অতিথি এলে আমরা তাঁকে চা-জলখাবার খেতে দিই। আবার, কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে সাধ্যমতো চেষ্টা করি, উৎকৃষ্ট খাদ্যে তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে। অনেক সময় সাধ্যাতিরিক্তও চেষ্টা করি এবং কখনও কখনও তার জন্য ধারদেনাও হয়ে যায়। দেবতার ভোগ সুগন্ধ সুখাদ্য, এ তো আমাদের নিত্যদিনের দেখা। যত বড়ো দরিদ্রই হোক, দেবতার ভোগে কার্পণ্য থাকে না।

সুতরাং খাদ্য শুধুই খাদ্য নয়, তাকে ছাড়িয়ে আরও কিছু।

কোনো দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সে দেশের অগ্রগতির অবস্থা আন্দাজ করা যায়। যে দেশের অর্ধেক মানুষ আধপেটা খেয়ে দিন কাটায় সে দেশের উন্নতি আশা করা যায় না। এ একটা অদৃষ্টের পরিহাস যে, মানবেতিহাসের এই উত্তুঙ্গ সাফল্যের দিনে পৃথিবীর প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে গড়ে একজন অনাহারে অপুষ্টিতে দিন কাটায়। অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলিতেই এই সমস্যা বেশি।

অস্বাস্থ্য বা অপুষ্টি কদাচিৎ একা চলে। তার সহযাত্রী জনস্ফীতি, দারিদ্র্য, কম উৎপাদন, অজ্ঞতা আর কুসংস্কার। অস্বাস্থ্য আর অপুষ্টি উৎপাদনবৃদ্ধির পথে বাধা, আবার এই কম উৎপাদনের পরিণতি দারিদ্র্য। অপুষ্টিই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। অপুষ্টি সকল দিক থেকেই এক নির্মম অভিশাপ। এই অভিশাপ সম্বন্ধে রবার্ট ম্যাকনামারা বলেছিলেন, "Malnutrition saps energy, stunts the body and slows the mind."

অপুষ্টির অভিশাপ সম্বন্ধে এককথায় এর চেয়ে ভালো সংজ্ঞা আর দেওয়া যায় না।

কিন্তু অপুষ্টি আসলে কী? সাধারণভাবে বলা যায়, পুষ্টিদ্রব্যের ঘোরতর অসমতার দরুন শরীরে যে ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই অপুষ্টি এবং পুষ্টিদ্রব্যের ন্যূনতার জন্য যেমন অপুষ্টি ঘটতে পারে তেমনি আধিক্যের জন্যও পারে। উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, "Technically, malnutrition is defined as a pathological state resulting from a relative or absolute deficiency or excess of one or more of essential nutrients (Jelliffe, 1966)."

অপুষ্টির কুফল অস্বাস্থ্য আর রোগব্যাধি—এবং অন্তিমে মৃত্যু। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, আমাদের দেশে অত্যধিক সংখ্যায় শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর একটা বড়ো কারণ অপুষ্টি। সুইডেনে প্রতি এক লক্ষে প্রসূতিমৃত্যু ১৯·৬, ইংল্যাণ্ড আর ওয়েলসে ২৫·৯, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩৩·১ আর ভারতে ২৫২। প্রসূতিমৃত্যু অপুষ্টির অভিশাপের একটা খণ্ডাংশ মাত্র। অপুষ্ট মাতা তাঁর গর্ভের সন্তানদেহেও অপুষ্টি সঞ্চার করেন। গর্ভাবস্থার শেষপাদে প্রসূতির অপুষ্টিতে গর্ভস্থ শিশুর অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। অনেক সময় মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটতে পারে অথবা মস্তিষ্ক অপরিণত থেকে যেতে পারে।

শিশুমৃত্যুর ঊর্ধ্বহারেরও একটা প্রধান কারণ অপুষ্টি। যদিও গত দু দশকে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমেছে, তবু বর্তমানের হারও কম ভয়াবহ নয়। প্রযুক্তিতে প্রকৌশলে উন্নত সুইডেনে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি এক হাজারে ১৩·৩, জাপানে ১৮·৫, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ২৩·৪, অস্ট্রেলিয়ায় ১৮·২ আর ভারতে ৬৯।

১৯৮০ সালের ২৯ এপ্রিল করাচিতে পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ইউনিসেফ অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন্স ইণ্টারন্যাশন্যাল চিলড্রেন্স এমার্জেন্সি ফাণ্ডের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা জেম্স্ পি গ্রাণ্ট বলেছিলেন, ১৯৭৯ সালে সারা পৃথিবীতে দেড় কোটিরও বেশি শিশুকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু ঘটেছে অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কারণে। ১৯৪৫ সালে হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণে যত লোক মারা গিয়েছিল তার চেয়ে এই সংখ্যা শতগুণ বেশি।

বাইবেলে আছে, 'man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live.' কথাটা একটু বদলে নিয়ে বলা যেতে পারে, কেবল ভাতরুটি হলেই মানুষ বাঁচে না, তার সঙ্গে আরও কিছু চাই—এবং তা হল পুষ্টি।

প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক উদ্ভিদ এবং প্রত্যেক জীবাণুর কতকগুলি নির্দিষ্ট পুষ্টিদ্রব্যের প্রয়োজন। সুপুষ্টির পরিণাম সুস্বাস্থ্য। পুষ্টিকর খাদ্য যেমন রোগ প্রতিরোধ করে তেমনি রোগনিরাময়ের ক্ষেত্রেও পুষ্টিকর খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভেষজের সাহায্যে রোগনিরাময়ের ব্যবস্থা, কিন্তু আধুনিক কেমোথের‍্যাপি অর্থাৎ রোগজীবাণুনাশক রাসায়নিক-মিশ্র প্রয়োগে রোগচিকিৎসার সূচনা এই শতাব্দীর প্রথম দিকে, পল এর্‌লিষ্‌ যখন তাঁর 'ম্যাজিক বুলেট' নিয়ে হাজির হলেন। এর্‌লিষের ভাবনা ছিল, এমন একটা রাসায়নিক যৌগ বার করা যা আক্রমণকারী জীবাণুর পক্ষে বিষবৎ হবে, কিন্তু মানুষের পক্ষে নয়। এই ভাবনার বশবর্তী হয়েই তিনি সিফিলিসের চিকিৎসায় আর্সেনিক সমন্বিত ওষুধ আবিষ্কার করলেন। এরপর কেমোথের‍্যাপির ধীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ধ্যানধারণা সৃষ্টি হতে লাগল এবং ক্রমে এই ধারণা প্রবল হল যে, শরীর যদি ঠিকমতো পুষ্টি পায় তাহলে অনেক রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। শুধু রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই নয়, আরও অনেক ব্যাপারে পুষ্টির প্রয়োজন।

মানুষের ইতিহাস খাদ্য-আহরণ ও রোগব্যাধি-দূরীকরণের সংগ্রামের ইতিহাস।

বিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত অনাহার, দুর্ভিক্ষ আর রোগব্যাধি বহুদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় ছিল। ব্যাকটিরিয়া-জাত রোগের আবিষ্কার আর সু-অনাময়ব্যবস্থা, ওষুধপত্র এবং অ্যান্টিবায়োটিকের কল্যাণে বহু রোগ এখন দূরীকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত। পুষ্টি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির কারণেও বহু রোগ অন্তর্হিত।

খাদ্যে ভিটামিন কিংবা অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্যের অভাব হলে পুষ্টির অভাবজনিত রোগ হয়। এই জাতের রোগের মধ্যে আছে স্কার্ভি, পেলাগ্রা আর রিকেট। বহুশতবর্ষ ধরে এইসব রোগের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। কিন্তু এখন পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের উন্নতির ফলে এইসব রোগ আর বিশেষ দেখা যায় না। ১৯১২ সালের পর থেকে ক্রমশ জানা গেছে, এইসব রোগের সঙ্গে ভিটামিনের অভাবের সম্পর্ক আছে। বেরিবেরি, আঞ্চলিক গলগণ্ড এবং কোয়াশিয়রকরও পুষ্টির অভাবজনিত রোগ।

জীবনের কতকগুলি পর্যায়ে শরীরে যদি পুষ্টির বিশেষ অভাব হয় তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে এবং উচ্চবর্গের বহু প্রাণীর ক্ষেত্রে শরীরের বৃদ্ধি এবং দেহের আকার খর্ব হতে বাধ্য। মস্তিষ্কের বৃদ্ধি এবং পরবর্তী কালে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষভাবে প্রয়োজ্য।

সমগ্র জীবনচক্রে যদি ভালো পুষ্টি মেলে তাহলে একটা জীব সম্যকভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে, বিকশিত হতে পারে এবং পূর্ণ প্রজননক্ষমতার অধিকারী হয়ে সুসন্তানের জন্ম দিতে পারে। সুপুষ্টির ফলে যেমন রোগব্যাধিমুক্ত হয়ে, অধিকতর কর্মক্ষমতা লাভ করে, স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ভোগ করা যায় তেমনি দেখা গেছে, সুপুষ্টির কারণে পূর্বপুরুষদের তুলনায় দীর্ঘ সুঠাম উজ্জ্বল দেহের অধিকারী হওয়াও সম্ভব।

সুপুষ্টির কারণে পূর্বপুরুষদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান হওয়াও সম্ভব। ১৯৮৭ সালে 'নেচার' নামে বিখ্যাত বিজ্ঞানপত্রিকায় এই মর্মে একটি খবর প্রকাশিত হয় যে, আজকের শিশুরা তাদের পিতামহদের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান। আলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক রিচার্ড লীন বৃটেনের সাতটি শহরে আর গ্রামে দশ বছর বয়সের এক হাজারেরও বেশি শিশুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, তাদের বোধশক্তির পরিমাপ (ইংরেজীতে যাকে **intelligence quotient** বলে, সংক্ষেপে **IQ**) ১৯৩৬ সালে যা ছিল, ১৯৮৭ সালে তা গড়ে ১২ পয়েন্ট বেড়েছে। অধ্যাপক লীনের মতে ভালো খাদ্য আর ভালো স্বাস্থ্যের জন্যই বৃটেনে শিশুদের বোধশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

একটি হিসাবে দেখা যায়, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫০ সালে মেয়েদের যৌবনারম্ভের গড় বয়স যেখানে ছিল ১৭, এখন সেখানে ১২·৬। ছেলেদের যৌবনারম্ভ হয় মেয়েদের চেয়ে কিছু পরে, কিন্তু ছেলেদেরও ক্ষেত্রে যৌবনারম্ভের গড় বয়স আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।

মানুষ এমন এক জীব যার অবিরাম বিকাশ ঘটছে এবং প্রতিবেশের সঙ্গে তার ভারসাম্য সর্বক্ষণই একটা বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে—অনেকটা বুকের উপর সরু সুতোয় ঝোলানো তীক্ষ্ণধার খড়্গের মতো। ইংরেজীতে বলা যায়, সে আছে 'in a precariously balanced state of equilibrium with his environment', এবং এই equilibrium বা সমভার অবস্থা বজায় রাখতে তাকে আজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করতে হয়—আর সেই সংগ্রাম তার চারপাশের অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর সঙ্গে, তার পরিবারের সঙ্গে, তার সহকর্মীর সঙ্গে, তার উপরওয়ালার সঙ্গে, তার প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে এবং জলবায়ুর সঙ্গে।

জীবরসায়নের দিক দিয়েও তার দেহের কোষগুলি তার খাদ্যের পুষ্টিদ্রব্যগুলির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। এখন, পর্যাপ্ত খাদ্য যদি না পাওয়া যায় অর্থাৎ খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ যদি যথেষ্ট না হয় তাহলে তার দেহের টিস্যু অর্থাৎ কোষ-কলার জীবনপ্রক্রিয়া চলে যে মৌলিক বিপাক হারে সেই হার কমে যায়। তাতে তার ওজন কমে এবং নানা ক্ষতি হয়। তবে ওজন কমে গিয়ে যদি একটা মাত্রায় সুস্থিত হয় এবং অসুস্থতা দেখা না দেয় তাহলে তাকে অপুষ্ট বলা সব সময় ঠিক নয়। এই হ্রস্ব খাদ্যে ও হ্রস্ব বিপাক হারে সে হয়তো আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে।

খাদ্য নিয়ে মানুষের আলোচনা অতি প্রাচীনকাল থেকে। সেই আলোচনার ভিত্তি কেবল অভিজ্ঞতাবলে লব্ধ জ্ঞান, পরীক্ষানিরীক্ষার রেওয়াজ তখনও শুরু হয় নি। সেই আলোচনা অনেক সময় একটা মনোরম শিল্পের রূপ নিয়েছে। তার মধ্যে বিজ্ঞান এসেছে ১০০ বছরও হয় নি, বছর ৯০ হবে সম্ভবত। আজ আমরা খাদ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান লাভ করতে পেরেছি এবং সেই জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকটা স্পষ্ট করেই বলতে পারছি, মানুষের কেন খাদ্য দরকার এবং খাদ্য তার কোন্ কাজে লাগে।

বিজ্ঞান হিসাবে নিউট্রিশনের প্রতিষ্ঠা বলা যেতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং তার প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী আন্তোয়ান লাভোয়াশিয়ের। কিন্তু ডায়েটেটিক্স অর্থাৎ খাদ্যনির্বাচনবিদ্যা অনেক পুরনো। হিপোক্রেটিস

তাঁর রোগীদের খাদ্য সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন, কী খাওয়া উচিত আর কী খাওয়া উচিত নয় বলতেন। প্রাচীন গ্রীক আমল থেকেই সমস্ত দেশেই চিকিৎসকরা খাদ্যকে তাঁদের চিকিৎসার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। নিউট্রিশন একটা আর্ট, আবার সায়েন্সও। ব্যবহারিক বিদ্যা হিসাবে এককালে যেমন তার চল ছিল, এখনও তেমনি আছে—সেইসঙ্গে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তার ভিত্তি ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

পুষ্টিবিজ্ঞান বলতে আজ আমরা যা বুঝি, সত্যি কথা বলতে কি, তার আরম্ভ ঊনবিংশ শতাব্দীতে, লাভোয়াশিয়েরের অবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লবে অত্যন্ত শোকাবহভাবে মৃত্যু বরণ করার আগে দহনের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যা তত্ত্বের দিক দিয়ে মানুষ এবং উচ্চবর্গের অন্যান্য প্রাণীর শ্বসনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। মানুষ এবং উচ্চবর্গের প্রাণীর শ্বসনে যে অকসিডেশন হয় তা থেকে তারা শক্তি লাভ করে, সেই শক্তিই তাদের বাঁচিয়ে রাখে। ১৭৯০-এর দশকের আগেও পুষ্টিবিষয়ে চিন্তাভাবনা যে হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু সেইসব চিন্তাভাবনা বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে নি। ১৭৮০ সালে লাভোয়াশিয়ের 'insensible perspiration' অর্থাৎ যে ঘাম বোঝা যায় না অথচ যাতে শরীরের ওজন কমে তা পরিমাপ করেন এবং দেখেন যে, তা কার্বন ডাই-অকসাইড আর জল। এর পরেই তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, '*La vie est une fonction chimique*' অর্থাৎ 'Life is a chemical process' মানে 'জীবন একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া'—এবং সেই প্রক্রিয়ায় যেসব রাসায়নিক যৌগ অংশ গ্রহণ করে তা আসে খাদ্য থেকে। এরপর ১৭৮০ থেকে ১৯২০, এই ১৪০ বছরে বহু বিজ্ঞানী, বিশেষ করে শারীরবিজ্ঞানী তুলাদণ্ড, থার্মোমিটার আর রসায়নসূত্রের সাহায্যে খাদ্য, কর্ম আর জীবন্ত দেহের মধ্যে পরিমাণগত কিছু শক্তিসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

কিন্তু পুষ্টিবিজ্ঞান বলতে আজ আমরা কী বুঝি? ম্যাগনাস পাইকের কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়—

"The science of nutrition as we understand it today is made up of three main interwoven threads. The first, based firmly on Lavoisier's genius, is that life is a process of 'combustion' or, to put the same conception in a different way, that the

energy by which a living creature is distinguished from a non-living one, is the product of the chemical combustion of fuel of some sort or another—that is food—with oxygen. This energy can be measured as heat, just as can the energy-value of coal, even though part of it is subsequently realised as movement or other work. The establishment of the energy relationships between different foods and the working of the body, together with the measurement of the efficiency with which the energy input can be converted into work output and, finally, the way in which an animal body may operate in equilibrium with its fuel supply, or may draw on banked fuel stocks in times of hardship, or, on the other hand, lay down fat and become obese—all these constitute the first main strand of nutritional science. The second has been the study of the way in which food provides not merely the energy to keep the biological 'machine' going, but also the basic structures of which it is built. The mobilisation of mineral elements to constitute the skeleton; iron and iodine for special biologically important molecules; and, perhaps most important of all, the nitrogen metabolism for the protein molecules constituting the muscular structure and the complex protoplasm of the body—these can all be taken to fall within this category.

And the third strand of scientific advance in the history of nutrition has been the striking advances achieved mainly within the present century, although with their roots coming from a few flashes of genius from earlier times, by which knowledge of vitamins and other so-called 'accessory food factors' has developed."

১৮৯৮ সালে সি এফ ল্যাংওয়ার্দি পুষ্টিসম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে এককথায়

এইভাবে সঙ্কলন করেছিলেন, "Foods have a dual purpose : building and repair. Energy for heat and work. Foods consist of the nutrients protein, fat and carbohydrates, and various mineral salts." ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই সংজ্ঞা পুষ্টির সার কথা বলে মান্য ছিল। ১৯১৮ সালে বৃটেনের খাদ্য মন্ত্রকও এই সংজ্ঞার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন মনে হয়, কারণ 'জাতীয় খাদ্য পরিকল্পনা' রচনায় তাঁরা ফল তরিতরকারি আর টোম্যাটো-কে কেবল উপেক্ষাই করেন নি, খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য বলেও রায় দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এইসব খাদ্য অপচয়মূলক এবং অপ্রয়োজনীয়। ক্যালরিমূল্য কম বলে এইসব খাদ্য তাঁরা বাতিল করে দিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে এইসব খাদ্যের মধ্যে মূল্যহীন কিছু রঙিন জল ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না।

কিন্তু আজ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এইসব খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ আছে, তাই অত্যন্ত পুষ্টিকর। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা এখন নিয়মিত এইসব খাদ্য খেতে বলেন।

চার : আমরা সকলেই স্নায়বিক রোগগ্রস্ত

খাদ্যের ব্যাপারে মনস্তত্ত্বের একটা মস্ত ভূমিকা আছে। জন্মের পর প্রথম ক'বছরেই আমাদের খাদ্যাভ্যাস একেবারে তৈরি হয়ে না গেলেও তার ভিত্তিটা গাঁথা হয়ে যায় এবং তা হয় অবচেতন মনের মধ্যে। আমাদের পছন্দ-অপছন্দের সঠিক কারণ আমরা জানি না। জানার চেষ্টাও করি না। শুধু ভালো লাগে বলেই হয়তো আমরা কোনো জিনিস বেশি খাই। আবার ভালো লাগে না বলে কোনো জিনিস একেবারেই খাই না অথবা ঠিকমতো এবং সঠিক পরিমাণে খাই না। এই ভালো না লাগার পিছনে অজ্ঞাত, অব্যাখ্যাত একটা বিরুদ্ধ-মনোভাব কাজ করে। মনস্তাত্ত্বিকরা জানেন, আমাদের সকলেরই মনে একটা আত্মপীড়ন বা আত্মাঘাতের ইচ্ছা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, আমরা সকলেই কমবেশি স্নায়বিক রোগগ্রস্ত। যে যত বেশি স্নায়বিক রোগগ্রস্ত সে তত বেশি নিজেকে কষ্ট দেয় এবং সেই কষ্টের প্রথম কশাঘাত পড়ে খাওয়ার উপর। তা না হলে খাওয়ার উপর আমরা রাগ করি কেন? কেন মনের সামান্য অশান্তিতে আমরা না খেয়ে থাকি? আবার ক্ষতিকর জেনেও কেন তৃপ্ত মনে অ-খাদ্য খাই? অপকারী খাদ্যের প্রতি আমাদের লোভ তো আজন্ম। মদে ক্ষতি হয় জেনেও আমরা মদ খাই। ধূমপান অস্বাস্থ্যকর জেনেও আমরা ধূমপান ছাড়ি না। পরিশ্রমের একটা মাত্রা আছে জেনেও আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করি এবং শরীরের পক্ষে পরিশ্রম একান্ত প্রয়োজন জেনেও আমরা অলসে-বিলাসে দিন কাটাই।

খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে ধরাবাঁধা কোনো ছক কাটা যায় না। এ সম্পূর্ণ ই ব্যক্তিগত—ভিন্নরুচির্হিলোকাঃ। জনে জনে তার প্রভেদ। তবু আপনার চেহারা দেখে, কাজেকর্মে আপনার উৎসাহ আছে কিনা বুঝে এবং নিত্যদিনের সংসার আপনার ভালো লাগে কি লাগে না জেনে বলে দেওয়া যায় আপনার শরীরে পুষ্টির অভাব আছে, না নেই। আপনার বিষণ্ন ম্রিয়মাণ শ্লথ ভাব আর বিশৃঙ্খল চিন্তা এবং নিরুদ্যম ভঙ্গিই বলে দেবে আপনার শরীরে পুষ্টির অভাব আছে, আপনার খাদ্যে কিছু ঘাটতি আছে। আপনার খাদ্যের উপরই নির্ভর করছে সারা দিন আপনার কেমন যাবে, দিনের শেষে আপনি শ্রান্তক্লান্ত হয়ে

শয্যামুখী হবেন, না হেসেখেলে আনন্দ করে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত প্রাণের স্পন্দন অনুভব করবেন। আপনার ব্যক্তিত্বও নির্ভর করছে আপনার খাদ্যের উপর।

খাদ্যগ্রহণে আগ্রহ-অনাগ্রহ একান্তভাবেই মানসিক। ক্ষুধা শব্দটিকে ইংরেজীতে দুটি প্রতিশব্দে বোঝানো হয়: **HUNGER** আর **APPETITE**; প্রথমটি একান্তভাবেই দেহের প্রয়োজনে, দ্বিতীয়টি দেহমন নির্ভর। ক্ষুধা থাকলেও খাওয়ার ইচ্ছা না থাকা এবং ভরা পেটে খাওয়ার ইচ্ছা হওয়া—দুই-ই বিপাক পরিপাক এবং দৈহিক ও মানসিক পুষ্টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অনেকের ধারণা খাদ্য রসনাতৃপ্তির জন্য নয়, শরীররক্ষার জন্য। ধারণাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। রসনার তৃপ্তি না হলে সে খাদ্য মুখে ওঠে না, গায়ে লাগে না। সুতরাং খাদ্যের সঙ্গে রসনাতৃপ্তির সম্পর্ক অবশ্যই আছে, তবে তৃপ্তির ব্যাপারটা আপেক্ষিক। একই খাদ্য কারও কাছে রুচিকর, কারও কাছে নয়। তৃপ্তি করে যে খেতে পারে সে-ই পারে স্বাস্থ্যবান হতে। অতএব স্বাস্থ্যবান হতে হলে খাদ্য রুচিকর হতেই হবে। অর্থাৎ সুস্বাদু।

ঘাসের রস খুব পুষ্টিকর, কিন্তু কখনও মুখে দিয়েছেন কি? কিংবা কাঁচা মাংস? যে খাদ্যে আপনার রুচি নেই সে খাদ্য খাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। স্বাস্থ্যগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেক পুষ্টিকর সুস্বাদু খাদ্য আছে, একথাটা যেমন জানা দরকার তেমনি জানা দরকার শরীরের পক্ষে উপযোগী কোনো খাদ্য যদি সুস্বাদু না হয় তাহলে তাকে রসনার কাছে গ্রহণীয় করা যায় কিনা। যায়, যদি আপনি একটু চেষ্টা করেন, অল্প অল্প করে অভ্যাস করেন।

খাদ্য রুচিকর না হলে যে গায়ে লাগে না তার একটা প্রমাণ দিই। ধরুন, কোনো একটি পুষ্টিকর পদার্থের অভাবে আপনার অসুখ করেছে এবং সেই পুষ্টিকর পদার্থ আছে এমন খাদ্য আপনাকে খেতে দেওয়া হল। কিন্তু খাদ্যের চেহারা দেখে কি গন্ধ শুঁকে অথবা সেই খাদ্য জিভে একটু ঠেকিয়েই আপনার সারা শরীরমন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আপনি আর খেলেন না। আগে যা খাচ্ছিলেন তা-ই খেতে লাগলেন। ফলে হল কী? সেই প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থ আপনার শরীর পেল না। শরীরে অপুষ্টি ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং শেষে আপনার প্রাণসংশয় হয়ে উঠল। এর জন্য দায়ী যিনি আপনাকে ঐ অরুচিকর খাদ্য খেতে দিয়েছিলেন। তিনি যদি একটু সুদৃশ্য সুস্বাদু করে খাবারটা আপনাকে দিতেন তাহলে আপনার এ অবস্থা হত না।

আবার, খাদ্য সুস্বাদু করতে গিয়ে অতিরিক্ত তেলমসলা দিয়ে কি ভেজে-

পুড়িয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে তার গুণ নষ্ট করে ফেললে সে খাদ্য রসনায় লাগলেও গায়ে লাগে না, বরং উলটে ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং খাদ্যনির্বাচনের ব্যাপারে দুটি জিনিস মনে রাখতে হবে—প্রথম, খাদ্য যেন সুস্বাদু হয়; আর দ্বিতীয়, খাদ্যমান যেন বজায় থাকে।

খাদ্যের ব্যাপারে ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন আমাদের মস্ত ক্ষতি করে চলেছে। আমরাও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের সেই বিজ্ঞাপনের শিকার হয়ে নিজেদের ক্ষতি করছি। ব্যবসায়ীদের প্রধান উদ্দেশ্য পণ্যবিক্রয় এবং তারই জন্য যত চিত্তহারী বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপন দেখে আমরা মুগ্ধ হই, আকৃষ্ট হই—তাদের তৈরি খাদ্য কিনি। তার মধ্যে খাদ্যগুণ কতখানি আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু আমাদের জানা দরকার, অতিমাত্রায় পরিশোধিত খাদ্যের অনেক গুণই নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ খাদ্যসামগ্রীর চেয়ে টিনে ভরা কি শিশিতে পোরা অথবা মোড়কে মোড়া অত্যধিক পরিশোধিত খাদ্য যেমন সুবহ এবং রাখা সহজ তেমনি তা থাকেও অনেকদিন। এই ধরনের খাদ্য যে নষ্ট হয় না তার কারণ তা ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক বা কোনো কীটের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী নয়। সহজেই অনুমান করা যায়, ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, কীট প্রভৃতির স্বাস্থ্যের পক্ষে যা উপযোগী নয়, মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা উপযোগী হতে পারে না। তবু বিজ্ঞাপন দেখে আমরা আকৃষ্ট হই। এইসব খাদ্যে যে অল্প কয়েকটি খাদ্যগুণ কম হলেও থাকে, বিজ্ঞাপনে সেগুলিকেই ঢক্কানিনাদ করে ঘোষণা করা হয় আর যেগুলি নষ্ট হয়ে যায় সেগুলি সম্বন্ধে কোনোরকম উচ্চবাচ্য করা হয় না। ফলে হয় কী, সাধারণ মানুষ বোঝে, এইসব খাদ্যের পুষ্টিমান অনেক। দেশের সরকার রাজকোষ বৃদ্ধির আগ্রহে অথবা নিতান্ত অজ্ঞতাবশত এই ধরনের বিজ্ঞাপনের বিরোধিতা করেন না; আবার, বহু খাদ্যবিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী এইসব লোক-ঠকানো খাদ্যের সুখ্যাতি করে প্রশংসাপত্র লিখে দিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষতি করেন।

ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন কীভাবে আমাদের ক্ষতি করে তার আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আজ আমরা এমন যুগে বাস করি যখন সামান্য একটা অ্যাস্পিরিনেই মাথাধরা সেরে যায়। সুতরাং ভিটামিন পিলে কেন আলসার বা টিউমার সারবে না, আমাদের অনেকের মাথায় তা ঢোকে না। আমাদের এই অবুঝ মনের সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা সর্বরোগহর ক্যাপসিউলের বিজ্ঞাপন দেয় অথবা অটুট স্বাস্থ্যরক্ষার কিংবা অনন্ত না হলেও দীর্ঘ যৌবন-

ভোগের কথা বলে। তারা বলে, এই ক্যাপসিউলে শরীর-স্বাস্থ্য-যৌবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় 'সবকিছু' আছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই সহজে প্রতারিত হতে ভালোবাসেন। প্রতারিত হচ্ছেন জেনেও তাঁরা প্রতারিত হন। তাঁরা এই 'সবকিছু'-সমন্বিত ক্যাপসিউল খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করতে চান। এই ধরনের ক্যাপসিউল তৈরি করা হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু তার আয়তন তখন দাঁড়াবে একটা আস্ত বেসবলের মতো। সেটা খাওয়া সম্ভব কি ?

পুষ্টির একটি পুরস্কার মেদ-অর্জন, অবশ্য যদি তা কাঙ্ক্ষিত হয়। অনেকের খাদ্য পরিপাকে ও পরিশোষণে গোলমাল থাকে, সেই গোলমাল দূর করার পর স্নায়ু আর পেশী যদি এমন শিথিল হয় যে, অকারণ শক্তির অপচয় হয় না এবং ঘুম যদি ভালো হয় তাহলে রোগা মানুষও ক্যালরির পরিমাণ না বাড়িয়ে অতি সহজেই মোটা হতে পারেন।

পুষ্টির আর-একটি পুরস্কার সৌন্দর্য। অপুষ্ট শরীরে যতই বসনভূষণ পরানো হোক আর অঙ্গরাগ মাখানো হোক, সে সৌন্দর্য প্রাণহীন সৌন্দর্য, সে সৌন্দর্যে লাবণ্যের অভাব, সে সৌন্দর্যে প্রাণ ভরে না। কিন্তু পুষ্টির ছোঁয়ায় সুগঠিত সুললিত দেহ বসনভূষণ আর অঙ্গরাগ ছাড়াই সুকান্ত হয়ে ওঠে, সে সৌন্দর্য জীবনীশক্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করে, তা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, দৃষ্টি সার্থক হয়। আর যদি সুপুষ্ট সুগঠিত লাবণ্যমণ্ডিত দেহে সুদৃশ্য বেশভূষা আর আবরণ-আভরণ ওঠে তাহলে তো সোনায় সোহাগা, তার তুলনা নেই। প্রাচীনকালে যখন প্রসাধন ছিল না, থাকলেও এত সুলভ ছিল না, তখনও সৌন্দর্য ছিল এবং সে সৌন্দর্য প্রাণশক্তিতে জ্বল্ জ্বল্ করা প্রাণভরানো সৌন্দর্য। কারণ, তখন সুখাদ্য সুপুষ্টির অভাব ছিল না।

পুষ্টির আরও একটি পুরস্কার সুদীর্ঘ যৌবন। পুষ্টি বার্ধক্যের গতিতে মন্দন এনে দেয়। পুষ্টির নির্দেশ ঠিকমতো মেনে চললে বয়স বাড়লেও শরীরে তার ছাপ পড়ে না। কখনও কখনও এমনও মনে হয় যেন বয়স ঊর্ধ্বগতি না হয়ে নিম্নগতি হয়েছে।

পুষ্টিকর খাদ্যে যেমন যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয় তেমনি যৌনদুর্বলতাও দূর হতে পারে। যদি ধরা যায় যৌনদুর্বলতার শতকরা ৯৫ ভাগই কাল্পনিক কি মানসিক তবু ৫ ভাগ তো বাকি থাকে, তার মধ্যে পৌষ্টিক দুর্বলতাও একটা কারণ হতে পারে। স্বাভাবিক হরমোন উৎপাদনে অথবা প্রস্টেট, জরায়ু আর যৌনপথের

স্বাস্থ্যরক্ষায় প্রতিটি পুষ্টিদ্রব্যেরই কিছু-না-কিছু ভূমিকা আছে। ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে হয়, মস্তিষ্কের তলদেশে যে পিট্যুইটারি গ্রন্থি আছে তা গোনাডোট্রফিক হরমোন তৈরি করে এবং সেই গোনাডোট্রফিক হরমোন গোনাড অর্থাৎ পুরুষের অণ্ডকোষ আর নারীদেহের ডিম্বাশয়কে উদ্দীপিত করে স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ হরমোন প্রস্তুত করে। গোনাডোট্রফিক হরমোন প্রোটিন দিয়ে তৈরি আর যৌনহরমোন তৈরি প্রোটিন আর স্টেরয়েড নামে ফ্যাটের মতো এক জাতীয় পদার্থে। এখন, খাদ্যে যদি প্রোটিন, ফ্যাট, বি-ভিটামিন কিংবা কোনো পুষ্টিদ্রব্যের সাঙ্ঘাতিক অভাব থাকে তাহলে পিটুই্য-টারি আর গোনাড পর্যাপ্ত পরিমাণে এইসব হরমোন তৈরি করতে পারে না। ফলে যৌনদুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, খাদ্যে ঠিকমতো পুষ্টিদ্রব্য না থাকলে কামশক্তি কমে যায় অথবা একেবারেই লোপ পায়। কিন্তু মোটামুটি পুষ্টিকর খাদ্যে প্রয়োজনীয় হরমোনের অভাব কখনও হয় না, তাই মানসিক সমস্যা না থাকলে এবং নিদারুণ পৌষ্টিক সমস্যা না ঘটলে যতদিন স্বাস্থ্য থাকে ততদিনই হয়তো কামশক্তি বজায় রাখা যায়।

কিন্তু পুষ্টির সঙ্গে কামশক্তির সুস্পষ্ট সম্পর্কনির্ধারণ আজও সম্ভব হয় নি। পরীক্ষায় এমনও দেখা গেছে যে, অপুষ্টি ও শারীরিক দুর্বলতা কামশক্তি বাড়িয়ে তুলেছে, নারীর প্রজননক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত পুরুষকেও প্রবলভাবে কামতাড়িত হতে দেখা গেছে। যৌনপ্রবৃত্তিতে মানসিক আকাঙ্ক্ষার ভূমিকাই অনেক বেশি প্রমাণ হয়েছে।

পুষ্টির অভাবে নারীর প্রজননক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে তেমনি হ্রাস পেতেও দেখা গেছে। ১৯৪২ সালে লেনিনগ্রাদ শহর অবরুদ্ধ হলে সেখানে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা হয়েছিল, সেই সময় লেনিনগ্রাদের নারীদের সন্তানধারণের হার অনেক কমে গিয়েছিল। আবার ১৯৪৪ সালে নেদারল্যাণ্ডে যখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল তখন সেখানকার নারীরা অনেক কম হারে গর্ভবতী হয়েছিল।

তবে আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মানুষের খাদ্যে নানাদিক থেকে পুষ্টির অভাব থাকলেও জন্মহার যে অনেক বেশি তার কারণ বোধ হয় এই যে, এই অপুষ্টি প্রচণ্ড রকমের অপুষ্টি নয়। আগেই বলেছি, মোটামুটি পুষ্টিকর খাদ্যে কামশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় হরমোনের অভাব কখনও হয় না।

পাঁচ : জিজ্ঞাসু মনের মানুষের ইতিহাস

গ্রীক পুরাণে আছে, জিউসের মাথা থেকে অকস্মাৎ পূর্ণসজ্জিতাবস্থায় আথেনা নির্গত হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান কখনও কোনো মানুষের মস্তিষ্ক থেকে হঠাৎ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। জ্ঞান আহরণ করতে হয় ধীরে ধীরে, একটি একটি করে ক্ষুদ্র পদক্ষেপে। পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান ও বি-জ্ঞান এমনি করেই আহরণ করা হয়েছে। তার ইতিহাস লেখা আছে স্বর্ণাক্ষরে।

পুষ্টিবিজ্ঞানের ইতিহাস জিজ্ঞাসু মনের মানুষের ইতিহাস, মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রাণের সঙ্গে যুক্ত সব সমস্যা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের ইতিহাস। এই ইতিহাসের পাতায় পাতায় উত্তেজনা। এই ইতিহাস বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের ইতিহাস ; এক বিজ্ঞানের সঙ্গে আর-এক বিজ্ঞানের সম্পর্কের ইতিহাস এবং সেই বিভিন্ন বিজ্ঞান—ভেষজবিদ্যা, শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়ন, জীবাণুবিদ্যা, আবহবিদ্যা এবং কৃষিবিদ্যা। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল শ্রেণীর মানুষ তিল তিল করে এই ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। তাঁরা বিভিন্ন মানসিকতার, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের, বিভিন্ন পেশার মানুষ। তাঁরা চিকিৎসক, তাঁরা রসায়নবিদ, তাঁরা নাবিক, তাঁরা অভিযাত্রী, তাঁরা ব্যবসায়ী, তাঁরা শিক্ষক, তাঁরা ওষুধপ্রস্তুতকারক, তাঁরা আইনজীবী। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের মনে জিজ্ঞাসা ছিল, কৌতূহল ছিল—এবং তাঁদের মনে যেসব প্রশ্ন উঠেছিল সেইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ছিল মনের তাগিদ।

এই ইতিহাসের আরম্ভ কবে, আমরা জানি না। কিন্তু নথিপত্র দেখে মনে হয়, গ্রীক ও রোমক আমলেই তার সূত্রপাত। ব্যাবিলন ও মিশরের উৎকীর্ণ লিপি, প্রাচীন পুঁথি ও প্যাপাইরাসের উপর লিখিত হস্তলিপি, অভিযাত্রী ও সমুদ্রযাত্রীদের দিনপঞ্জী, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের বিবরণ, বিভিন্ন পেশার মানুষের চিঠিপত্র ও ডায়েরি, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ এবং চিকিৎসাশাস্ত্রীয় রেকর্ড থেকে সংগৃহীত তথ্য সংযোজিত করে এই ইতিহাস রচিত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকরা বিশ্বাস করতেন, পথ্য দিয়ে রোগ সারানো যায়, যদিও তাঁরা জানতেন না কোন্ খাদ্যে কোন্ গুণ। আমাদের যেমন পঞ্চভূত —ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—তেমনি একজন প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক

চতুর্ভূতের কথা বলেছিলেন—আগুন, জল, মাটি আর বাতাস। বলেছিলেন, এই চারটি পদার্থ উষ্ণতা, আর্দ্রতা, শুষ্কতা আর শীতলতার কারণ। কিন্তু এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞান বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। পারেও নি।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে গ্রীক রাজ্যের অন্তর্গত পেরগামোসের একজন চিকিৎসক গ্যালেন পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে মানুষের শারীরস্থান সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়েও লিখলেন অনেক বই। তাঁর সেই লেখাগুলি পরবর্তী ১২০০ বছর পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে শেষকথা বলে পরিগণিত হত। সপ্তদশ শতকে দেখা গেল, গ্যালেনের কথা মানতে আর কেউ রাজী নন। তাঁর কথা আর কাউকে আকর্ষণ করতে পারছে না। সকলেই চান, পরীক্ষা করে দেখতে এবং পরীক্ষার পর যা দাঁড়ায় তা মানতে। ১৬২৮ সালে উইলিয়ম হার্ভে পরীক্ষার সাহায্যে দেখালেন, শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয় হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে; হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনী দিয়ে রক্ত বার হয় আর শিরা দিয়ে তা আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। হার্ভের এই আবিষ্কারের ফলে পরবর্তী কালের এক যুগান্তকারী সত্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। হার্ভের এই আবিষ্কার থেকেই পরবর্তী কালে জানা গেল, কীকরে দেহের প্রতিটি কোষে খাদ্যসামগ্রী পরিবাহিত হয়।

আমরা যে খাদ্য খাই সেই খাদ্য সরাসরি আমাদের গায়ে লাগে না। পাকস্থলীতে যখন খাদ্য পরিপাক হয় তখন খাদ্যের ভিতরকার রাসায়নিক উপাদানগুলি পুনর্বিন্যস্ত হয়ে আমাদের শরীর যেসব রাসায়নিক উপাদানে তৈরি সেইসব রাসায়নিক উপাদানে পরিণত হয়। এ এক জটিল প্রক্রিয়া। বহুকাল এই প্রক্রিয়া মানুষের দুর্জ্ঞেয় ছিল, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আজ আমাদের কাছে তা অনেকখানি স্পষ্ট। যে জ্ঞানের সাহায্যে আজ আমরা এই প্রক্রিয়ার কথা স্পষ্ট করে জানতে পেরেছি সে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে শত শত বছর ধরে।

যতদূর জানা যায়, মানুষের উপর পুষ্টি সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষানিরীক্ষা চালান ইতালির এক পদার্থবিদ সাংতোরিয়াস (১৫৬১-১৬৩৬)। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তিনি নিজের দেহের ওজন নেন, তিনি যে খাদ্য খান ও তাঁর দেহ থেকে মলমূত্রাদি যা-কিছু নির্গত হয় তা ওজন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দেহের ওজন আর তিনি যা খেয়েছেন ও দেহ থেকে বার করে দিয়েছেন তার ওজনের

পার্থক্য কতখানি তা দেখা। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আর বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি।

এর ১০০ বছর পরে আবার চেষ্টা হল, কীকরে খাদ্য দেহ গঠন করে তা জানার। কীকরে কঠিন খাদ্য পাকস্থলীতে অথবা পাচকতন্ত্রের অন্য কোনো অংশে পরিবর্তিত হয়, তারপর রক্তধারায় মিশে দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয় তা নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা উঠল। তখনও কিন্তু এ বিষয়ে কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। জন হান্টার (১৭২৮-১৭৯৩) নামে একজন ইংরেজ শল্যবিদ ও অধ্যাপক পাকস্থলীর ক্রিয়া কী তা যে তিনি সুস্পষ্টভাবে জানেন না একথা বোঝাতে তাঁর ছাত্র আর সহকর্মীদের বলেছিলেন, **"Some physiologists will have it that the stomach is a Mill—others that it is a Fermenting Vat—others again that it is a Stew-pan—but in my view of the matter it is neither a Mill, a Fermenting Vat, nor a Stew-pan—but a Stomach, Gentlemen, a Stomach."**

পাকস্থলীর ক্রিয়া কী জানার জন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী চেষ্টা শুরু করে দিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ফ্রান্সের রনে রেমোর (১৬৮৩-১৭৫৭)। তিনি পড়াশোনা করেছিলেন আইন নিয়ে, কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানে তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তাঁর একটা পোষা চিল ছিল। সেই চিলটি খাবার গিলে আবার উগরে বার করে দিতে পারত। রেমোর ধাতুর পাত দিয়ে কতকগুলি ছোটো ছোটো ফাঁপা নল তৈরি করলেন। তারপর সেগুলির মধ্যে খাবার ভরে দুদিক তারের জাল দিয়ে আটকে দিলেন যাতে খাড়া করে ধরলে খাবার পড়ে না যায়। খাবার বলতে মাংস। রেমোর নলগুলির মধ্যে মাংস পুরে তারের জাল দিয়ে দুদিক আটকে চিলটিকে খেতে দিলেন। চিল নলগুলি গিলে বেশ খানিকক্ষণ পরে যখন উগরে বার করে দিল তখন দেখা গেল, খানিকটা করে মাংস গলে গেছে অথচ পচা গন্ধ নেই এবং নলগুলির উপর কোনোরকম চাপের চিহ্নমাত্র নেই। এতে বোঝা গেল, পরিপাক আসলে পেষণ এবং পচন বলে যে ধারণা ছিল তা ঠিক নয়। রেমোরের পরীক্ষায় আগের ধারণা নস্যাৎ হয়ে গেল।

রেমোর কয়েকটি নলে মাংসের সঙ্গে স্পঞ্জও পুরে দিয়েছিলেন। স্পঞ্জগুলি কিছুটা করে পাচক-রস শোষণ করে এনেছিল। রেমোর পরীক্ষা করে দেখলেন, সে রস এক ধরনের অ্যাসিড এবং টেস্ট-টিউবে মাংসের মধ্যে ঐ রস দিলে মাংস আংশিকভাবে গলে যায়।

রেমোরের এই পরীক্ষার পরেও পুরনো ধারণা পালটাল না। কিন্তু রেমোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের যে নতুন পথ দেখিয়ে দিলেন সেই পথ ধরে ২৫ বছর পরে ইতালির লাজারো স্পালানজানি (১৭২৯-১৭৯৯) নিজের দেহে এই পরীক্ষা চালালেন। তিনি কতকগুলি ছোটো ছোটো কাপড়ের থলির মধ্যে রুটি আর মাংস ভরে গিলে খেলেন। অনেকক্ষণ পরে রেমোরের চিলের মতো থলিগুলি উগরে বার করে দেখলেন, রেমোরের পরীক্ষা অভ্রান্ত। এরপর তিনি একটি বই লিখে প্রমাণ করে দিলেন, পরিপাক কখনও গাঁজন নয়, এক ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

এরপর ১৮২২ সালে একটা বড়ো ঘটনা ঘটল। আলেকসি সঁ্যা মারতাঁ নামে ফরাসী বংশোদ্ভূত একজন ক্যানাডীয় ব্যাধ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উত্তর মিশিগানের এক সীমান্তবর্তী গ্রামে উইলিয়ম বোমেঁা নামে সেনাবাহিনীর একজন তরুণ সার্জনের কাছে এলেন। মারতাঁর বুকে আর তলপেটে গুলি লেগেছিল এবং আঘাত ছিল মারাত্মক। তরুণ সার্জনের অসামান্য চেষ্টায় মারতাঁ প্রাণে বেঁচে গেলেন। কিন্তু তাঁর তলপেটের চামড়ায় আর পাকস্থলীর ভিতরে একটা ছোট্ট ছিদ্র রয়ে গেল। বোমেঁার মাথায় হঠাৎ কী বুদ্ধি খেলে গেল, তিনি ঐ ছিদ্রপথে মারতাঁর উদরে একটা থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিয়ে ভিতরের তাপমাত্রা নিলেন। চোখ লাগিয়ে দেখলেন, কী কী খাদ্যে আর কোন্ কোন্ অবস্থায় পাচক-রস বার হয় এবং কোন্ হারে কোন্ খাদ্য পরিপাক হয়। বোমেঁা ২৩৮ বার পরীক্ষা চালিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত করলেন তার অনেক-গুলি আজও নির্ভুল বলে স্বীকৃত। বোমেঁা যদি আরও কিছুদিন পরীক্ষা চালাতে পারতেন তাহলে আমাদের দেহে পরিপাকক্রিয়া সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে পারতেন। কিন্তু তাঁর এই পরীক্ষা মারতাঁর কাছে আরামদায়ক না হওয়ায় তিনি ক্যানাডা ফিরে গেলেন, বোমেঁার পরীক্ষা অসমাপ্ত রয়ে গেল।

উনবিংশ শতাব্দীতে রসায়নের অসাধারণ উন্নতি হল। রসায়নবিদরা পাচক-রসের অ্যাসিড পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। কিন্তু খাদ্যপরিপাকে একমাত্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ভূমিকাই যথেষ্ট নয়, আরও একটি জটিল জৈব রাসায়নিকের ভূমিকা আছে, তার নাম এনজাইম, যেমন—পেপসিন, লাইপেজ প্রভৃতি। পেপসিনের আবিষ্কার ১৮৩৫ সালে।

খাদ্য পরিপাক হবার পর এবং রক্তস্রোতে প্রবাহিত হবার সময় তার চেহারা কেমন দাঁড়ায়? তখন তার কাজ কী? এ প্রশ্ন অনেককেই ভাবিয়েছে।

গোড়ার দিকে বেশি করে ভেবেছেন প্যারিসের এক বিজ্ঞানী আন্তোয়ান লরঁ লাভোয়াশিয়ের (১৭৪৩-১৭৯৪)। ততদিনে অকসিজেন আবিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু আবিষ্কারকরা এই গ্যাসটিকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেন নি। লাভোয়া-শিয়ের আবিষ্কার করলেন অকসিজেন আসলে কী। লাভোয়াশিয়ের তাঁর আবিষ্কারে বিজ্ঞানের জগতে এক যুগান্তর আনলেন। কিন্তু বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্য, লাভোয়াশিয়ের যখন তাঁর কর্মজীবনের সুউচ্চ শিখরে তখন ফরাসী বিপ্লব শুরু হল এবং সেই বিপ্লবে গিলোটিনে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হল।

কিন্তু লাভোয়াশিয়ের তাঁর মৃত্যুর অনেক আগেই পুষ্টিবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। মানুষের শরীরের ভিতর যেসব ক্রিয়াপ্রক্রিয়া চলে তা বোঝার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। তাই তাঁকে 'পুষ্টিবিজ্ঞানের জনক' বলা হয়।

বাতাস ছাড়া মানুষ বাঁচে না, এ জ্ঞান সেই প্রাচীন কাল থেকে। .কিন্তু বাতাস আসলে কী এবং কীকরে বাতাস মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে এ জ্ঞান অপেক্ষা-কৃত সাম্প্রতিক কালের। সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন, একটা জলন্ত মোমবাতিকে একটা কাঁচের পাত্র দিয়ে ঢেকে দিলে মোমবাতিটা খানিকক্ষণ পরে নিভে যায়, বায়ুরোধী একটি পাত্রে একটা ইঁদুর ঢুকিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলে ইঁদুরটা কিছুক্ষণ পরে মরে যায়। মোমবাতিটা নেভে আস্তে আস্তে, অকসিজেন শেষ হয়ে গেলে; ইঁদুরটা মরে হাঁপাতে হাঁপাতে—অকসিজেন যত কমে, ইঁদুরটা তত হাঁপায়, শেষে অকসিজেন ফুরিয়ে গেলে ইঁদুরটা মরে যায়। লাভোয়াশিয়েরের পরীক্ষায় দেখা গেল, শ্বাসপ্রশ্বাস একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া, তাতে অকসিজেনের ক্ষয় হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম অকসিডেশন বা দহন। মানুষের খাদ্যে যেসব পুষ্টিকর পদার্থ থাকে তা পরিবর্তিত হয়ে মানুষের দেহের কাঠামো তৈরি করে এবং সেই পরিবর্তনসাধনে অকসিজেনের প্রয়োজন হয়। অকসিজেন ছাড়া খাদ্যের ভিতরকার পুষ্টিকর পদার্থগুলির পরিবর্তন সম্ভব নয়। মানুষের শরীরে অবিরাম এইরকম বহু রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে। সেই প্রক্রিয়াগুলিকে একত্রে বলে মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া। লাভোয়াশিয়েরই প্রথম মানুষের শরীরের বিপাকক্রিয়া পরিমাপ করেন। তিনি পরীক্ষা চালান তাঁর ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টের উপর। ল্যাবরেটরি অ্যাসি-স্ট্যাণ্টকে বিশ্রামে বসিয়ে তাঁর প্রশ্বাসে কতখানি অকসিজেন প্রবেশ করে আর নিশ্বাসে কতখানি কার্বন ডাই-অকসাইড বার হয় তা পরিমাপ করেন। এই পরিমাপ থেকে এবং অন্যান্য জীবজন্তুর উপর আরও অনেক পরীক্ষা থেকে

লাভোয়াশিয়ের দেখান, শরীরের মধ্যে যে অকসিডেশন হয়, শরীরের তাপ আর শক্তি আসে সেই অকৃসিডেশন থেকে। লাভোয়াশিয়েরের পরীক্ষায় আরও দেখা গেল, মানুষ যখন খাদ্য খায় কিংবা পরিশ্রম করে কি কাজ করে তখন অকসিজেনের প্রয়োজন হয় বেশি। এ থেকেই ক্যালরিমেট্রি অর্থাৎ শরীরে তাপ ও কাজের মাত্রা পরিমাপের সূত্রপাত, শেষপর্যন্ত যা খাদ্যের ক্যালরিমূল্য পরিমাপে দাঁড়িয়েছে।

নাইট্রোজেন আবিষ্কার ১৭৭২ সালে। কিন্তু পুষ্টির সঙ্গে নাইট্রোজেনের যে একটা সম্বন্ধ আছে সেকথা ১৮১৬ সালের আগে জানা যায় নি। ফ্রাঁসোয়া মাজন্দি (১৭৮৩-১৮৫৫) নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী কতকগুলি কুকুরকে শুধু শর্করা আর জল কিংবা কেবল অলিভ অয়েল আর জল খাইয়ে রেখে দেখলেন, কুকুরগুলি মরে যাচ্ছে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, খাদ্যে নাইট্রোজেন দরকার। তিনি জানতেন, দেহের টিস্যুতে আর অনেক খাদ্যে নাইট্রোজেন থাকে। তাই তিনি বললেন, টিস্যুর নাইট্রোজেন আসে সম্ভবত খাদ্য থেকে। নাইট্রোজেন-সমন্বিত খাদ্যকে তখন বলা হত অ্যালবিউমিনাস ফুড। মাজন্দির আবিষ্কারের ঠিক ২০ বছর পরে ১৮৩৮ সালে মালডার নামে একজন ওলন্দাজ রসায়নবিদ অ্যালবিউমিনাস খাদ্যের ভিতরকার নাইট্রোজেন-সমন্বিত পদার্থের নাম দিলেন প্রোটিন।

গ্রীক *Protos* থেকে Protein শব্দের উদ্ভব। Protos অর্থ প্রথম। কিন্তু পুষ্টির ক্ষেত্রে প্রোটিনের স্থান প্রথম নয়। কোনো পুষ্টিকর পদার্থেরই স্থান প্রথম হতে পারে না, কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বহুবিধ খাদ্যের সমন্বয়েই পুষ্টি। মানুষের সামগ্রিক খাদ্যে প্রোটিন একটি অংশ মাত্র। তাছাড়া প্রোটিন আছেও বহুবিধ—নানা প্রকারভেদ তার, গুণগত মানও তার বিভিন্ন।

প্রোটিন-সমন্বিত খাদ্যের কথা আবিষ্কৃত হবার পর বিজ্ঞানীরা একটা নতুন পথের সন্ধান পেলেন। বিভিন্ন প্রোটিনের বিবিধ উপাদান নির্ণয়ে ব্রতী হলেন। সেই উপাদানকে বলে অ্যামিনো অ্যাসিড। কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাদের বলে এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড। খাদ্যে এই এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড থাকতেই হবে। যেহেতু সব প্রোটিনে সব রকম এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না সেইহেতু প্রোটিন-খাদ্যের গুণাগুণেও পার্থক্য দেখা যায়।

ছয়: নারীর ভূমিকা ছিল

আজ থেকে সাত হাজার কি আট হাজার বছর আগে মানুষের জীবনধারায় একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটেছিল। সেই বিপ্লবের ফল আজও আমরা ভোগ করছি, করব অনন্তকাল। কিন্তু সেই বিপ্লব যারা ঘটিয়েছিল তারা তার সুদূরপ্রসারী ফল সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অবহিত ছিল না। মানুষ তখন ছিল অরণ্যচারী কি গুহাবাসী শিকারী। তারা বনে বনে ঘুরে পশুর পশ্চাদ্ধাবন করত আর প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র আর প্রস্তরশীর্ষ তীর ও কুড়ুল এবং লাঠি ইত্যাদি দিয়ে পশুহত্যা করত। সেই নিহত পশুর মাংসেই তারা জীবনধারণ করত। তারা ছিল মূলত মাংসাশী। তবে প্রয়োজনে ফুল ফল পাতা বীজ প্রভৃতিও তারা সংগ্রহ করত। এককথায় খাদ্যান্বেষণে তারা ছিল একই সঙ্গে শিকারী ও সংগ্রাহক—হাণ্টার-গ্যাদারার।

অরণ্যচারী মানুষের পশুশিকারে নারী কিন্তু পুরুষের সহচর ছিল না। পশুশিকারের কঠিন দুঃসাহসিক বিপজ্জনক পথে নারীরা পা বাড়াত না। তারা থাকত তাদের আদিম গৃহে এবং বন থেকে ফল মূল কন্দ আদি বনজ খাদ্য আহরণ করত। পুরুষরা প্রতিদিন শিকার যে পাবেই এমন নিশ্চয়তা ছিল না। কখনও কখনও তাদের শূন্য হাতে ফিরতে হত। তখন, অনুমান করা যায়, নারীদের সংগৃহীত বনজ খাদ্যে তারা ভাগ বসাত। এইভাবে বন্য মানুষ ক্রমশ উদ্ভিজ্জ খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

তারপর যখন শিকার দুর্লভ হল, মাংসে টান পড়ল তখন খাদ্যের অভাব মেটাতে মানুষ সংগ্রহ করতে লাগল বুনো ঘাসের বীজ—আমাদের আজকের খাদ্যশস্যের পূর্বপুরুষ। পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনো অংশে তা পাওয়াও যেত প্রচুর পরিমাণে। সেখানে সবচেয়ে বেশি হত বুনো গম, তারপর কিছু কম পরিমাণে বুনো এমার, যব প্রভৃতি। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন আর ইরান এবং উত্তর আফ্রিকায় এইসব বুনো শস্য যথেষ্ট দেখা যেত। প্যালেস্টাইনে ফসল কাটার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে মাউণ্ট কারমেল গুহায়। কিন্তু সে ফসল আপনি গজানো, না চাষ করে জন্মানো তার প্রমাণ মেলে নি।

বাইবেল থেকে এ ব্যাপারে কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে: "And this *shall be* a sign unto thee, ye shall eat this year such

things as grow of themselves, and in the second year that which springeth from the same ; and in the third year sow ye and reap and plant vineyards and eat the fruits thereof" (2 Kings xix. 29).

তবে এটা রূপকও হতে পারে। লোকজীবনে এমন রূপক নেহাৎ কম নেই। রূপক, রূপকথা, উপকথা, লোকগাথা যেখানে যা-ই থাকুক তার সত্যমিথ্যার প্রশ্ন বাদ দিলে মানবসভ্যতার বিবর্তনে মানুষের তীব্র অনুসন্ধিৎসা, অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা, বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং শৃঙ্খলাবিহীন নিরাপত্তাশূন্য জীবনযাত্রাকে সহজ স্বাভাবিক ও সুনিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টাতেই শিকারী ও সংগ্রাহক যাযাবর মানুষ কৃষিকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং শেষে গৃহী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার ফলে গড়ে উঠেছিল সমাজ, মানুষের একত্র বসবাস, পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা, শ্রমের বণ্টন। এইভাবে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। মানবসভ্যতায় কৃষিকে তাই প্রথম বিপ্লব বলা চলে।

আদিম মানুষ কীকরে সেই বিপ্লব ঘটাল, কীভাবে পশুশিকার, মৎস্যশিকার ও বনজ খাদ্য-আহরণের স্বভাব ত্যাগ করে চাষ-আবাদে মনোনিবেশ করল আমরা জানি না। এ বিষয়ে অনেক চিত্তহারী কল্পনা আছে। তার অনেক-গুলিই সম্ভব মনে হয়, কিন্তু প্রমাণিত হয় নি কোনোটাই।

তবে এই পরিবর্তনের পিছনে নারীর যে একটা ভূমিকা ছিল, নারীর হাতেই যে কৃষিকাজের সূচনা একথা বোধ হয় অনস্বীকার্য। এমন হতে পারে যে, বন্যশস্য আহরণ করে নিয়ে যাবার সময় পথের উপর কি পথের ধারে কোনো নারীর হাত থেকে কিছু শস্য পড়ে গিয়েছিল, তারপর একদিন সেই বীজ থেকে নতুন গাছ হতে দেখে, তাতে ফসল ধরতে দেখে সেই নারী ও তার সঙ্গীরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল।

আবার এমনও হতে পারে যে, একদিন কোনো পুরুষ শিকার না পেয়ে শূন্য হাতে গৃহে ফিরে আহারের সময় নারীর সংগৃহীত বনজ খাদ্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল ; আহার্য সংগ্রহের দায় পুরুষের, নারীর সংগৃহীত আহার্য মুখে তুলতে তার পৌরুষের অহঙ্কারে লেগেছিল—ক্ষিপ্ত হয়ে সে ফসলের ডালি দূরে অঙ্গনে নিক্ষেপ করেছিল। তারপর একদিন সেই ফেলে দেওয়া বীজ থেকে নতুন গাছ জন্মাল, তাতে নতুন ফসল ধরল—তখন তারা চমকিত হল। কিন্তু আহত নারী আরও কিছু করল। একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে গর্ত করল, গর্তের মধ্যে

একদানা শস্য ফেলে দিল, তারপর পা দিয়ে চেপে দিল সেই গর্ত। শেষে একদিন দেখল সেই গর্ত থেকে চারা উঠেছে, চারা বড়ো হয়েছে—তাতে ফসল ধরেছে।

এইভাবে জন্ম হল কৃষির, নতুনতর এক জীবনযাত্রার। তারই সঙ্গে জন্ম হল বিপরীত একটি দিকের—মানুষের উপর মানুষের শোষণের। মানুষে মানুষে নতুন যে সম্পর্ক গড়ে উঠল সে সম্পর্ক শোষক ও শোষিতের। **Exploitation** বা শোষণেরও জন্ম কৃষিসভ্যতার প্রথমদিন থেকেই।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ খাদ্য উৎপন্ন করত না, খাদ্য সংগ্রহ করত। তাই তাদের বলা হয়, 'ফুড গ্যাদারার' অর্থাৎ 'খাদ্য সংগ্রাহক'। প্রায় সারা জীবন তারা খাদ্যের অন্বেষণেই কাটাত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে খাদ্য ছিল পশুমাংস। প্রথমে কাঁচা মাংসই ছিল তাদের খাদ্য। একসঙ্গে অনেক বেশি মাংস পাওয়া যায় এবং অনেক দিন নিশ্চিন্ত থাকা যায় বলে বড়ো বড়ো পশুই তারা শিকার করত। শিকার বেশি হলে, বেশি মাংস পাওয়া গেলে তারা গুরুভোজন করত। কাল কী হবে ভাবত না। উদ্ভিজ্জ খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তাদের লক্ষ্য ছিল বড়ো ফল, বড়ো কন্দ, বড়ো পাতা।

তারপর জনসংখ্যা যখন বাড়ল, খাদ্য যখন অপ্রতুল হল তখন ক্ষুধার তাড়নায় তারা হীনবল পশু ধরার জন্য জাল আর ফাঁদ আবিষ্কার করল, হাতি আর অন্যসব বড়ো বড়ো জন্তু ধরার জন্য ঘাসে-ঢাকা গর্তের আশ্রয় নিল। ক্ষুধার সময় হাতের নাগালে তারা যা পেত তা-ই বধ করে খেত—তা সে জলচর, ভূচর কি খেচর যে প্রাণীই হোক না কেন। এমন কি, পোষা জীবজন্তুদেরও তারা রেহাই দিত না। নিদারুণ খাদ্যাভাবে মানবশত্রুর দেহমাংস কিংবা আপন গোষ্ঠীরই কোনো বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা সহচরকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণেও তাদের অনাগ্রহ ছিল না।

মানবেতিহাসে হোমো স্যাপিয়েন্স অর্থাৎ বর্তমানে যে মানবগোষ্ঠী পৃথিবীতে আছে তাদের আবির্ভাব কতকাল আগে, সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। পণ্ডিতদের অনুমান, প্রায় ৬০,০০০ বছর আগে অর্থাৎ তুষারযুগ যখন শেষ হয় হয় তখন তাদের আবির্ভাব। প্রথম যুগে তারা গণ্ডার আর ম্যামথ নামে অধুনালুপ্ত অতিকায় এক জাতীয় হাতি বধ করে তাদের মাংস খেত। পরবর্তী কালে তারা ম্যামথ বধ করত, কিন্তু তার দেহের সব অংশ খেত না, কেবল নরম পেশী, যকৃৎ আর মস্তিষ্কই ছিল তাদের ভক্ষ্য। আরও পরবর্তী যুগে তাদের খাদ্য ছিল প্রধানত বল্গাহরিণ আর অশ্ব, সেইসঙ্গে নানাজাতের মাছ। সম্ভবত কিছু উদ্ভিজ্জ খাদ্যও ছিল, কারণ তাদের গুহার দেওয়ালে উদ্ভিদের চিত্র পাওয়া গেছে।

হোমো স্যাপিয়েন্সের খাদ্যে শস্যের ব্যবহার অন্তত ২০,০০০ বছর আগে এবং এটা প্রায় নিশ্চিত যে, ইউরেশিয়ার জোয়ার আর অ্যামেরিকার ভুট্টার আদিম প্রজাতি তখনকার কালেও পাওয়া যেত।

আজ থেকে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে পৃথিবীর আবহাওয়া ধীরে ধীরে উষ্ণ হতে শুরু করে। তুষারযুগের অবসান ঘটতে থাকে। ইয়োরোপে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড়ো ফল দেখা দিল তুন্দ্রা অঞ্চলে ধীরে ধীরে বনভূমির সৃষ্টি। তাতে লতাপাতাভোজী কিছু প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গেল এবং বনভূমির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পশুচারণভূমি কমে গেল তেমনি মাংসাশী প্রাণীরা আশ্রয় পেল।

আজ থেকে প্রায় ৭,০০০ বছর আগে পর্যন্ত ইয়োরোপের মানুষ ছিল প্রধানত খাদ্যসংগ্রাহক। তবে তখন তারা আর বড়ো বড়ো জন্তুর মাংস খেত না। উত্তরাঞ্চলের জল উষ্ণ হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রাচুর্য ছিল। তাছাড়া জলকুক্কুট, ডিম, সামুদ্রিক প্রাণী, খরগোশ, শামুক, সাপ, ফলমূল, উদ্ভিদ প্রভৃতি খাদ্যও ছিল পর্যাপ্ত। তবে হরিণ, বনগাই, বরাহ প্রভৃতি প্রাণীও তাদের শিকার্য ছিল।

তুষারযুগের শেষে পূর্ব এশিয়ার মানুষ আর পশুরা ঊষরতার কারণে তাদের পূর্ব বাসভূমি ছেড়ে নদী, হ্রদ আর সাগরের আশেপাশে জড়ো হতে বাধ্য হল। হঠাৎ খৃষ্টপূর্ব ৮০০০ অব্দ নাগাদ মানুষ আবিষ্কার করল গাছ থেকে মাটিতে যে বীজ পড়ে, কয়েক মাস পরে তা থেকে নতুন ফসল পাওয়া যেতে পারে। জন্ম হল কৃষির। পূর্ব এশিয়ার মানুষ 'ফুড গ্যাদারার' থেকে 'ফুড প্রোডিউসার' হল। পরে ইয়োরোপের মানুষও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। সমাজবদ্ধ জীবনে মানবসভ্যতার সূচনা হয়তো এখানেই।

ফুড গ্যাদারাররা যত জীবজন্তু আর শাকসবজির কথা জানত, আজকের দিনের সাধারণ মানুষ তার চেয়ে খুব বেশি জানে না। আজকের মানুষ খুব বেশি নতুন পশুকে পোষ মানায় নি, আজ আমরা যেসব নতুন শাকসবজি দেখি তার অধিকাংশই সেই ফুড গ্যাদারিংয়ের কালের লতাগুল্ম থেকে উদ্ভূত। যুগ যুগ ধরে বিবর্তনের ফলে উদ্ভিদ, ফুল-ফল-পাতা সবেরই পরিবর্তন ঘটেছে, প্রজননের পথে এসেছে পরিবর্তন। প্রাকৃতিক নির্বাচনে ও বিপ্রতীপ প্রজননে দেখা দিয়েছে নতুন নতুন জাতের ফুল-ফল-উদ্ভিদ। কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীন ফুলফলের অধিকাংশই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জানা ছিল।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাছে খাদ্যের ব্যাপারে একদিক থেকে আমরা ঋণী।

কোন্‌টা খাদ্য আর কোন্‌টা অখাদ্য তা আমরা তাদের কাছ থেকেই শিখেছি। তারাই প্রথম খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করেছে। আজ আমাদের প্রয়োজন মেটাতে যে অযুত প্রকারের খাদ্য রয়েছে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ তার প্রায় সবই ব্যবহার করেছে। খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করতে তাদের মাশুল দিতে হয়েছে প্রচুর। খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ে তারা আমাদের 'গিনিপিগ'। তাদের উপর দিয়েই আমরা পরীক্ষা সেরে নিয়েছি। তাদের উপর পরীক্ষায় যেসব জিনিস খাদ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, এখন আমরা নির্ভয়ে নিরাপদে তা ব্যবহার করে চলেছি। প্রথমে তারাও জানত না, কোন্‌টা খাদ্য আর কোন্‌টা অখাদ্য। অনেক সময় খাদ্য ভেবে বিষাক্ত জিনিস খেয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কখনও কখনও প্রাণও দিয়েছে। তারপর সে জিনিস আর তারা মুখে তোলে নি।

এমনও হতে পারে, নিশ্চয়ই হয়েছে, তারাও গিনিপিগ হিসাবে মনুষ্যেতর প্রাণী ব্যবহার করে খাদ্যাখাদ্য যাচাই করেছে। অন্য প্রাণীকে কোনো জিনিস খাইয়ে দেখেছে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা। না হলে তারা নিজেরা তখন খেয়ে দেখেছে, খাদ্য হিসাবে চলে কিনা। চললে চালিয়েছে, না চললে বাতিল করে দিয়েছে।

সাত: কাস্পিয়ানের তীরে

পৃথিবীতে কৃষিকাজের সূচনা খৃষ্টপূর্ব ৮০০০ থেকে ৭০০০ অব্দের মাঝে। বেচাকেনার জন্য চাষ-আবাদের শুরু খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৬০০০ অব্দে, কাস্পিয়ান সাগরের তীরে। তার অন্তত হাজার বছর পরে পৃথিবীর অন্যত্র চাষ-আবাদ আরম্ভ হয়। কাস্পিয়ান সাগরের পর ইরানী মালভূমি অর্থাৎ পারস্যে এই জাতীয় চাষের কাজ শুরু হয়। সিন্ধুনদ থেকে নীলনদের বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এইভাবে খাদ্য-উৎপাদন প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে মোটামুটি একই সময়ে। তখনই Fertile Crescent-এর ক্রম-উদ্ভব। Fertile Crescent-এর আরম্ভ মিশর থেকে এবং তা প্রসারিত পূর্বে সিন্ধুনদ পর্যন্ত। মাঝে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি বিশাল ভূভাগ। এই উর্বর ভূভাগে প্রথম কৃষিজ উৎপাদন তণ্ডুলজাতীয় শস্য। প্রথমে উৎপন্ন হয় গম আর যব, পরে রাই, ধান আর ওট। গম ধান যব ওট আর জোয়ারের ব্যবহার চলে আসছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, রাইয়ের চল প্রাচীন রোম ও গ্রীসের সময় থেকে, আর ভুট্টা পাতে উঠেছে অ্যামেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে।

নীল আর টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস উপত্যকার মতো সিন্ধু উপত্যকাতেও খাদ্য-উৎপাদনের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছিল। সিন্ধু উপত্যকায় তখন প্রধান খাদ্য ছিল চাল আর গম। তুষারযুগের পর ভারতে যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় তখন গম, যব আর খেজুরের চাষ হত। ধানের চাষ, এতদিন বলা হয়েছে, চীনে আর ভারতে প্রায় একই সময়ে শুরু হয়, খৃষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ নাগাদ—এবং এই দুই দেশই ধানের জন্মভূমি। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ৮,০০০ বছর আগে ভারতে এলাহাবাদের কাছে যে ধানচাষ হত, সম্প্রতি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেখানে পাথরের ও কাঠের তৈরি কাস্তে ছুরি কোদাল আর লাঙলের মতো ছোটো ছোটো যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন।

আখের জন্মও ভারতে, তুষারযুগের পরে। বিদেশী লেখকদের কথায় জানতে পারি, "Sugar-cane was an early product of postglacial India, as were many native fruits that grew well. Fruits such as grapes, peaches, pears, plums, oranges, and mulberries were

preserved with sugar and traded to the Arabs for spices. Native mustard and ginger also added flavor to the Indian meat." এবং "Long before the time of Buddha, the Hindus raised cattle for domestic consumption. Other animal fare included the antilope, pig, dog, buffalo, sheep, and above all the hen. The world is indebted to India for poultry." (Lowenberg and others).

বিশ্বসভ্যতার ভিত্তিভূমি গঠনে যেসব তণ্ডুলজাতীয় শস্য সাহায্য করেছে তার মধ্যে প্রধান ধান গম রাই যব ভুট্টা জোয়ার বাজরা আর জই। উদ্ভিদবিজ্ঞানের দিক থেকে এসবই ঘাসজাতীয় ফসল।

এইসব ঘাসজাতীয় ফসলকে, ছোটো ছোটো বীজদানাকে মানুষ একদিনে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে নি। কারণ, খাদ্যের ব্যাপারে psychological acceptance একটা বড়ো জিনিস—বড়ো বড়ো মাংসখণ্ড থেকে একেবারে ছোটো ছোটো বীজদানা, খুব সহজে মেনে নেওয়া যায় না। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, গম যব ইত্যাদি শস্যবীজকে খাদ্য হিসাবে মেনে নিতে মানুষের সময় লেগেছিল অন্তত ২০০০ বছর।

অতি প্রাচীনকালে অরণ্যচারী আর গুহাবাসী মানুষ যখন পশু শিকার করে বেড়াত এবং পশুমাংসই তাদের খাদ্য ছিল তখন তাদের আহারসংস্থান ছিল অনিশ্চিত এবং শ্রমসাধ্য। পরে তারা যখন দেখল, এইসব শস্য অনায়াসে, অতি সহজে জন্মানো যায় এবং তা থেকে উৎকৃষ্ট খাদ্য পাওয়া যায়—তার চেয়েও বড়ো কথা, এই খাদ্য এক ঋতু থেকে আর-এক ঋতু পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়—তখন যাযাবর মানুষের দল এক জায়গায় বসতি করল। আগে পশুর সন্ধানে ও তার পশ্চাদ্ধাবনে অনেক সময় কেটে যেত, এখন তাদের হাতে প্রচুর সময়। সেই অবসর সময়ে তারা শিল্প, কলা ও বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করল; তারা প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণে, ঋতুপরিবর্তনের রহস্য-উন্মোচনে, আকাশের গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান-নির্ণয়ে, দিনরাত্রির পালাবদলের কারণ-অনুসন্ধানে এবং প্রকৃতির আরও অযুত বিস্ময়ের নিরসনে অভিনিবিষ্ট হল।

আধুনিক পাঁউরুটি আবিষ্কৃত হবার বহু আগে মানুষ পরিজের আকারে এইসব তণ্ডুলজাতীয় শস্য খেত। তারপর চিঁড়ের আকারে। আজও আফ্রিকার কোনো কোনো সম্প্রদায় এইসব শস্য দিয়ে পরিজ কিংবা মণ্ড তৈরি করে খায়।

পাঁউরুটির পূর্বরূপ বলা যায়, স্কটল্যাণ্ডবাসীদের ওটকেক, ভারতীয়দের চাপাটি আর ইহুদীদের ম্যাটজো। গমের ময়দার পাঁউরুটি তৈরি হয় প্রথমে মিশরে, তারপর গ্রীসে, তার অনেক পরে রোমে।

আট : লাভোয়াশিয়েরের মোমবাতি

জীবদেহের মূল একক হচ্ছে কোষ। সব কোষ আকারে সমান নয়। প্রায় ০.১ মাইক্রন ($১০^{-৭}$ মিটার অর্থাৎ এক মিটারের এক কোটি ভাগের এক ভাগ) থেকে বড়ো একটা পাখির ডিম পর্যন্ত বহু আকারের কোষ আছে। আকারে আয়তনে এবং কর্মপ্রকৃতিতে একটি কোষের সঙ্গে আর-একটি কোষের পার্থক্যও অনেক। অতি ক্ষুদ্র একটি কোষও অত্যন্ত সংগঠিত জটিল বস্তু এবং তার ক্রিয়া একটি রাসায়নিক যন্ত্রের মতো।

কোষের পরিচয় প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন লিউ-এন হুক। ১৬৬৫ সালে তিনি তাঁর 'মাইক্রোস্কোপিয়া' গ্রন্থে কর্কের কৌষিক গঠনের কথা বর্ণনা করেন। এর প্রায় ২০০ বছর পরে কোষতত্ত্ব আধুনিক জীববিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জীববিজ্ঞানীরা আধুনিক জীববিজ্ঞানের সূচনাকাল বলতে সাধারণত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল ধরেন। ১৮৩৯ সালে থিয়োডোর শ্বান বলেন, 'all organisms are composed of essentially like parts, namely, of cells.' অর্থাৎ, সকল জীবদেহই কোষ নামক বহু সমরূপ অংশ দ্বারা গঠিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আধুনিক রসায়নের প্রতিষ্ঠা হলে জীবদেহ একটা রাসায়নিক যন্ত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়।

লাভোয়াশিয়ের প্রথম দেখান, একটা মোমবাতি আর একটা প্রাণী উভয়েই যে পরিমাণ অকসিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অকসাইড তৈরি করে সেই পরিমাণের হিসাবে প্রায় সমপরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে—'both a candle and an animal produce heat in almost equal amounts in accordance with the oxygen consumed and the carbon dioxide produced.'

অকসিজেন আবিষ্কার করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিসলি। তিনি দেখান, সবুজ উদ্ভিদ অকসিজেন তৈরি করে এবং কার্বন ডাই-অকসাইড গ্রহণ করে। এই ব্যাপারটি থেকে এবং পরবর্তী কালের হাজার হাজার বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে আজ আমরা অনায়াসে জৈবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলিকে রসায়নের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারি।

আজ আমরা সুস্পষ্টভাবে জানি, আমরা যে কাজই করি না কেন, তাতে

আমাদের শরীরের ক্ষয় হয়। চলাফেরা, ওঠাবসা, দৌড়নো, ব্যায়াম করা প্রভৃতি যে কোনো কাজ করার সময়েই দেহের মাংসপেশী নিয়ত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লেখাপড়া, চিন্তাভাবনা প্রভৃতি মানসিক কাজেও মস্তিষ্ক ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের ক্ষয় হয়। যদি কখনও কারও ওজন নিয়ে তারপর তাকে কোনো কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে দেওয়া হয় এবং কাজের শেষে আবার তার ওজন নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে তার ওজন কিছুটা কমে গেছে। এইভাবে ওজন কমার কারণ আমাদের দেহের ভিতর সর্বক্ষণ এক-প্রকার দহনক্রিয়া চলছে এবং তার জন্য দেহের ক্ষয় হচ্ছে। যত বেশি পরিশ্রমের কাজ করা যাবে তত বেশি দহনক্রিয়া হবে এবং দেহের ক্ষয়ও তত বেশি হবে। আমরা যদি প্রত্যক্ষভাবে কোনো পরিশ্রমের কাজ না-ও করি, তবু আমাদের দেহ মৃদু হারে নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তার কারণ, আমাদের শরীরের অনেক কাজ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকলেও হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি যন্ত্র আমৃত্যু নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায় এবং তার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়।

আমাদের দেহ যে অবিরত দগ্ধ হয় তার বড়ো প্রমাণ, কাঠ কিংবা কয়লা পুড়লে যেসব জিনিস উৎপন্ন হয়, আমাদের দেহের ভিতর দহনক্রিয়ার দরুন ঠিক সেইসব জিনিস সৃষ্টি হয়। তবে পার্থক্য—কাঠ কিংবা কয়লা পুড়লে তাপ ও আলো দুই-ই পাওয়া যায়, কিন্তু দেহের দহনে কেবল তাপই মেলে, আলো মেলে না। দেহের দহন চলে অতি মন্থর গতিতে, এই দহনে তাপ উৎপন্নও হয় কম। তাই এই জাতীয় দহনকে বলে মৃদু-দহন।

জীবন্ত প্রাণীর দেহ যে উষ্ণ তার কারণ এই দহনক্রিয়া। মৃত প্রাণীর দেহে শ্বাসক্রিয়া থাকে না বলে দেহের ভিতর অকসিজেন প্রবেশ করতে পারে না। ফলে দেহের ভিতর দহনক্রিয়া হয় না এবং তাপের অভাবে দেহ শীতল হয়ে পড়ে। তবে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর দেহ যে জীবন্ত অবস্থাতেও শীতল তার কারণ ভিন্ন।

আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা লাভোয়াশিয়ের দহনের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে মৌলিক গবেষণা করে গেছেন, পুষ্টিবিজ্ঞানকে তা একটা দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছে। তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, কতকগুলি পদার্থ যখন পোড়ানো হয় কিংবা প্রচণ্ড তাপে তাপিত করা হয় তখন সেই প্রক্রিয়ায় অকসিজেন গ্যাস ক্ষয় হয় এবং অন্য এক গ্যাস উৎপন্ন হয়। সেই গ্যাস তখন

'ফিক্সড এয়ার' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে এই গ্যাসের নাম দেওয়া হয় কার্বন ডাই-অকসাইড। লাপ্লাস নামে আর-একজন বিশিষ্ট ফরাসী বিজ্ঞানীর সঙ্গে একত্রে কাজ করে লাভোয়াশিয়ের দেখান যে, কোনো ক্ষুদ্র প্রাণীকে একটা বন্ধ পাত্রে রেখে দিলেও এই একই ব্যাপার ঘটে অর্থাৎ সেই পাত্রের অকসিজেন শেষ হয়ে যায় এবং তার জায়গায় কার্বন ডাই-অকসাইড পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায়, জীবন্ত প্রাণীর দেহের ভিতর দহনের মতো কিছু ঘটে যার ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। লাভোয়াশিয়ের এই পরীক্ষায় উৎসাহিত হয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর পরিবর্তে মানুষ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন—পার্থক্য শুধু এই যে, মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ একটা মুখোশের ভিতর দিয়ে চালানো হয়। লাভোয়াশিয়ের এ ক্ষেত্রেও ঐ একই ফল পান। তিনি আরও দেখান, মানুষ যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখন যে পরিমাণ অকসিজেন সে গ্রহণ করে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অকসিজেন তাকে গ্রহণ করতে হয় যখন সে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ, কাজ করার সময় বেশি অকসিজেনের দরকার হয়।

এইসব পরীক্ষা থেকে সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, কোনো জীব—তা সে মানুষই হোক কি মনুষ্যেতর কোনো প্রাণী—যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন সেই খাদ্যের দহন অর্থাৎ অকসিডেশন ঘটে এবং তার ফলে তাপ ও শক্তি নির্গত হয়। এই তাপ আর শক্তিই জীবকে চালায়।

অতএব দেহকে যদি একটা যন্ত্র ধরি তাহলে খাদ্য তার জ্বালানি। খাদ্যকে অনেক সময় 'দেহের জ্বালানি'-ও বলা হয়। স্টীম এঞ্জিনে যেমন কয়লা জ্বলে তেমনি আমাদের দেহেও খাদ্য 'জ্বলে' অর্থাৎ তার দহন বা অকসিডেশন ঘটে। তুলনাটা সহজ হলেও স্টীম এঞ্জিনে কয়লা জ্বলার মতো দেহের ভিতর খাদ্যের দহন ঘটা অত সহজ নয়। বরং অনেক বেশি জটিল। এত জটিল যে, আজও তার পূর্ণ রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

লাভোয়াশিয়ের যদি আরও কিছুদিন বাঁচতে পারতেন তাহলে কী হত বলা যায় না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব তাঁকে বাঁচতে দিল না। তার ফলে বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হল তা অপরিমেয়।

লাভোয়াশিয়েরের আয়ুষ্কাল ১৭৪৩ থেকে ১৭৯৪। তাঁর কালে ফরাসী দেশে বেশ কয়েকজন বেতনভুক বিজ্ঞানী ছিলেন। সরকার অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁদের বেতন দেওয়া হত। লাভোয়াশিয়ের নিজেও সরকারী চাকুরে ছিলেন। ফরাসী স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর জন্য যে বারুদ তৈরি হত তাঁর কাজ ছিল

তার তত্ত্বাবধান করা। প্যারিসের অস্ত্রাগারে তাঁর একটা গবেষণাগার ছিল। সরকার থেকে যে অর্থ পাওয়া যেত তাতে তাঁর গবেষণাকর্মের খরচ মিটত না, তাঁর গবেষণার অধিকাংশ খরচই তাঁকে চালাতে হত নিজের পকেট থেকে। ধনী না হলে এমনটা সম্ভব নয়, লাভোয়াশিয়ের প্রকৃতপক্ষে ধনীই ছিলেন। সরকারের কর আদায় করতেন যে ধনিক সংস্থা তিনি তার সদস্য ছিলেন এবং তা থেকে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হত। কিন্তু এই সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাটাই পরবর্তী কালে তাঁর সর্বনাশের কারণ হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় ১৭৯৪ সালে তাঁকে এবং তাঁর অন্য প্রায় সকল সহযোগীকে গিলোটিন করে হত্যা করা হয়। বিচারের সময় তাঁর প্রাণরক্ষার আবেদন জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, মানবসমাজে তাঁর অসামান্য প্রয়োজন আছে, সুতরাং তাঁর প্রাণ রক্ষা করা হোক। উত্তরে বিচারক বলেছিলেন, "এই প্রজাতন্ত্রে বিজ্ঞানীদের কোনো প্রয়োজন নেই। বিচার তার আপন পথেই চলবে।" যেদিন লাভোয়াশিয়েরের শিরশ্ছেদ হয় সেদিন তাঁর এক বন্ধু বধ্যভূমিতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি বলেছিলেন, "ঐ মাথাটা কেটে ফেলতে এক মুহূর্ত মাত্র সময় লেগেছে, কিন্তু ঐরকম আর একটা মাথা তৈরি হতে কয়েক শ বছর সময় লাগবে।"

আগেই বলেছি, আমরা কোনো পরিশ্রমের কাজ করি আর না-ই করি, আমাদের শরীর নিয়ত ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়ের যথোচিত পূরণ না হলে শরীর কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়ে—এবং শেষে মৃত্যু ঘটে। এখন দেখা যাক, কীভাবে এই ক্ষয় পূরণ হয়।

ষ্টীম এঞ্জিন চালাতে যেমন কয়লার প্রয়োজন হয় এবং একবার কয়লা পুড়ে গেলে আবার কয়লা দিতে হয় তেমনি আমাদের এই দেহযন্ত্র চালানোর জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এবং বার বার আমাদের খাদ্য খেতে হয়। খাদ্য পরিপাক হলে তা রক্তে শোষিত হয়ে শরীরের সর্বত্র পরিচালিত হয় এবং শরীরের যে স্থানে যে জিনিসের যতখানি অভাব সেই স্থান রক্তের জীর্ণ খাদ্য থেকে ততখানি সেই জিনিস টেনে নেয়। এইভাবে শরীরের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধন হয়।

খাদ্য ও অকসিজেন দুই-ই রক্ত থেকে কোষে যায় এবং কোষে যে দহনক্রিয়া হয় তা থেকে আমরা তাপ ও কাজ করার শক্তি পাই। আমরা সচরাচর যেসব খাদ্য খেয়ে থাকি তার ভিতর আমাদের শরীরের সমস্ত উপাদানই বর্তমান থাকে, সুতরাং খাদ্যগ্রহণই শরীরের ক্ষয়পূরণ ও শক্তিসংস্থানের একমাত্র উপায়।

শরীরের ক্ষয়পূরণ ছাড়া বৃদ্ধিসাধনের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন। সদ্যোজাত

শিশু দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করে যথাকালে যে একজন পূর্ণদেহী মানুষে পরিণত হয় তার এই বৃদ্ধির রসদ যোগায় খাদ্য।

মানুষের দেহ একটা যৌগিক বস্তু। অসংখ্য জটিল জৈব যৌগ পদার্থের সমন্বয়ে এই দেহ গঠিত—এবং তার মধ্যে জীবন আছে বলে জৈবিক বস্তু। ইংরেজী করে বললে মানুষের দেহটাকে বলা যায় একটা biological system, এবং এই জৈবিক বস্তু বেঁচে থাকে অন্য নানাবিধ জৈবিক বস্তুকে পৌর্ণিক অথবা আংশিকভাবে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এ নিয়ম সৃষ্টির আদিকাল থেকে এবং এখনও এই নিয়ম বিদ্যমান। মানুষ এখনও একটা বায়োলজিক্যাল সিস্টেম, তাকে বেঁচে থাকার জন্য ও সন্তান উৎপাদন করার জন্য অন্যান্য বায়োলজিক্যাল সিস্টেমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতেই হবে।

অন্য সকল জীবের মতো মানুষেরও দুটি মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি—উদ্বর্তন আর বংশবিস্তার। বেঁচে থাকার জন্য তার আহারেচ্ছা আর সন্তান-উৎপাদনের জন্য তার যৌনকামনা। দুটিই তৃপ্তিকর ও মনোরম—এবং বিস্তারিত না জেনেও উপভোগ করা যায়।

জীবদেহ ও উদ্ভিদদেহ প্রধানত কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, লবণজাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, জল ও অগণিত জৈব পদার্থ সহযোগে গঠিত। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে লবণজাতীয় পদার্থে শরীরের কাঠামো তৈরি হয়, ফ্যাট ও কার্বো-হাইড্রেট শক্তি উৎপন্ন করে এবং প্রোটিন নতুন মাংসপেশীর নির্মাণ ও পুরনো মাংসপেশীর ক্ষয়পূরণ করে। প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি শরীরের ভিতর ইতস্তত বহন করতে ও ব্যবহৃত অপ্রয়োজনীয় অংশ বার করে দিতে জলের প্রয়োজন। এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, এঞ্জিন যাতে ভালোভাবে চলে তার জন্য যেমন লুব্রিক্যান্ট বা তেলের দরকার, অনেকের অনুমান আমাদের দেহে ভিটামিনের দরকার অনেকটা সেইরকম।

এঞ্জিনে যেমন কয়লা পুড়ে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়, জীবদেহেও তেমনি গ্লুকোজ ও অন্যান্য দাহ্য বস্তু বাতাসের অকসিজেনের সাহায্যে মৃদু দগ্ধ হয়ে তাপ সৃষ্টি করে। ঐ তাপের কিয়দংশ শরীরের তাপ রক্ষা করে এবং অবশিষ্টাংশ শরীরের যাবতীয় যন্ত্রের পরিচালনে ও বাইরের শ্রমসাধ্য কাজে ব্যয়িত হয়। পৃথিবীর অগণিত জীবের শরীরযন্ত্রের পরিচালনায় কত কোটি টন শর্করা ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ প্রয়োজন, অনুমান করাও কঠিন।

এই বিপুল পরিমাণ শর্করা আসে কোথা থেকে? বিজ্ঞানীরা বলেন,

বৃক্ষপত্রের সবুজকণিকা অর্থাৎ ক্লোরোফিল সূর্যকিরণের সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাসকে বৃক্ষপত্রের ভিতরকার জলের সমাবেশে প্রথমে ফর্ম্যাল-ডিহাইড ও পরে তা থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্বন ডাই-অকসাইডের অকসিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়। জীবদেহ অবিরাম কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস পরিত্যাগ করে আর উদ্ভিদ সেই কার্বন ডাই-অকসাইড থেকে কার্বন ব্যবহার করে আবার বাতাসে অকসিজেন ছেড়ে দেয়। অবশ্য উদ্ভিদও জীবের মতো শ্বাসপ্রশ্বাসে বাতাস থেকে সামান্য পরিমাণ অকসিজেন নিয়ে ব্যবহার করে আর কার্বন ডাই-অকসাইড ত্যাগ করে।

এইভাবে উদ্ভিদ অফুরন্ত কার্বন ডাই-অকসাইড পায় আর তা সতত শর্করায় পরিণত করে। কিন্তু শর্করা সহজেই জলে দ্রবীভূত হয় ও তার স্বাদ মিষ্টি বলে তা সঞ্চয় করে রাখা কঠিন। তবে প্রকৃতি এক অদ্ভুত নিয়মে তা সঞ্চয় করার উপায় উদ্ভাবন করেছে। সেই উপায়ে শর্করা অতি সত্বর এমন এক পদার্থে পরিণত হয় যা স্বাদহীন এবং জলে দ্রব হয় না। সেই পরিবর্তিত পদার্থ শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট। চাল, ময়দা ইত্যাদি তার উদাহরণ। ধান যখন কচি অবস্থায় থাকে তখন তা রসের আকারে থাকে এবং সে রস স্বাদে মিষ্টি। পরে সেই রস যখন জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে চালে পরিণত হয় তখন তা স্বাদহীন। গোল আলু প্রভৃতিতেও শর্করা অনুরূপভাবে শ্বেতসারে পরিণত হয়।

আগেই বলেছি, জীবের দেহযন্ত্র চালাতে ইন্ধন হিসাবে শর্করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা তো কার্বোহাইড্রেট খাই, শর্করা আসে কোথা থেকে? একটা উদাহরণ দিয়ে এই রহস্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। লোকে টাকা জমাতে হলে টাকা দিয়ে সোনা কিনে রাখে এবং পরে দরকারের সময় সেই সোনা বেচে আবার টাকা করে। এ-ও অনেকটা সেই রকম। আমরা কার্বোহাইড্রেট খেলেও শরীরের লালারস আর আন্ত্রিক রসে এমনকিছু দ্রাবক আছে যার প্রভাবে কার্বোহাইড্রেট আবার শর্করায় অর্থাৎ গ্লুকোজে পরিণত হয়।

জীবদেহ ও উদ্ভিদদেহের আর-একটি প্রধান উপাদান প্রোটিন। প্রোটিনের বিশেষত্ব, তাতে নাইট্রোজেন নামে একটি মৌলিক পদার্থ থাকে এবং প্রোটিন প্রথমত উদ্ভিদই তৈরি করে। জীবের রক্তমাংস প্রভৃতি প্রোটিনজাতীয় পদার্থ। যদিও বাতাসে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে (শতকরা প্রায় ৭৯ ভাগ), তবু শুঁটিজাতীয় অল্প কয়েক রকম উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণী বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন আহরণ করতে পারে না। আমরা নাইট্রোজেন-

সমুদ্রে ডুবে আছি অথচ তার এক কণাও প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এ বড়ো বিস্ময়কর। এ যেন, "সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুখায়ব, কো দূর করব পিয়াসা?"

অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়ম সালফেট, সোডিয়ম নাইট্রেট প্রভৃতি সার থেকে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন আহরণ করে প্রোটিন তৈরি করে। ছোলা, মটর, ধঞ্চে প্রভৃতি শুঁটিজাতীয় ফসলের গাছের শিকড়ে গুঁড়ি গুঁড়ি একরকম জিনিস্ দেখা যায়, তার মধ্যে রাইজোবিয়াম নামে এক ধরনের জীবাণু থাকে—সেই জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন ধরে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণোপযোগী করে তোলে।

পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির উৎস সূর্য, আমাদের আর্য ঋষিরা যে তা সম্যকরূপে জানতেন তাঁদের গায়ত্রীমন্ত্র প্রভৃতি থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সূর্য থেকে আলোককণারূপে শক্তি এসে যখন গাছের পাতায় পাতায় খেলে যায় তখন পাতার হরিৎকণা বা ক্লোরোফিল তা শোষণ করে। হরিৎকণার সঙ্গে জল ও বাতাসের কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস এসে যোগ দেয়। তখন ক্লোরোফিল-শোষিত আলোক-তেজের কিয়দংশ কার্বন ডাই-অকসাইডের অকসিজেন-অণু গ্রহণ করে এবং তা সতেজ হয়ে বাইরে চলে আসে। জীবদেহ এই সতেজ অকসিজেন প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে কোষের ভিতর পাঠিয়ে দেয়। কোষের ভিতর কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে তার রাসায়নিক সম্মিলন হলে তার পূর্বসঞ্চিত তেজ বিকীর্ণ হয়। এই শক্তির কিয়দংশ প্রোটোপ্লাজমের যৌগিক পদার্থগুলিতে গিয়ে তাদের জীবন্ত করে তোলে এবং অবশিষ্টাংশ উত্তাপরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

মানুষ একটা জৈবিক বস্তু এবং জৈবিক বস্তুই তার খাদ্য। সমস্ত জীবন্ত বস্তুতেই সক্রিয় শক্তি আছে। অর্থাৎ, সমস্ত জীবন্ত বস্তুই সদা পরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেককেই তার নিজস্ব জীবনচক্রের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তার জন্য শক্তির প্রয়োজন। জীবন্ত বস্তুর শক্তিশীলতা বা গতিশীলতার জন্য যে শক্তির দরকার, যে শক্তি জীবনচক্রকে চালায় সেই শক্তি আসে সূর্য থেকে। আমাদের এই গোটা পৃথিবীটা একটা গতিশীল মহাকাশযান, সূর্যের চারদিকে তার নিরবচ্ছিন্ন প্রদক্ষিণ। এই পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অবিরত তাকে তাপ যোগাতে, সাগরে-মহাসাগরে জল বহাতে এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাতে যে শক্তির দরকার হয় তার উৎস দূর-আকাশের ঐ অনির্বাণ সূর্য। সূর্যই পৃথিবীর সমস্ত শক্তির আকর। সূর্যে কয়েক লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অবিরত যে নিউক্লিয়র ফিউশন রিঅ্যাকশন হয় তা থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয়।

সেই বিকিরণ পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর সকল প্রাণী—জীবজন্তু পশুপাখি মানুষ উদ্ভিদ সবকিছুকে শক্তি যোগায় আর তাতেই তাদের জীবনধারণ সম্ভব হয়। কিছু জীবন্ত বস্তু আছে যারা তাদের বৃদ্ধি, পূর্ণতাপ্রাপ্তি ও প্রজননের জন্য সরাসরি সূর্য থেকে শক্তি আহরণ করে আর কিছু জীবন্ত বস্তু আছে যারা সরাসরি সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে না, যারা পারে তাদেরই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে আপন প্রয়োজন মেটায়।

জীবন্ত বস্তুর প্রাণধারণের জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন তার প্রথম জিনিসটি হল সবুজ উদ্ভিদ। সবুজ উদ্ভিদ জল, কার্বন ডাই-অকসাইড, নাইট্রোজেন আর দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ সহযোগে সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ায় তার প্রোটোপ্লাজম অর্থাৎ প্রাণকোষের মূল উপাদান তৈরি করতে পারে। এই জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য শক্তির দরকার এবং সে শক্তি আলোকের আকারে পাওয়া চাই। সেই শক্তির কিছুটা উদ্ভিদদেহ ও বীজের মধ্যে সঞ্চিত হয় আর কিছুটা ব্যবহৃত হয় উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবনচক্রে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে সেইসব প্রক্রিয়া ঘটাতে। সালোকসংশ্লেষের একটা উপজাত হিসাবে উৎপন্ন হয় অকসিজেন গ্যাস। বাতাসের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই অকসিজেন।

আমাদের বহু খাদ্য সরাসরি সবুজ উদ্ভিদ থেকে আসে, যেমন—ধান গম যব ভুট্টা ডাল ফল শাকসবজি প্রভৃতি।

আর-এক শ্রেণীর জীব আছে যারা তাদের সকল গতিক্রিয়ার জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সবুজ উদ্ভিদ থেকে শক্তিলাভ করে। এই শ্রেণীর একটা বড়ো অংশে পড়ে প্রাণিজগৎ। তবে অতি ক্ষুদ্র নানারকম জীবাণু, বিশেষ করে অধিকাংশ ব্যাকটিরিয়া, ঈস্ট এবং ছত্রাকও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদ সরাসরি সূর্য থেকে শক্তি আহরণ করে তার খাদ্য প্রস্তুত করে; গোরু ছাগল ভেড়া হাতি ঘোড়া এবং বহু প্রজাতির পাখি পতঙ্গ মাছ ইত্যাদি সরাসরি উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে; বাঘ সিংহ প্রভৃতি প্রাণী, বাজ বক প্রভৃতি পাখি এবং কোনো কোনো জাতের মাছ বেঁচে থাকার জন্য কোনো-না-কোনো ধরনের প্রাণী খায়। আবার, উদ্ভিদও খায়, প্রাণীও খায় এমন জীবও আছে। মানুষ এই শেষোক্ত দলে। এই দলে মানুষের সঙ্গে কুকুর শুওর প্রভৃতি প্রাণীও আছে।

যেসব প্রাণী আমাদের খাদ্য সেইসব প্রাণীকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'বায়োলজিক্যাল মেশিন' অর্থাৎ 'জীবযন্ত্র' বলা যেতে পারে। এই যন্ত্রে মোটা

খাদ্য, যেমন ঘাসপাতা দানাশস্য ইত্যাদি মানুষের প্রয়োজনীয় কোমল খাদ্যে পরিণত হয়। গৃহপালিত প্রাণী তাদের খাদ্যের উপাদানগুলিকে পুঞ্জীভূত করে বিশোধিত করে। পুষ্টিবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনকে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। তবে সব প্রাণীই তা সমানভাবে করতে পারে না। কিছু প্রাণী নিম্নমানের খাদ্যকে অনেক সহজে উচ্চমানের খাদ্যে পরিণত করতে পারে। আবার, যেসব প্রাণী তাদের শাবকদের জন্য দুধ তৈরি করে তারা অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে তা করে।

দুধ তৈরি করার ক্ষমতা কেবল স্তন্যপায়ী প্রাণীর। স্তন্যপায়ী প্রাণীর শাবক যতদিন-না তার পরিবেশ থেকে খাদ্য আহরণ করে আপনা-আপনি খেতে শেখে ততদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার মাতৃস্তনে দুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকে — এবং বলাই বাহুল্য, সে দুধ অতীব পুষ্টিকর। স্বাদুতা আর পুষ্টিকরতা দুই কারণেই গবাদি পশুর দুধ অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের একটি প্রধান খাদ্য।

পাখি এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী তাদের শাবকদের স্তন্যদান করে না। দুধ প্রস্তুত করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের প্রাণের আরম্ভ একটা বদ্ধ পাত্রের ভিতর একটি নিষিক্ত ভ্রূণ হিসাবে এবং আমরা তাকে ডিম বলি। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো এই জাতীয় প্রাণীরাও ঐ বদ্ধ খোলার মধ্যে ভ্রূণের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর, সুষম খাদ্য দিয়ে দেয় এবং যতদিন পর্যন্ত-না ডিমের খোলা ভেঙে শাবক বেরিয়ে আসে ততদিন পর্যন্ত ঐ খাদ্যেই চলে যায়। সুতরাং হাঁসমুর্গি প্রভৃতি প্রাণীকে এইদিক থেকে গবাদি পশুর সঙ্গে তুলনা করা চলে, এবং তাদের ডিম পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে আমাদেরও ভক্ষ্য। ডিমের সাদা অংশ প্রধানত প্রোটিন আর কুসুমের অংশ প্রোটিন ও ফ্যাটে ভরপুর। তুলনায় দেখা যায় এই জাতীয় প্রাণীও 'জীবযন্ত্র'।

প্রসঙ্গত বলা যায়, আজকের এই গৃহপালিত মুর্গির সৃষ্টি আদিম বন্যকুক্কুট থেকে। আদিম বন্যকুক্কুট যেখানে বছরে ২০টি থেকে ২৫টি মাত্র ডিম দিত সেখানে মানুষ আজ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মুর্গিপালন করে একটি মুর্গি থেকে বছরে ৩০০ ডিম আদায় করছে অর্থাৎ দিনের হিসাবে প্রতিদিন প্রায় একটি, কখনও-বা অতিনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় দুটি।

নয় : ভয় দেখানো অন্যায়

আয়ুর্বেদবিশারদরা বলেন, আমাদের দেহের ছটি ভাববিকার—উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ। নাশ অবশ্যম্ভাবী হলেও তার বিরুদ্ধে নিয়ত অভিযান চালানোর নামই জীবনযাত্রা। নাশের বিরুদ্ধে অভিযান জীবপ্রকৃতির পরম অভিপ্রেত। উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম সাধনের জন্য এবং অপক্ষয় নিবারণের জন্য শরীরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের ধর্ম হিসাবে দেখা দেয়। এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় যা আহুতি দেওয়া হয় তা-ই খাদ্য ও পানীয়।

দেহে সতত চলমান একটা চেষ্টা বিদ্যমান থাকার নামই জীবন—এবং সেই চেষ্টার মূলে আছে খাদ্য। দেহের পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও কর্মশক্তিলাভে যে তাপ প্রয়োজন সেই তাপের সৃষ্টি খাদ্য ছাড়া হতে পারে না। আমরা প্রত্যহ খাদ্য ও পানীয় হিসাবে যা গ্রহণ করি, আমাদের দেহে তা স্থিতি ও পুষ্টিসাধন করে।

আমাদের দেহটাকে এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করেছি। বলেছি, এঞ্জিন চালাতে যেমন শক্তি প্রয়োজন এবং সে শক্তি যেমন উপযুক্ত ইন্ধন ও তাপ সহযোগে উৎপন্ন হয় তেমনি এই দেহ-এঞ্জিনের ইন্ধন খাদ্য। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, যেসব দ্রব্য জঠরে আহৃত হয় এবং অকসিজেন সহযোগে দগ্ধ হয়ে শরীরের পুষ্টিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে এবং তাপ উৎপাদন করে দৈহিক সামর্থ্য এনে দেয় তারই নাম খাদ্য।

খাদ্য বলতে আদিম মানুষেরা বুঝত জীবদেহের মাংস, ফলমূল প্রভৃতি এমন-কিছু পরিচিত সামগ্রী যা খেলে ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু আধুনিক উন্নত সমাজে খাদ্য বলতে বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য বোঝায় এবং মানুষে মানুষে তার পার্থক্য ঘটে। অর্থবিচারে খাদ্যকে সম্ভবত দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—'গ্যাস্ট্রোনমিক ফুড' আর 'সায়েন্টিফিক ফুড'। গ্যাস্ট্রোনমি অর্থ 'উত্তম খাদ্য বাছাই করা ও তৈয়ারি করা এবং ভোজন করার বিদ্যা'। এই বিদ্যাবিশারদরা সুন্দর করে রান্না করা, সুন্দর করে সাজানো সুস্বাদু সুগন্ধী লোভনীয় খাদ্যে ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষপাতী। যতক্ষণ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় ও পুষ্টির চাহিদা মেটে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ আর সৌন্দর্য বজায় রাখতে চান। এই জাতীয় খাদ্যই মানুষ পছন্দ করে বেশি এবং এই জাতীয় খাদ্যেই তৃপ্তি বেশি।

সায়েন্টিফিক ফুড বলতে বোঝায় সেই খাদ্য যা স্বাস্থ্যরক্ষা, দেহের বৃদ্ধি আর শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন। এককথায় বলা যায়, বেঁচে থাকার জন্য এবং সুস্থ স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করার জন্য যে বিবিধ সামগ্রী খেতে হয় তা-ই সায়েন্টিফিক ফুড : Sufficient wholesome food provides the basic energy that sets the complicated mechanism 'Man' in motion. Nourishment allows the muscles to operate and the brain to function. Food···the source from which spring ideas, activity, creative energy and joy.

কিন্তু আজ সর্বত্র শোনা যাচ্ছে, The problem of food supply is as old as humanity, and grows with it. Rising birth rates, greater life expectancy through improvements in medical care, and a rising standard of living have created a population explosion with no end in sight.

কথাটা কতখানি সত্যি ?

নব্য প্রস্তরযুগের পর থেকে পৃথিবীতে সামগ্রিকভাবে খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে। কৃষির উন্নতির ধাপে ধাপে মানুষের খাদ্যেরও উন্নতি হয়েছে—গুণে, মানে, ফসলের বৈচিত্র্যে এবং উৎপাদনে। তবে তারই সঙ্গে, অস্বীকার করার উপায় নেই, পৃথিবীর জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ' নামে একটা অর্থহীন বুলি পাগলের প্রলাপের মতো উচ্চারিত হচ্ছে বারে বারে। জোর করে, লোভ দেখিয়ে এবং ভুল পথে চালিত করে কড়া হাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি অনুশাসন প্রচলিত করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট—শাসকশ্রেণীর যোগ্যতার অভাব ঢাকা। কিন্তু মানুষকে অকারণ ভয় দেখানো অন্যায়। জনসংখ্যা বাড়লে খাদ্যাভাব দেখা দেবে, বাসের জন্য জায়গা পাওয়া যাবে না—এ জাতীয় সংশয়ও অর্থহীন। কারণ, বিজ্ঞান থেমে নেই। থেমে নেই মানুষের নিত্যনতুন আবিষ্কারের স্পৃহা। মানুষের কাছে মানুষই তো প্রমাণ করে দিয়েছে, ধরিত্রীর বুকে খাদ্যের অবাধ সম্ভাবনা। কোনোদিন তা ফুরোবে না। সমগ্র পৃথিবীতে যে স্থলভাগ আছে, মানুষ তার ১৭ শতাংশ মাত্র আজ ব্যবহার করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে বাকি ৮৩ ভাগে এখনও বহু মানুষের খাদ্য ও আশ্রয় যে মিলতে পারে, মানুষই তা অচিরে প্রমাণ করে দেবে—বহু নৃবিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ।

দশ: ক্যালরি বলতে খাদ্যের শক্তিমূল্য

খাদ্য বলতে সাধারণভাবে বলা যায়, এমন সমস্ত কঠিন ও তরল পদার্থ যা খেলে মানুষের দেহের বৃদ্ধি ঘটে এবং আমৃত্যু শরীর সচল রাখা যায়। দুটি কারণে উপযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন। প্রথম, অনুপযুক্ত খাদ্যে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং দেহ ব্যাধির আধার হয়। দ্বিতীয়, দেহের কর্মশক্তি নির্ভর করে উপযুক্ত খাদ্যের উপর। তবে মনে রাখা দরকার, সর্বার্থসাধক খাদ্য বলে কিছু নেই অর্থাৎ কোনো একটিমাত্র খাদ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তির বীজ নেই। শরীরের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন পদার্থ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ, মিশ্র খাদ্যই উপযুক্ত খাদ্য।

খাদ্য আকৃতিতে আর প্রকৃতিতে যা-ই হোক না কেন, তা প্রাণিজই হোক কি উদ্ভিজ্জ—তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ আর ভিটামিন থাকা দরকার। খাদ্য শরীরে পরিপাক হবার পর টিস্যু অর্থাৎ কলা গঠন করে ও তার ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে, তাপ ও শক্তি যোগায় এবং দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্যের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টিকর পদার্থ থাকে এবং সেই পুষ্টিকর পদার্থগুলি হল প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, জল, খনিজ লবণ, ভিটামিন প্রভৃতি। উপাদান অনুযায়ী এগুলিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একভাগ জৈব, আর-এক ভাগ অজৈব। কার্বন থাকলে জৈব আর কার্বন না থাকলে অজৈব। জৈব ভাগের আবার দুটি উপভাগ। একটি, নাইট্রোজেন-সমন্বিত—যেমন, প্রোটিন আর ভিটামিন (সব ভিটামিন অবশ্য নাইট্রোজেন-সমন্বিত নয়, যেমন ভিটামিন-সি)। আর-একটি, নাইট্রোজেন-বর্জিত—যেমন, কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট। অজৈব ভাগে জল ছাড়া আছে ক্যালসিয়ম ফসফরস সোডিয়ম পটাসিয়ম ম্যাগনেসিয়ম গন্ধক ক্লোরিন লোহা আয়োডিন তামা ইত্যাদির খনিজ লবণ।

প্রোটিন, জল আর খনিজ লবণ দেহকলা গঠন করে এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে। কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার আর শর্করা), ফ্যাট এবং প্রোটিন দেহে তাপ যোগায়, শক্তি সঞ্চার করে। দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ আর জল।

আমরা যে খাদ্য খাই তাতে কিছু-না-কিছু অপাচ্য পদার্থ থাকেই। দেহে তা পরিশোষিত হয় না, কোনোভাবেই তা দেহের পুষ্টি বিধান করতে পারে না। খাদ্যের এই অপাচ্য অংশ পরিশেষে মলের মধ্য দিয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। তাই বলে এই অংশের যে কোনো কাজ নেই তা কিন্তু নয়। এই অংশকে বলে 'রাফেজ' এবং তা পাকস্থলীর উদ্দীপক বা সঞ্চালক হিসাবে কাজ করে। আমাদের দেহ আসলে পৌষ্টিক নালী নামে একটা নলের সাহায্যে খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিসামগ্রী আহরণ করে। এই পৌষ্টিক নালী মুখগহ্বর থেকে পায়ু পর্যন্ত প্রসারিত। মুখগহ্বর থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত যে অংশ তাকে বলে অন্ননালী। পাকস্থলীর পরের অংশ অত্যন্ত সংবর্তিত অর্থাৎ পেঁচানো, এই অংশের নাম ক্ষুদ্রান্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্রের পরে বৃহদন্ত্র। বদ্ধনালী আর মলাশয় নিয়েই বৃহদন্ত্র। মলাশয়ের শেষে মলদ্বার আর পায়ু।

খাদ্য পরিপাক হয় পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন স্থানে এবং আমাদের দেহ আমাদের ভক্ষিত সামগ্রী থেকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর রাসায়নিক বেছে নিয়ে পৌষ্টিক নালীর প্রাচীরের মধ্য দিয়ে রক্তধারায় পরিশোষণ করে। এইভাবে রক্তে যেসব পুষ্টিদ্রব্য আসে তা দেহের বিভিন্ন অংশে চলে যায় এবং গিয়ে রাসায়নিক পরিবর্তন লাভ করে দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াসম্পাদনে সাহায্য করে।

আমাদের দেহে প্রধান প্রধান খাদ্য-রাসায়নিকের আসল কাজ তিনটি— শক্তি-উৎপাদন (এর মধ্যে তাপশক্তিও আছে), দেহকলা নির্মাণ ও জীর্ণসংস্কারের উপাদান যোগানো এবং এমনসব পদার্থ প্রস্তুত করা যা আমাদের দেহক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে ও নিয়মনে প্রয়োজন হয়।

দেহের ভিতর খাদ্যের প্রথম কাজ শক্তি উৎপাদন করা। প্রধানত দুই প্রকারের শক্তি—যন্ত্রশক্তি ও তাপশক্তি। খাদ্য পরিপাকের ফলে যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা রক্তস্রোতের মধ্যে গিয়ে অকসিজেনের সংস্পর্শে আসে (ফুসফুস বাতাস থেকে এই অকসিজেন টেনে আনে) এবং তখন অকসিডেশনের দরুন যে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তিতেই আমরা চলাফেরা করি, সেই শক্তিতেই আমাদের পেশীর সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ ও দেহের অন্যান্য কর্ম সম্পাদিত হয়—তা সে ইচ্ছাকৃতই হোক কি অনিচ্ছাকৃত। আসলে, আমাদের দেহে বহু রাসায়নিক পদার্থ আছে এবং সেইসব পদার্থের নিয়ত পরিবর্তন ঘটে। প্রতিটি পরিবর্তনই রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং সেই পরিবর্তনের জন্য শক্তির প্রয়োজন।

প্রতিটি পরিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় এনজাইমের দ্বারা। এই এনজাইম অবিরাম এক-একটা রাসায়নিককে ভেঙে অন্য সরল পদার্থে পরিণত করে এবং সরল পদার্থ থেকে জটিল পদার্থ তৈরি করে। গোটা ব্যাপারটা ঘটে আশ্চর্য নিখুঁত-ভাবে। আমাদের দেহটাকে তাই একটা বিশাল, জটিল এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে এঞ্জিন একদিকে বিভিন্ন কাজের জন্য শক্তি উৎপাদন করে এবং অন্যদিকে আপন বৃদ্ধি ঘটায়, আবার কোথাও কোনো ক্ষয়ক্ষতি হলে, ভেঙেচুরে গেলে তা মেরামত করে ও প্রয়োজনে বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে। অন্যসব এঞ্জিনের মতো এই এঞ্জিনেও তাপের আকারে কিছু শক্তি সবসময় নষ্ট হয়—আমাদের দেহ থেকে প্রত্যহ কিছু তাপ বেরিয়ে যায়। দেহের ভিতর রাসায়নিক বিক্রিয়ার দরুন যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতেই আমাদের দেহ তার তাপমাত্রা বজায় রাখে। এই তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে ৩৭·৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দেহের ভিতর অধিকাংশ এনজাইম-ক্রিয়ার জন্য এই তাপমাত্রাই দরকার। আমাদের খাদ্যের ভিতরকার প্রধান যে তিন শ্রেণীর রাসায়নিক তাপ উৎপাদন করে তাহল কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট আর প্রোটিন, এবং যে তাপ উৎপন্ন হয় তা পরিমাপ করা হয় ক্যালরির হিসাবে।

পুষ্টিবিজ্ঞানে ক্যালরি বলতে বোঝায় খাদ্যের শক্তিমূল্য। অর্থাৎ, কোন্ খাদ্যে কতখানি শক্তি পাওয়া যেতে পারে তা ক্যালরির মাপে বোঝানো হয়। ক্যালরি আসলে তাপের একক এবং তাপও এক প্রকারের শক্তি। এক গ্রাম জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াতে যতখানি তাপ প্রয়োজন তা-ই এক ক্যালরি। কিন্তু এই একক পরিমাণে খুবই ছোটো, মানুষের পুষ্টির পরিমাপে তার ব্যবহারে অসুবিধা আছে। এই একক ব্যবহার করতে হলে মানুষের একদিনের প্রয়োজনীয় ক্যালরির পরিমাপ দাঁড়াবে কয়েক শ হাজার ক্যালরি। এত বড়ো অঙ্ক বলতে কইতে অসুবিধা, তাই ব্যবহার করা হয় না। কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব যেমন ইঞ্চি কিংবা সেন্টিমিটারে প্রকাশ করা হয় না তেমনি পুষ্টিবিজ্ঞানে এই ছোটো ক্যালরি ব্যবহার করা হয় না। পুষ্টিবিজ্ঞানে এই ছোটো ক্যালরিকে ১,০০০ গুণ বড়ো করে নিয়ে একক ধরা হয়। তাকে বলা হয় কিলো ক্যালরি অথবা লার্জ ক্যালরি কিংবা ফিজিওলজিক্যাল ক্যালরি। এক লিটার জলকে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ১৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ তাপ দরকার সেই পরিমাণ তাপকে বলে লার্জ ক্যালরি। খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের কিন্তু লার্জ ক্যালরি কিংবা কিলো ক্যালরিই বলা উচিত,

কিন্তু ব্যাপারটা এমন চলে গেছে যে, এখন শুধু ক্যালরি বললেই লোকে বুঝে নেয় খাদ্যের ক্যালরি।

আগেই বলেছি, ক্যালরি হচ্ছে খাদ্যের শক্তিমূল্য। কোন্ খাদ্যে কতখানি শক্তি পাওয়া যায় তা এই ক্যালরির হিসাব থেকেই জানা যায়। ওজন দিয়ে খাদ্যের শক্তিমূল্য যাচাই হয় না। ১০০ গ্রাম ময়দা, ১০০ গ্রাম মাখন আর ১০০ গ্রাম আলু ওজনে সমান হলেও শক্তিমূল্যে সমান নয়। ১০০ গ্রাম ঢেঁকিছাঁটা চাল কি ১০০ গ্রাম ময়দায় পাওয়া যায় ৩৬০ ক্যালরি, ১০০ গ্রাম মাখনে পাওয়া যায় ৭২০ ক্যালরি আর ১০০ গ্রাম আলুতে ৯৯·৩ ক্যালরি।

মানুষ উদ্ভিদ থেকেই তার সমস্ত শক্তি আহরণ করে। পশুমাংস, পক্ষি-মাংস এবং মৎস্যমাংসেরও উৎপত্তি উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদ মাটি আর বাতাস থেকে সাধারণ সব পদার্থ সংগ্রহ করে সৌরশক্তির সাহায্যে প্রোটিন, ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করে—আর তা-ই শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন হিসাব করা হয় তাপের এককে অর্থাৎ ক্যালরিতে।

ক্যালরির প্রয়োজন সকলের সমান নয়। বয়স, নারী কি পুরুষ, দেহের আয়তন, আবহাওয়া, কর্মক্রিয়া ইত্যাদি অনেককিছুর উপর ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে। বয়সের কথা ধরলে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের চেয়ে একটি শিশুর খাদ্যের প্রয়োজন কম হওয়া উচিত, কিন্তু শিশুর বাড়ন্ত দেহ আর ছোটাছুটি অর্থাৎ পরিশ্রমের দরুন তার খাদ্যের প্রয়োজন অনেক বেশি। প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারীর ক্যালরির প্রয়োজন সারা জীবনই পূর্ণবয়স্ক একজন পুরুষের চেয়ে কম, কারণ নারী আকারে পুরুষের চেয়ে ছোটো এবং সাধারণত পুরুষের চেয়ে তারা কম দৈহিক পরিশ্রম করে। কিন্তু গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের পর যতদিন তারা সন্তানকে স্তন্যদান করে ততদিন তাদের ক্যালরি ও প্রোটিনের প্রয়োজন বেশি থাকে।

কিন্তু এমনিতে আজকের এই যন্ত্রসভ্যতার যুগে মানুষের ক্যালরির প্রয়োজন অনেক কমে গেছে। যন্ত্র আজ মানুষের অনেক কাজ করে দিয়ে তার দৈহিক শ্রম লাঘব করছে। বাস ট্রাম ট্রেন এরোপ্লেন লিফ্ট ইত্যাদির দৌলতে মানুষের হাঁটার দরকারও প্রায় ফুরিয়েছে। কম কাজ করতে মানুষের আজ কম শক্তি অর্থাৎ কম ক্যালরির প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে আহারের পরিমাণ ঠিক রেখে অনেকে আজ মোটা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা বোঝেন না, তাঁদের বাপঠাকুরদার চেয়ে তাঁদের আহারের পরিমাণ কম হওয়া উচিত।

আমাদের খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের একটা বড়ো কাজ, ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য শক্তির একটা ভাণ্ডার গড়ে তোলা। এই সংরক্ষিত শক্তি দরকারের সময় কালবিলম্ব না করে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, তাপ-উৎপাদন কি পেশী-সঙ্কোচনের দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে এই ভাণ্ডার থেকে শক্তি টেনে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, আমাদের শরীরের ভিতর এমন একটা সংরক্ষিত শক্তি-ভাণ্ডার থাকা চাই যাতে হঠাৎ কোনো কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করতে হলে কি শারীরিক বল প্রয়োগ করতে হলে নতুন করে খাদ্য না খেয়ে তৎক্ষণাৎ তার জন্য শক্তি পাওয়া যায়। শরীরের এই শক্তিভাণ্ডার প্রধানত দু জাতীয় প্রাণ-রাসায়নিক নিয়ে গঠিত। প্রথমটি পলিস্যাকারাইড জাতীয় রাসায়নিক যা গ্লাইকোজেন নামে পরিচিত। শরীরে গ্লাইকোজেনের প্রধান আধার লিভার অর্থাৎ যকৃৎ, তবে পেশীতেও যথেষ্ট পরিমাণে গ্লাইকোজেন থাকে। গ্লাইকোজেন আসলে কার্বোহাইড্রেট এবং তা থেকে সহজেই গ্লুকোজ পাওয়া যায়। সুতরাং যদি হঠাৎ কখনও শক্তির দরকার হয় তাহলে নতুন করে খাদ্য না খেলেও শক্তি পাওয়া যায়—যকৃৎ কিংবা পেশীর এনজাইম গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ বার করে রক্তস্রোতে ছেড়ে দেয় এবং শরীরের যেখানে শক্তি দরকার, রক্তস্রোত সেখানে গ্লুকোজ পৌঁছে দেয়। সেখানে অন্য এনজাইমের ক্রিয়ার দরুন গ্লুকোজ তার শক্তি মুক্ত করে। শরীরের ভিতর সংরক্ষিত শক্তির আর-একটা ভাণ্ডার হল মজুত চর্বি। প্রয়োজনাতিরিক্ত ফ্যাট কিংবা কার্বোহাইড্রেট খেলে শরীরে যে চর্বি জমে তা-ই এক সময় সংরক্ষিত শক্তিভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। এইভাবে শরীরে শক্তিসঞ্চয়নক্রিয়া দেহের একটা সুস্থ স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে অত্যধিক খাদ্য খাওয়ার দরুন মাত্রাতিরিক্ত চর্বি জমলে তা মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, বরং রোগের উপসর্গ—এবং সে রোগ কখনও কখনও মারাত্মকও হতে পারে। এখন, খাদ্যের পরিমাণ যদি কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেহ এই মজুত চর্বি কাজে লাগাবে অর্থাৎ এনজাইমের ক্রিয়ায় চর্বি শক্তিতে পরিবর্তিত হবে এবং সেই শক্তি দেহের আভ্যন্তর ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রাখবে, সেইসঙ্গে বাইরের পরিশ্রমের জন্য শক্তি যোগাবে। এই কারণেই মেদ কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায় খাদ্যনিয়ন্ত্রণ আর দৈহিক পরিশ্রম।

আমাদের খাদ্যের তৃতীয় কাজ হল, দেহের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেসব রাসায়নিক দরকার, দেহ নিজেই যাতে সেইসব রাসায়নিক তৈরি করে নিতে পারে তার জন্য উপাদান যোগানো। দেহকে যেসব রাসায়নিক তৈরি

করতে হয় তার অধিকাংশই হল প্রোটিন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে, দেহকে অবিরাম নতুন রক্ত তৈরি করতে হয় এবং যেসব কোষের সাহায্যে পাকস্থলীর 'লাইনিং' অর্থাৎ ভিতরের দিককার আস্তরণ রচিত হয়, প্রতিদিন সেইসব কোষ বদলাতে হয়—এবং তার জন্য প্রোটিন দরকার। স্পষ্ট বোঝা যায়, দেহকে যখন নিয়ত নতুন প্রোটিন তৈরি করতে হয় তখন খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন থাকলেই তা করা তার পক্ষে সহজ হয়। প্রোটিন-অণু আকারে বেশ বড়ো এবং জটিল। তাতে নানারকম অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে এবং প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডই শরীরের পক্ষে প্রয়োজন। শরীর খাদ্যের প্রোটিন ভেঙে অথবা পরিপাক করে এই অ্যামিনো অ্যাসিড সংগ্রহ করে। প্রোটিনের এই পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হয় পাকস্থলীতে আর ক্ষুদ্রান্ত্রে। পাকস্থলীতে আর ক্ষুদ্রান্ত্রে পেপসিন এবং ট্রিপসিন নামক এনজাইম প্রোটিনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে। অ্যামিনো অ্যাসিড অনেকরকম, সব প্রোটিনে একই রকম অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না। প্রোটিনের ভিতরকার অ্যামিনো অ্যাসিডের বিভিন্নতার জন্য প্রোটিনেরও বিভিন্নতা ঘটে—এবং পাকস্থলী আর ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের প্রোটিন থেকে যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয় সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরের নিজস্ব প্রোটিন তৈরির কাজে লাগে না। সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডই ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পরিশোষিত হয়, তবে যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরের প্রয়োজনে লাগে না সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তিত হয়ে প্রস্রাবের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায়। যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরের পক্ষে খুবই দরকার অথচ শরীর তৈরি করতে পারে না সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডকে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড বলা হয়। অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডও অন্ত্রের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে রক্তস্রোতে পরিশোষিত হয়, তারপর রক্তধারার সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন অংশে চলে যায় এবং সেখানে শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়।

কোনো কোনো খাদ্যে কোনো কোনো অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব থাকে। কোনো খাদ্যে কতকগুলি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড যদি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে তাহলে সেই খাদ্যের জৈবিক মূল্য কম। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রায় অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড পাবার জন্য সেই খাদ্য বেশি করে খেতে হয়।

আমরা অল্পই খাই আর বেশিই খাই, যা-কিছু খাই, খেতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন রকম পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। পরিপাকযন্ত্রে, রক্তস্রোতে এবং তার পরেও যেসব পরিবর্তন ঘটে তার ফলে ভক্ষিত খাদ্য শেষপর্যন্ত আমাদের দেহের উপাদানে পরিণত হয়। ডি লা মেয়ার বেশ কৌতুক করে বলেছেন—

"It's a very odd thing—
As odd as can be—
That whatever Miss T. eats
Turns into Miss T."

এগার : ৩০ টন খাদ্য

হিসাব করে দেখা গেছে, একজন মানুষ সারা জীবনে মোটামুটিভাবে গড়ে ৩০ টন খাদ্য খায়। কিন্তু তার এককণাও সে নিজে তৈরি করে নিতে পারে না। খাদ্যের ব্যাপারে সে নগণ্য শেওলার চেয়েও অধম। অতি ক্ষুদ্র শেওলাটি পর্যন্ত তার খাদ্য তৈরি করে নেয়, কিন্তু মানুষ—এই পৃথিবীর যে অধিপতি, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যার অবাধ গতিবিধি, সংখ্যায় একমাত্র মাছ ছাড়া আর সকল প্রাণীকে যে অতিক্রম করে গেছে—খাদ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবেই সে পরনির্ভর। তার প্রয়োজনীয় খাদ্য তাকে সংগ্রহ করতে হয় কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর কাছ থেকে।

সবুজ উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু কোনো প্রাণীই তা পারে না। সকল প্রাণীই পরভোজী অর্থাৎ খাদ্যের জন্য তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়। খাদ্যের জন্য প্রাণিমাত্রই উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদভোজী অন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল।

সবুজ উদ্ভিদকে বাদ দিয়ে কোনো প্রাণীর অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। একমাত্র সবুজ উদ্ভিদের পক্ষেই অজৈব উপাদান থেকে জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যক কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট জাতীয় জৈব যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব। আর, এ কাজে তার প্রধান সহায়ক অফুরন্ত সৌরশক্তি। বিজ্ঞানীরা শত চেষ্টা করেও আজও পর্যন্ত গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের এই খাদ্যপ্রস্তুতকর্মের বিক্রিয়া সম্পাদন করতে পারেন নি। অথচ, কী আশ্চর্য, অতি প্রকাণ্ড মহীরুহ থেকে শুরু করে অতি সামান্য শেওলা পর্যন্ত প্রতিটি হরিৎ উদ্ভিদ অবলীলাক্রমে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করে চলেছে!

বিজ্ঞানীদের অনুমান, সবুজ উদ্ভিদের সহায়তায় পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ১৫০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন কার্বন ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ টন হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তার ফলে ৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন অকসিজেন মুক্ত হয়। এই বিক্রিয়ার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই সম্পাদিত হয় সমুদ্রে, জলের তলায়, নানাপ্রকার সবুজ শেওলার সহায়তায়। আর, বাকি ১০ ভাগ হয়

ভূপৃষ্ঠে, সবুজ গাছপালার সক্রিয়তায়। এইভাবে যেসব জৈব পদার্থ সংশ্লেষিত হয় তার অতি সামান্য অংশই পরে নানাপ্রকার প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিদের পাতাই উদ্ভিদের রন্ধনশালা। উদ্ভিদের পাতায় অজস্র রন্ধ্র আছে। পাতার উপর সূর্যকিরণ এসে পড়লে সেই রন্ধ্রের মুখ খুলে যায় এবং বাতাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস পাতার ভিতর প্রবেশ করে। সেই গ্যাস মাটি থেকে সংগৃহীত রসের সঙ্গে মিশে যায়। সূর্যকিরণ ও ক্লোরোফিল অর্থাৎ সবুজ-কণার সাহায্যে তা থেকে কার্বনঘটিত খাদ্য তৈরি হয় আর অকসিজেন গ্যাস পাতার ছিদ্রপথে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়। এইভাবে প্রথমে শর্করা (যেমন গ্লুকোজ) এবং পরে শ্বেতসার বা স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয়। রসায়নবিদরা শ্বেতসার এবং শর্করা উভয়কেই কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীভুক্ত করেছেন। কার্বনের সঙ্গে হায়ডর অর্থাৎ জলের সন্নিবেশে গঠিত যে পদার্থ তা-ই কার্বোহাইড্রেট। শ্বেতসারের উদাহরণ চাল ময়দা ইত্যাদি, শর্করা জাতীয় পদার্থের উদাহরণ চিনি গুড় প্রভৃতি।

উদ্ভিদ এইভাবে যে প্রক্রিয়ায় তার খাদ্য তৈরি করে তাকে বলে সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ খাদ্য তৈরি হয় তার সবটাই সঙ্গে সঙ্গে খরচ হয় না, উদ্বৃত্ত অংশ উদ্ভিদ তার দেহের বিভিন্ন স্থানে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখে, সেই সঞ্চিত খাদ্যই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে।

আমাদের খাদ্যকে আমরা সাধারণভাবে দু অংশে ভাগ করতে পারি—সার অংশ বা **nutrient** এবং অসার অংশ বা **roughage.** খাদ্যের সার অংশ দেহের খাদ্যনালীতে বিভিন্ন পাচক-রসের সাহায্যে জীর্ণ হয় এবং তার ফলে দেহের পুষ্টি হয়। খাদ্যের অসার অংশ জীর্ণ হয় না, কিন্তু এই অসার অংশের দরুন খাদ্য জীর্ণ করতে ও খাদ্যের অজীর্ণ অবশেষ মল হিসাবে পরিত্যাগ করতে সুবিধা হয়।

বিভিন্ন খাদ্যকে মোট ছ ভাগে ভাগ করা যায়— কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট জল লবণ ও ভিটামিন। চাল গম ভুট্টা চিনি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য। প্রোটিন খাদ্য বলতে মাছ মাংস ডিম ডাল প্রভৃতি। দুধ দই ঘি মাখন তেল প্রভৃতি ফ্যাট জাতীয় খাদ্যের উদাহরণ। জল সমস্ত খাদ্যেই কিছু-না-কিছু থাকে। লবণ বলতে খনিজ লবণ এবং সেইসব খনিজ হল লোহা ক্যালসিয়ম ফসফরস আয়োডিন সোডিয়ম পটাসিয়ম গন্ধক তামা দস্তা প্রভৃতি। খাদ্যের আত্তীকরণে

ভিটামিন একান্তই প্রয়োজন। এযাবৎ ১৬ রকম ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য সাধারণত এ বি সি ডি ই প্রভৃতি ভিটামিনই বেশি দরকার।

সাধারণ এককোষী প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত সকল জাতের প্রাণীই খাদ্য থেকে তার দেহের পুষ্টিসাধন করে। বিভিন্ন প্রাণীর পুষ্টিপদ্ধতিকে মোটামুটি দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—স্যাপ্রোজোইক আর হোলোজোইক। কোনো কোনো প্রাণী অতি সরল ও তরল খাদ্য গ্রহণ করে দেহের পুষ্টিসাধন করে, তাকে বলে স্যাপ্রোজোইক পুষ্টি। আর, যে পুষ্টি সংসাধিত হয় জটিল ও কঠিন জৈব খাদ্যগ্রহণ, পাচন, শোষণ এবং অপাচ্য অংশের বহিষ্করণের মাধ্যমে তাকে বলে হোলোজোইক পুষ্টি। মানুষের পুষ্টি এই হোলোজোইক পুষ্টি এবং তা বিপাকক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। বিপাক নির্ভর করে প্রধানত কয়েকটি প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর আর তাতে সহায়তা করে আমাদের দেহনিঃসৃত নানাপ্রকার এনজাইম। এইসব এনজাইম বিপাক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তারা নিজেরা থাকে অপরিবর্তিত। একটি নির্দিষ্ট এনজাইম একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ বা বিক্রিয়কের উপরই ক্রিয়া করতে ও তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে, অন্য রাসায়নিক পদার্থের উপর না। এ অনেকটা তালাচাবির মতো—এক তালার চাবি যেমন অন্য তালায় লাগে না এ-ও প্রায় সেইরকম।

কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বৃহদণু-খাদ্যবস্তুকে ভেঙে পৌষ্টিক নালী থেকে বিশোষণের উপযোগী ক্ষুদ্রাণু ও জলদ্রাব্য পদার্থে পরিণত করাই পরিপাকের উদ্দেশ্য। সেজন্য খাদ্যবস্তুকে প্রথমে মুখের মধ্যে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে পিষে কোমল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত করা হয়। বলা বাহুল্য, খাদ্যবস্তু যত সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হবে তার উপর বিভিন্ন জারক-রসের ক্রিয়া তত সহজে সম্পন্ন হবে। মুখবিবরে লালার সঙ্গে মিশে খাদ্য পিচ্ছিল হয় এবং সেখানেই পরিপাকক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

খাদ্য গেলার পর গ্রাসনালী, পাকস্থলী ও অন্ত্র বেয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলে। মুখবিবর থেকে গ্রাসনালী এসে পড়েছে পাকস্থলীতে। পাকস্থলীর এই প্রান্তটিকে বলা হয় হৃৎমুখী প্রান্ত। পাকস্থলীর অপর প্রান্ত থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রের সূচনা। এই প্রান্তটির নাম পাইলোরিক প্রান্ত। এই প্রান্তে একটি ভ্যাল্‌ভ আছে, তার নাম পাইলোরিক ভ্যাল্‌ভ। পাকস্থলীর দুই প্রান্তেই আছে অনৈচ্ছিক পেশীর

শক্তিশালী বলয়রূপী ভ্যাল্‌ভ। এই ভ্যাল্‌ভ খাদ্য যাবার সময় ছাড়া অন্য সময় বিবরপথটিকে বন্ধ রাখে। ক্ষুদ্রান্ত্র অতি দীর্ঘ সরু কুণ্ডলী-পাকানো নলের মতো। তার প্রথম অংশকে বলে গ্রহণী। পরবর্তী অংশ মধ্য-ক্ষুদ্রান্ত্র আর শেষের অংশ নিম্ন-ক্ষুদ্রান্ত্র নামে অভিহিত। গ্রহণীতে অগ্ন্যাশয়গ্রন্থির প্রণালী এসে পড়েছে। যকৃৎ ও পিত্তাশয় থেকে আগত সাধারণ পিত্তনালীও এসে পড়েছে গ্রহণীতে। এইসব গ্রন্থির রস ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যের সঙ্গে মেশে। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে খাদ্য চলে যায় বৃহদন্ত্রে। বৃহদন্ত্রে বহুক্ষণ সঞ্চিত থেকে খাদ্যাবশেষ ক্রমশ মলের আকার ধারণ করে ও মলনালীতে যায়। শেষে সেই মল মলনালী থেকে পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মুখবিবর থেকে ক্ষুদ্রান্ত্র পর্যন্ত খাদ্যের এই যাত্রাপথের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জারক-রস নিঃসৃত হয়। যেমন, মুখবিবরে নিঃসৃত হয় লালা, তাতে টায়ালিন নামে একরকম এনজাইম থাকে। পাকস্থলীতে নিঃসৃত পাচক-রসে থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপসিন ও রেনিন নামক এনজাইম। ক্ষুদ্রান্ত্রে নিঃসৃত হয় পিত্তরস, অগ্ন্যাশয়রস ও অন্ত্ররস। অগ্ন্যাশয়রসে থাকে অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন ও লাইপেজ নামক এনজাইম, আন্ত্রিক রসে থাকে ইরেপসিন, সাকরেজ, ল্যাকটেজ ও মলটেজ এনজাইম। বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়ায় খাদ্য ক্রমশ জীর্ণ হতে থাকে। সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত এবং লালার সঙ্গে মিশ্রিত খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া শুরু হয় একেবারে প্রথমেই, মুখবিবরে। পাকস্থলীতে এই পরিপাকক্রিয়া আরও অগ্রসর হয় এবং তা সম্পূর্ণ হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে।

যকৃৎ থেকে নিঃসৃত পিত্ত অম্লধর্মী পাকমণ্ডের অম্লভাব নষ্ট করে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষার-মাধ্যম সৃষ্টি করে। তাছাড়া পিত্ত খাদ্যের ফ্যাটের সঙ্গে মিশে একটি ইমালশন বা অবদ্রব তৈরি করে। সেই অবদ্রবের উপর লাইপেজের ক্রিয়া সহজেই সঙ্ঘটিত হয় এবং অবদ্রবটি সহজেই গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়। দেহের বিভিন্ন স্থানে যেসব বিক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেগুলি আসলে হাইড্রোলিসিস অর্থাৎ জলবিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছুই না।

পরিপাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে স্টার্চ পরিণত হয় সরলতম শর্করা গ্লুকোজে, প্রোটিন পরিণত হয় নানারকম অ্যামিনো অ্যাসিডে এবং ফ্যাট পরিণত হয় গ্লিসারল ও নানাপ্রকার ফ্যাটি অ্যাসিডে।

জীর্ণ খাদ্যের সার অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের সাহায্যে অবশোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের

ভিতরকার আবরণে সূক্ষ্ম শুঁয়োর মতো অসংখ্য শোষকযন্ত্র আছে, আবার শোষকযন্ত্রের মধ্যে আছে নাড়ীজালক। সরল শর্করা এবং অ্যামিনো অ্যাসিড সরাসরি শোষকযন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত এই নাড়ীজালকের ভিতর প্রবেশ করে। ফ্যাট জীর্ণ হলে ফ্যাটি অ্যাসিড যকৃৎনিঃসৃত পিত্তের সাহায্যে অবদ্রবে পরিণত হয় এবং নাড়ীজালকের মধ্যে গৃহীত হয়। ফ্যাটের কিছু অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহ-কণারূপে ল্যাকটিয়েলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে লসিকানালীর ভিতর দিয়ে শেষে চলে যায় শিরার মধ্যে। খাদ্যের দ্রবীভূত অংশ শোষিত হয়ে রক্তের ভিতর গৃহীত হয় এবং রক্তস্রোতের সঙ্গে দেহের কোষে কোষে পৌঁছয়। সেখানে খাদ্যরস প্রোটোপ্লাজমের অঙ্গীভূত হয়। একেই বলে আত্তীকরণ। পরে অকসিজেনের সংস্পর্শে এবং নানারকম এনজাইমের সাহায্যে তার মৃদু দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু থেকে ক্রমে জটিলতর ও বৃহত্তর অণু সংশ্লেষিত হয় এবং তা থেকে গড়ে ওঠে জটিল দেহতন্তু। দেহের উদ্বৃত্ত শর্করা যকৃতে এবং পেশীতে গ্লাইকোজেন হিসাবে সঞ্চিত হয়। অন্যদিকে, অ্যামিনো অ্যাসিডের উদ্বৃত্ত অংশ যকৃতে গিয়ে ডি-অ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ইউরিয়া ও গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া রক্তপ্রবাহের সঙ্গে কিডনি অর্থাৎ বৃক্কে গিয়ে পৌঁছলে সেখান থেকে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আর, উদ্বৃত্ত স্নেহপদার্থ চর্বি হিসাবে চামড়ার নিচে ও উদরগহ্বরে জমা হয়।

পরিপাক ও পরিশোষণের পর খাদ্যের অপাচ্য অংশ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। মানুষ প্রভৃতি উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই অজীর্ণ অংশ সাধারণত সাময়িকভাবে মলাশয়ে সঞ্চিত হয়, তারপর মলাশয়ের পেশীপ্রাচীরের ক্রমাগত সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ ক্রিয়ায় পায়ুছিদ্র দিয়ে দেহ থেকে বহির্গত হয়।

বার: রোগা মানুষের দেহে বেশি জল

আমরা ভূগোলে পড়েছি, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। আমাদের শরীরেরও প্রায় দুভাগ জল আর একভাগ কঠিন পদার্থ। মোটামুটি হিসাব দিয়ে বলতে গেলে, মোট দৈহিক ওজনের শতকরা ৫৫ থেকে ৭০ ভাগ জল। মোটা মানুষের চেয়ে রোগা মানুষের দেহে অপেক্ষাকৃত বেশি জল থাকে। আবার, নারীর চেয়ে পুরুষের দেহে বেশি জল থাকে। শিশুর দেহে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগই জল। বয়স যত বাড়ে, জলের ভাগ তত কমে। সব থেকে কমে প্রথম ১০ বছরে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দেহে যদি ৪০ লিটার জল থাকে ধরা যায় তাহলে তার প্রায় ২৩ লিটার থাকে কোষের ভিতর আর বাকি ১৭ লিটার থাকে রক্তরস, লসিকা, দেহকলারস ও বিভিন্ন কোষবহির্ভূত রসে।

জল দেহের অপরিহার্য অংশ। প্রাণধারণের জন্য অকসিজেনের পরেই জলের প্রয়োজন। তাই জলের অপর নাম জীবন।

জল শরীরে শক্তি যোগাতে পারে না বটে, কিন্তু দেহের ভিতর জলের কাজ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, জল ছাড়া আমাদের চলে না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, শরীর তার সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাটের প্রায় সবটাই দিয়ে দিতে পারে, প্রোটিনেরও প্রায় অর্ধেকটা দিতে পারে—তবু প্রাণ বড়ো রকমে বিপন্ন হবে না; কিন্তু জলের এক-দশমাংশও যদি দেয়, শরীরের উপর তার সাঙ্ঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং এক-পঞ্চমাংশ দিলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে।

আমাদের দেহকোষের যা-কিছু রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ তা চলে জলের মাধ্যমে। জলের মাধ্যমেই দেহের সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। প্রকৃতির রাজ্যে যত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার প্রায় সবেতেই জলের প্রয়োজন হয়। কি প্রাণিজগৎ কি উদ্ভিদজগৎ কোথাও জল ছাড়া কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারে না। প্রাণিদেহের সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জল অপরিহার্য। জলই দেহের তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন রোধ করে। জল অপরিবাহী পদার্থ—জল যেমন তাড়াতাড়ি গরম হয় না তেমনি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডাও হয় না; জল গরম হতে যেমন সময় লাগে তেমনি গরম হবার পর ঠাণ্ডা হতেও সময় নেয়।

দেহে জল থাকার জন্যই খুব তাড়াতাড়ি দেহের তাপমাত্রার হেরফের হতে পারে না। ফলে টিস্যু হঠাৎ নষ্ট হতে পারে না। জলের জন্যই টিস্যুর দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা। শরীরের ভিতর জল একটা পরিবাহকের কাজ করে। জল রক্তধারায় সমস্ত পুষ্টিদ্রব্য পরিবহণ করে এবং অবাঞ্ছিত নিষ্ক্রিয় পদার্থ শরীর থেকে বার করে দিতে সাহায্য করে। আমাদের রক্তের প্রায় চার-পঞ্চমাংশই জল। রক্তে আর লসিকায় যে শর্করা, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ আর ভিটামিন থাকে, টিস্যুতে টিস্যুতে সেগুলি বহন করে নিয়ে যেতে জলের দরকার। জলে এইসব পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে রক্তে মিশে থাকে। জল এখানে দ্রাবক।

আবার, যেসব দেহযন্ত্রে বর্জ্য পদার্থ ছেঁকে বার করে দেওয়া হয় সেইসব দেহযন্ত্রে তা পৌঁছে দিতেও জলের প্রয়োজন। শরীরের কোনো কোনো অংশের তারল্য বজায় রাখতেও জলের দরকার। পাকস্থলীতে পাচক-রস উৎপাদনেও জলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরিপাকের পর খাদ্য পদার্থ জলে-দ্রব অবস্থায় পরিণত না হলে শরীরের কাজে লাগতে পারে না। পরিপাকযন্ত্রের অব্যবহার্য ভাগ যেমন জলের সঙ্গে বার হয়ে যায় তেমনি রক্তের ভিতরকার খাদ্যের সারাংশগুলি শরীরের কাজে লাগার পর তার অব্যবহার্য অংশ জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে কিডনি অর্থাৎ মূত্রযন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে বার হয়ে যায়। আমাদের চামড়ার ভিতর দিয়েও সর্বদা বাষ্পাকারে জল বেরিয়ে যায়। কখনও কখনও তা ঘামের আকারে দেখা যায়। জলের আর এক নিষ্ক্রমণ ফুসফুস থেকে, নিশ্বাসের সঙ্গে। মলের সঙ্গেও যথেষ্ট পরিমাণে জল বেরিয়ে যায়। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় যে মানুষ বসা-কাজ করে অর্থাৎ কম পরিশ্রমের কাজ করে তার দেহ থেকে দৈনিক প্রায় আড়াই লিটার জল বেরিয়ে যায়—দেড় লিটার প্রস্রাবে আর এক লিটার ঘামে ও নিশ্বাসে। পরিশ্রম বেশি হলে, জ্বর ইত্যাদি অসুস্থতার কারণে শরীরে তাপ বাড়লে এবং দারুণ গ্রীষ্মে ঘামে আর নিশ্বাসে বেশ কয়েক লিটার জল বেরিয়ে যায়।

প্রতিদিন মলমূত্র, ঘাম, নিশ্বাস এবং নানারকম দেহনিঃসৃত পদার্থের মাধ্যমে বেশ কিছু জল শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এই অভাব পূরণের জন্য সাধারণ অবস্থায় প্রত্যহ অন্তত আড়াই লিটার জল দরকার। তার মধ্যে দেহে নানা বিপাকক্রিয়ার ফলে অন্তত ৩০০ মিলিলিটার জল উৎপন্ন হয়। কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন এবং অ্যালকোহলের অকসিডেশনের সময় জল

সৃষ্টি হয় ; আবার গ্লুকোজ প্রভৃতি ক্ষুদ্রাকৃতি কার্বোহাইড্রেট থেকে গ্লাইকোজেন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের সময়ও কিছু জল বেরিয়ে আসে। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের তুলনায় ফ্যাটে হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি বলে ফ্যাটের অকসিডেশনেই বেশি জল উৎপন্ন হয়।

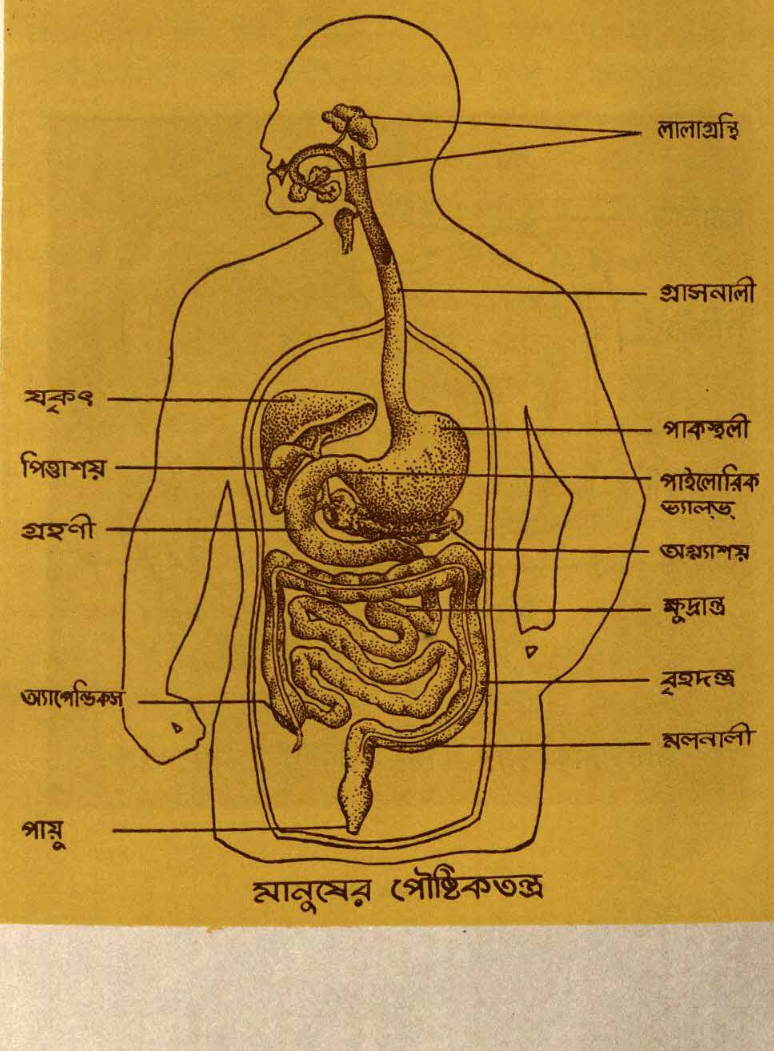
এইভাবে শরীরের ভিতর যে জল উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ প্রায় ৩০০ মিলিলিটার। বাকি ২২০০ মিলিলিটার যেভাবেই হোক, বাইরে থেকে খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। কোনো কারণে শরীর থেকে যদি বেশি পরিমাণে জল বেরিয়ে যায় তাহলে সেই বাড়তি অভাব পূরণের জন্য বেশি জল খেতে হয়। এই কারণে উষ্ণ আবহাওয়ায় ও কঠোর পরিশ্রমের দরুন বেশি ঘাম হলে বেশি জল খাওয়ার দরকার হয়।

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বসে-কাজ-করা মানুষ পানীয় জল হিসাবে কিংবা চা কফি দুধ ঘোল শরবৎ অ্যালকোহল প্রভৃতির আকারে সাধারণত এক লিটার জলই খেয়ে থাকেন। এছাড়া খাদ্য থেকেও বেশ কিছু পরিমাণ জল পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত খাদ্যেরই একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জল। আমাদের সমস্ত খাদ্যেই জল আছে। এমন কি, যেসব খাদ্য শুষ্ক এবং আপাতদৃষ্টিতে নির্জল মনে হয় সেইসব খাদ্যেও কিছু-না-কিছু জল থাকেই। খাদ্য আসলে কতকগুলি রাসায়নিকের সংমিশ্রণ এবং খাদ্যের অন্তর্গত এক-এক শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থের এক-এক রাসায়নিক নাম, যেমন—কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য আর জল। সমস্ত কঠিন খাদ্যেরই একটা বড়ো অংশ এইসব পদার্থ দিয়ে গঠিত হলেও তার ভিতর অনেকটাই জল থাকে।

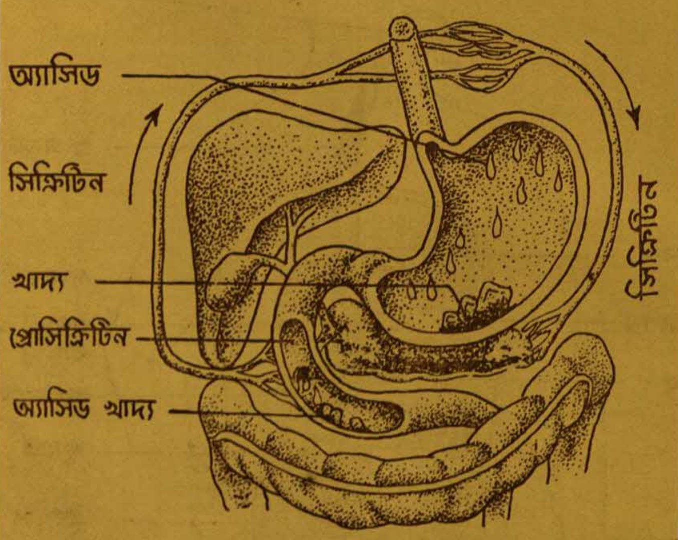
জলের একটা ব্যালান্স-শীট যদি তৈরি করতে হয় তাহলে এইভাবে করা যায়—

জলের আগম

পানীয়	১৫০০ মিলিলিটার
কঠিন খাদ্য	৮০০ মিলিলিটার
অকসিডেশন	৩০০ মিলিলিটার
	২৬০০ মিলিলিটার



মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র



পরিপাকক্রিয়ার সময় পাকস্থলী এবং অন্ত্র

জলের নির্গম

প্রস্রাব	১৫০০ মিলিলিটার
দৃশ্য ও অদৃশ্য ঘাম	৬০০ মিলিলিটার
ফুসফুস	৪০০ মিলিলিটার
মল	১০০ মিলিলিটার
	২৬০০ মিলিলিটার

শরীরে জলের যদি বেশি অভাব হয় তাহলে কোষের ভিতরের জলও কমবে, বাইরের জলও কমবে। ফলে, কোষ কুঁচকে যাবে এবং কোষের বিপাক-ক্রিয়া ব্যাহত হবে। পরে কোষ ও কলা ভাঙতে শুরু করবে এবং শরীরে ইলেকট্রোলাইট, ইউরিয়া ও নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যাবে। অ্যাসিডের অংশও বাড়বে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে শেষে মৃত্যু ঘটবে।

জল এমনিতে মনে হয় নির্দোষ, কিন্তু কোনো জিনিসই খুব বেশি খেলে নির্দোষ থাকে না। খুব বেশি জল খাওয়াও খারাপ। খুব বেশি জল খেলে 'ওয়াটার ইনটকসিকেশন' হতে পারে, বিশেষ করে যখন শরীর থেকে পরিমাণ মতো জল বেরিয়ে যেতে না পারে। কিছু কিছু অসুখ আছে, যেমন অলিগিউরিক রিন্যাল ফেলিওর, অ্যাড্রিন্যাল ফেলিওর ইত্যাদি—এইসব অসুখে শরীর থেকে প্রস্রাবের আকারে ঠিকমতো জল বেরিয়ে যেতে পারে না, তখন ওয়াটার ইনটকসিকেশন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'পেট পরিষ্কার' রাখার জন্য যাঁরা খুব বেশি মাত্রায় 'বাওয়েল ওয়াশ' করেন তাঁরা সাবধান—অন্ত্র থেকে অত্যধিক পরিমাণে জল পরিশোষিত হয়ে ওয়াটার ইনটকসিকেশন ঘটাতে পারে। ওয়াটার ইনটকসিকেশনের লক্ষণ—দুর্বলতা, জড়িমা, মানসিক বিশৃঙ্খলা, বমি, আচ্ছন্নতা ও মাংসপেশীর প্রবল আক্ষেপ। মৃগীরোগীর শরীরে যদি মাঝারি রকমেরও জল জমে যায় তাহলে ফিট হতে পারে।

এইসব উপসর্গ দূর করার প্রধান উপায় জল বন্ধ করে দেওয়া এবং শুকনো খাবার খাওয়া।

অনেকের ধারণা, খাওয়ার সময় জল খেলে পাচক-রস পাতলা হয়ে যায় এবং তাতে হজমের ব্যাঘাত ঘটে। তাঁরা খাওয়ার অন্তত আধঘণ্টা কি একঘণ্টা পরে জল খাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু এর পিছনে কোনো যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। খাওয়ার সময় অল্প পরিমাণে জল খেলে কোনোই ক্ষতি হয় না।

স্বচ্ছন্দে এক গেলাস জল খাওয়া যেতে পারে। স্থপ দুধ চা কফি ইত্যাদি এবং শসা টোম্যাটো ও রসাল ফলে প্রচুর জল থাকে—খাওয়ার সময় এসব খেতে কিন্তু কেউ নিষেধ করেন না। বার্চ, স্পেন্সার এবং ক্যামেরনের মতো বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট বলেছেন, "It is immaterial whether the water is taken before, during or after meals."

তবে খাওয়ার সময় মুখে গ্রাস তুলেই অমনি জল খেলে লালাক্ষরণ ব্যাহত হতে পারে। মুখে খাদ্য পড়লে, বিশেষ করে সুস্বাদু ও সুপাচ্য খাদ্য পড়লে লালা ক্ষরিত হতে শুরু করে। লালায় বিভিন্ন ধরনের এনজাইম থাকে, তাতে খাদ্য-পরিপাকে সহায়তা হয়। এইসব এনজাইম জলে দ্রবীভূত হয় এবং খাদ্যের সঙ্গে মিশে সোজা পাকস্থলীতে চলে যায়। খাদ্যপরিপাকে লালার প্রয়োজন অসামান্য। সুতরাং লালার ক্ষরণ যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে খাদ্য আর জল একসঙ্গে না খাওয়াই ভালো।

খাদ্যবিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, লালারসের শ্বেতসার-দ্রাবক এনজাইমের ক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হতে হলে তার সঙ্গে দু'গুণ জল চাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস প্রণীত 'খাদ্য-বিজ্ঞান' গ্রন্থেও দেখতে পাই, "জলে পাকস্থলীর পাচক রসের স্রাব ভালো হয় এবং তজ্জন্য খাদ্য পরিপাকেরও সুবিধা হয়। তদ্ভিন্ন জলের বর্তমানে পাকস্থলীর ভুক্ত পদার্থ অন্ত্রের মধ্যে সহজে যাইতে পারে। এ দিকে পাকস্থলীর অম্লরস বেশী নিঃসৃত হইলে উহা ক্লোমযন্ত্রের পাচকরস বেশী নিঃসরণেও বিশেষ সাহায্য করে। অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আহার কালে জল খাইলে পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য হয়। প্রোটিন, চর্বি, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি অধিক জল পানে উত্তমরূপে পরিপাক হয় ও উহাদের সারাংশগুলি সুষ্ঠুভাবে শরীরের কাজে লাগিতে পারে।"

তবে এই 'অধিক' বলতে অত্যধিক নয়, 'a reasonable volume'. আগে যেমন বলেছি—এক গেলাস মতো।

'খাদ্য-বিজ্ঞান' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আহারকালে অথবা আহারের অব্যবহিত পরে প্রচুর জলপান অবিধেয়। কারণ, তাতে লালাস্রাব সম্যকভাবে হতে পারে না। গুরুভোজনের পর অধিক জল পান করাও ঠিক নয়, তাতে পাকস্থলীর সঙ্কোচন-সম্প্রসারণ বাধা পায়, ফলে পরিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়। আহারের প্রারম্ভে অল্প জল পান করা ভালো। স্থপ বা ঐজাতীয় জিনিস খাওয়াও হিতকর।

তের : দেহের মূল নিয়ামক

কি উদ্ভিদ কি প্রাণী, দেহমাত্রেরই একটা প্রধান উপাদান প্রোটিন। আমাদের দেহ প্রধানত প্রোটিন দিয়েই তৈরি। দেহের চামড়া ও মাংসপেশী, দেহের বাইরের ও ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক, নখ, চুল, এমন কি হাড়েরও প্রধান উপাদান প্রোটিন।

যে কোনো জীবদেহেই আছে বহু ধরনের প্রোটিন। দেহকোষের অধিকতর কঠিন অংশ হচ্ছে নিউক্লিয়স আর সেই নিউক্লিয়সকে ঘিরে আছে সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজম প্রধানত প্রোটিন দিয়েই গঠিত। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বহু এনজাইম থাকে এবং ঐসব এনজাইমের উপর কোষের ক্রিয়াকর্ম নির্ভর করে। একটি ক্ষুদ্র মাইক্রোব অর্থাৎ জীবাণুতেও শতাধিক এনজাইম থাকতে পারে। এনজাইম মূলত প্রোটিন।

কোষের নিউক্লিয়সে শতকরা ৮০ ভাগ জল আর ২০ ভাগ কঠিন পদার্থ। ঐ ২০ ভাগ কঠিন পদার্থের শতকরা ৮০ ভাগই প্রোটিন, বাকি ২০ ভাগের মধ্যে ১৮ ভাগ ডি-এন-এ আর ২ ভাগ আর-এন-এ। ডি-এন-এ হচ্ছে ডিঅক্সি-রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড আর আর-এন-এ হল রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড। নিউক্লিক অ্যাসিডে এমনসব উপাদান থাকে যা বংশগতি নিয়ন্ত্রিত করে এবং কোষের নিয়মিত বিভাজন ও বহুলীভবন অর্থাৎ বংশবিস্তার পরিচালনা করে অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিডের ঐসব উপাদান যে 'নির্দেশ' দেয় তারই ফলে কোনো প্রজাতির নিষিক্ত ডিম্বাণু পরিপূর্ণতা লাভ করে ঐ প্রজাতিরই প্রাণিরূপে আত্ম-প্রকাশ করে, অন্য কোনো রূপে নয়। প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড প্রাণের দুটি মৌলিক পদার্থ।

প্রোটিন অণু আকারে খুবই বড়ো এবং জটিল। তার মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডের দীর্ঘ শৃঙ্খল। উদ্ভিদ অতি সাধারণ অজৈব পদার্থ থেকে প্রোটিন তৈরি করতে পারে, কিন্তু প্রাণীরা পারে না। তাই প্রাণীদের তৈরি-প্রোটিন, নিদেনপক্ষে প্রোটিন তৈরির কতকগুলি উপাদান দরকার হয়। কেবল প্রোটিনই মাংস আর রক্ত তৈরি করতে পারে। প্রোটিন ছাড়া দেহের বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেট দিয়ে প্রোটিনের কাজ হয় না, কারণ ফ্যাট আর

কার্বোহাইড্রেটে নাইট্রোজেন নেই। দেহের বৃদ্ধির সময় যখন নতুন টিস্যু তৈরি হতে থাকে তখন প্রোটিনের দরকার খুবই বেশি। এছাড়া ইংরেজীতে যাকে 'ওয়্যার অ্যাণ্ড টেয়্যার' বলে, আমাদের দেহে অবিরাম তা ঘটছে অর্থাৎ ব্যবহারাদির ফলে আমাদের দেহ অবিরাম ক্ষয় হচ্ছে। সেই-ক্ষয়পূরণের জন্যও প্রোটিন দরকার।

সারা জীবন ধরেই দেহকোষের কিছু-না-কিছু ভাঙচুর আর ক্ষয় আছে, তাই দেহকোষের পোষণ, জীর্ণসংস্কার আর প্রতিস্থাপনের জন্য সারা জীবনই প্রোটিনের প্রয়োজন। দেহ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সঠিক প্রকৃতির প্রোটিন না পায় তাহলে দেহের অধিকাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর টিস্যুই নষ্ট হয়ে যায়। উপযুক্ত পরিমাণে উপযুক্ত প্রোটিনের অভাবে মানুষের অবয়ব হ্রাস পায়, শক্তিহীনতা জন্মে, প্রজননক্ষমতা কমে এবং রোগপ্রতিরোধক্ষমতা লোপ পায়। দেহকে প্রোটিন যোগাতে হয় খাদ্যের মাধ্যমে।

প্রোটিনই মানুষের দেহের মূল নিয়ামক। সুস্থ সবল নীরোগ থাকার জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। শরীরের অন্য সমস্ত স্থানের চেয়ে মাংসপেশীতেই প্রোটিন বেশি থাকে। সুদৃঢ় সুপুষ্ট মাংসপেশী গোটা দেহটাকে আপনা-আপনি ঋজুভাবে ধরে রাখে। মাংসপেশী যদি তার ক্ষয়পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য না পায় তাহলে তার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়—ঠিক পুরনো রবার ব্যাণ্ডের মতো। তখন চেহারায় একটা দৈন্যভাব প্রকাশ পায়। একজন সুস্থ লোক যখন উঠে দাঁড়ায় তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মাথা থাকে উন্নত, বুক স্ফীত, কাঁধ আর উদরদেশ সমতল। তার পিঠের মাঝখানটা সামনের দিকে ঈষৎ বাঁকানো। পা দুটি সুনির্মিত খিলানোর মতো। হাঁটার মধ্যে ছন্দ।

আগেই বলেছি, আমাদের চুল আর নখও প্রোটিন দিয়ে তৈরি। সুতরাং চুল-নখ সুস্থ রাখতেও শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন দরকার।

খাদ্যের ভিতরকার প্রোটিন আমাদের দেহে পাচক-রস, হরমোন, প্লাজমা প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন, ভিটামিন আর এনজাইম তৈরির কাঁচামাল যোগায়। দেহের মধ্যে পুষ্টি (যেমন লিপোপ্রোটিন) আর ভেষজ উপাদান পরিবহণেও প্রোটিনের সাহায্য দরকার।

পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিনখাদ্য খাওয়ার কারণ এই যে, তাতে শরীরে অতি সহজেই শক্তি সৃষ্টি হয়। এক গ্র্যাম প্রোটিন থেকে চার ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। শরীরে অবসাদের একটা বড়ো কারণ রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যাওয়া।

অন্য কারণও কিছু আছে এবং সেইসব কারণের মূলে আছে প্রোটিনের অভাব। সেই কারণগুলি খুব তাড়াতাড়ি দূর করা যায় না। সেই কারণগুলি হল—অল্প রক্তচাপ, রক্তাল্পতা এবং খাদ্যকে ভেঙে শক্তিতে পরিণত করতে যেসব এনজাইম দরকার সেইসব এনজাইম উৎপাদনে দেহের অক্ষমতা।

উপযুক্ত ও সুষম খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে, ফলে রোগপ্রতিরোধ-ক্ষমতা বাড়ে। রোগসংক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার বহু ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে দুটি বিশেষভাবে প্রোটিনের উপর নির্ভরশীল। একটি হল অ্যান্টিবডি, আর-একটি রক্তের শ্বেতকণিকা। সাধারণ অবস্থায় যকৃৎই গামা গ্লোবিউলিন বা অ্যান্টিবডি নামক প্রোটিন তৈরি করে। এই প্রোটিনের কাজ বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া, ব্যাকটিরিয়া-জাত বিষ এবং ভাইরাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের ক্ষতি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া। শরীর যদি ঠিকমতো পুষ্টি পায় তাহলে প্রয়োজনীয় সমস্ত অ্যান্টিবডিই শরীরের ভিতর তৈরি হতে পারে। খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়িয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই অ্যান্টিবডির উৎপাদন ১০০ গুণও বাড়ানো যায়।

আমাদের শরীরে ফ্যাগোসাইট নামে এক জাতীয় কোষ আছে। এই কোষ রোগসংক্রমণরোধে সহায়তা করে। কিছু ফ্যাগোসাইট শরীরের বর্ণহীন রস বা লসিকা আর রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হয় আর কিছু ফ্যাগোসাইট স্থির থাকে—তারা থাকে রক্তবহা নালির গায়ে, ফুসফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষে এবং অন্যান্য টিস্যুতে—ঠিক অ্যান্টিবডির মতো তারা অবিরাম প্রহরায় থাকে। ব্যাকটিরিয়া যখন শরীর আক্রমণ করে, ফ্যাগোসাইট তখন সমবেত হয়ে শত্রুদের ঘিরে ফেলে—তারপর তাদের হজম করে ফেলে। ফ্যাগোসাইট তৈরি হয় প্রোটিন দিয়ে এবং খাদ্যে যদি উন্নত মানের প্রোটিন থাকে তবেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ফ্যাগোসাইট তৈরি হতে পারে।

স্বাভাবিক পরিপাকক্রিয়ার জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন দরকার। আমরা যে খাদ্য খাই তা বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের সাহায্যে এমনসব কণিকায় পরিবর্তিত হয় যা জলে দ্রবীভূত হয়ে রক্তে প্রবেশ করতে পারে। এইসব এনজাইম প্রোটিন দিয়ে তৈরি। তাই প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পেলেই কেবল পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র আর অগ্ন্যাশয় এইসব এনজাইম তৈরি করতে পারে। পাকস্থলী আর অন্ত্রের দেওয়াল মাংসল, অন্যান্য মাংসপেশীর মতোই তা ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত আর সম্প্রসারিত হয়। তার ফলে, পাচকরস আর এনজাইমের সঙ্গে খাদ্য ভালোভাবে মিশতে পারে এবং যে খাদ্য ইতিপূর্বে পরিপাক হয়ে গেছে তা অন্ত্রের দেওয়ালের সংস্পর্শে

এসে তারপর রক্তে প্রবেশ করতে পারে। অধিকন্তু, গোটা পরিপাকক্রিয়া যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে তার জন্য খাদ্য পরিপাক হওয়া দরকার দেহের স্বাভাবিক অবস্থানে। শরীরে প্রোটিনের যোগান যদি কম হয় তাহলে ঐ মাংসল দেওয়াল আর বন্ধনীগুলি শিথিল হয়ে পড়ে এবং ভিতরের অঙ্গসংস্থান নষ্ট হয়ে যেতে পারে—যেমন পাকস্থলী ঝুলে যেতে পারে, আড়াআড়ি থাকা নাড়ি-ভুঁড়ি কিংবা মলাশয় শ্রোণীচক্রের হাড়ের উপর সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে যেতে পারে, জরায়ু কিংবা মূত্রস্থলী কাত হয়ে যেতে পারে এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গও স্থানচ্যুত হতে পারে। অন্ত্রের আভ্যন্তর দেওয়ালের শিথিল পেশী তখন আর স্বাভাবিকভাবে সঙ্কুচিত হতে পারে না। ফলে, খাদ্যের অনেকটাই পরিপাক না হয়ে অজীর্ণ থেকে যায়। এই খাদ্য বৃহদন্ত্রে পৌঁছে কোটি কোটি পচনশীল ব্যাকটিরিয়ার জন্মের কারণ হয়, পেটে গ্যাস হয় এবং পেট ফাঁপে। শিথিল পেশী স্বাভাবিকভাবে দেহের ভিতর থেকে বর্জ্য পদার্থ ঠেলে বাইরে বার করে দিতে পারে না, সেই কারণে প্রায়শই কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। জোলাপ দিয়ে কিংবা ডুশ দিয়ে অজীর্ণ খাদ্য জোর করে শরীরের ভিতর থেকে বার করে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে ঐ শিথিল পেশী আরও ভেঙে পড়ে। সুতরাং রেচক সঠিক প্রতিষেধক নয়। সঠিক প্রতিষেধক প্রোটিন। খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন থাকলে পরিপাকক্রিয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

প্রোটিন আমাদের দেহের ভিতরকার জলীয় পদার্থগুলিকে কখনও অত্যধিক অ্যাসিডধর্মী কি অ্যালক্যালিধর্মী হতে দেয় না। প্রোটিন দিয়েই অধিকাংশ হরমোন তৈরি হয়। রক্ত জমাট বাঁধার ব্যাপারে প্রোটিনের একটা মস্ত ভূমিকা আছে। এসব ছাড়াও প্রোটিনের আরও অসংখ্য ভূমিকা আছে। প্রোটিন ছাড়া আমাদের দেহ সম্পূর্ণ অচল।

দেহক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে অন্যদিক দিয়েও প্রোটিনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। অ্যালবিউমিন নামে এক রকমের প্রোটিন আছে, সেই প্রোটিন তৈরি করে যকৃৎ। কিন্তু সব সময় যকৃৎ এই প্রোটিন তৈরি করতে পারে না। খাদ্যের ভিতর তার যাবতীয় উপাদান থাকলেই যকৃৎ এই প্রোটিন তৈরি করতে পারে। এই প্রোটিন বা অ্যালবিউমিনের জন্যই মূত্রসঞ্চয় সম্ভব হয়। রক্ত যখন কৈশিক পথে চলাচল করে তখন রক্তচাপের ঠেলায় প্লাজমা বা রক্তরস টিস্যুর ভিতর প্রবেশ করে। এইভাবে রক্ত গাঢ় হয়ে গেলে প্রোটিন-অ্যালবিউমিন কোষের ভিতর থেকে জলীয় পদার্থ টেনে এনে রক্তে

ছেড়ে দেয়। এই জলীয় পদার্থে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, কার্বন ডাই-অকসাইড এবং কোষের ভিতর টিস্যুর ভাঙনের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। এইসব বর্জ্য পদার্থ চলে যায় কিডনি আর ফুসফুসে।

অনুপযুক্ত খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যালবিউমিন তৈরি হতে পারে না, তখন টিস্যুর ভিতর থেকে বর্জ্য পদার্থ সম্পূর্ণ বার হয় না। মাসের পর মাস এইভাবে প্রোটিনের ঘাটতি চললে শরীরে অনেক জল জমে যায়। অনেক সময় বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। লোকে মনে করে, শরীরে মেদ জমে মোটা হয়েছে এবং খাদ্যে প্রোটিনের ভাগ আরও কমিয়ে দিয়ে রোগা হবার চেষ্টা করে। তাতে ফল আরও খারাপ হয়। শেষে প্রোটিনের ঘাটতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় যে, টিস্যুগুলি যে ফুলে উঠেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সারা দেহ তখন জলবন্দী। তখন পায়ের গাঁট ফুলে ওঠে, বিশেষ করে দিনের শেষভাগে। সকালে দেখা যায় মুখ ফোলা, হাত ফোলা, চোখের নিচেটা ফোলা।

অনেকে অজ্ঞতাবশত দেহের এই অস্বাভাবিক স্ফীতিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মনে করেন। বস্তুত, টিস্যুর ভিতর আবদ্ধ জলের দরুন অনেকটা হৃষ্টপুষ্ট দেখায়ও, বিশেষ করে শিশুদের। কিন্তু সেটা বিভ্রান্তি।

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যেসব প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড ও নাইট্রোজেন-যৌগ দরকার, আমাদের দেহই যাতে তা তৈরি করে নিতে পারে তার জন্য নাইট্রোজেন প্রয়োজন এবং সে নাইট্রোজেন যোগায় আমাদের খাদ্যে যে প্রোটিন থাকে সেই প্রোটিন। আমাদের খাদ্যের প্রোটিন যে নাইট্রোজেন যোগায় তা অতি সহজেই ব্যবহার করা যায়। এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়, মানুষের খাদ্যে প্রোটিন থাকতেই হবে, কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ আর অধিকাংশ অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর খাদ্যে প্রোটিন থাকার দরকার নেই। শেষোক্ত জীবেরা অ্যামোনিয়ার মতো সরল নাইট্রোজেন-যৌগ কিংবা অ্যামোনিয়াম লবণ, নাইট্রেট লবণ, নাইট্রাইট লবণ, ইউরিয়া, এমন কি বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাসও ব্যবহার করতে পারে। এই দলভুক্ত কিছু কিছু জীব সায়ানাইড লবণের উপরও বেঁচে থাকতে পারে যে সায়ানাইড লবণ মানুষ এবং উচ্চবর্গের অধিকাংশ জীবের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু মানুষের প্রোটিন চাই-ই চাই। শুধু মানুষ কেন, উচ্চবর্গের অনেক প্রাণীরই চাই।

এক প্রজাতির প্রাণীর দেহের বিশেষ রকমের প্রোটিন অন্য সমস্ত প্রজাতির প্রাণীর দেহের প্রোটিন থেকে আলাদা। সত্যি কথা বলতে কি, উচ্চবর্গের প্রাণীর

ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে, কিছু প্রোটিন ব্যক্তিভেদে ভিন্নরূপে দেখা দেয়—অর্থাৎ এক-একজনের এক-একরকম। এই বিভিন্নতার জন্যই দুর্ঘটনায় কি অস্ত্রোপচারে বা অন্য কোনোভাবে রক্তক্ষরণ হলে অথবা শরীরে রক্তের প্রয়োজন দেখা দিলে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের আগে রক্তের টাইপ বা গ্রুপ দেখে নিতে হয়। আবার, এই বিভিন্নতার কারণেই হার্ট, কিডনি প্রভৃতি ট্রান্সপ্লান্টেশন অর্থাৎ বদল করার পথে এত বাধা। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজের প্রোটিন, নিজের নিউক্লিক অ্যাসিড এবং নাইট্রোজেন-সমন্বিত অন্য কতকগুলি পদার্থ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। মানুষ খাদ্য হিসাবে যেসব জীবের মাংস খায় তার প্রোটিন ঐসব পদার্থ তৈরির কাঁচামাল।

প্রোটিন তৈরি হয় অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে। প্রোটিন ছাড়া অন্য কোনো খাদ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না। এ যাবৎ ২২টি অ্যামিনো অ্যাসিড আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই ২২টি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিভিন্ন সমন্বয়ে হাজার হাজার প্রোটিন তৈরি—ঠিক যেমন আমাদের বাংলা ৪৮টি অক্ষর দিয়ে হাজার হাজার শব্দ তৈরি। দুধের প্রোটিন আর সয়াবীনের প্রোটিন যেমন একজাতীয় নয় তেমনি আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানের প্রোটিনও এক ধরনের নয়। স্থান-বিশেষে পার্থক্য আছে। বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড বিভিন্ন সমবায়ে তৈরি বলে এই পার্থক্য। এক-একটি প্রোটিনে সম্মিলিতভাবে কয়েক হাজার অ্যামিনো অ্যাসিড থাকতে পারে। থাকলে তা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে, হাজার হাজার অক্ষর দিয়ে একটি শব্দ গঠন করলে যেমন জটিল হয়।

প্রোটিন শরীরের ভিতর গিয়ে আর প্রোটিন থাকে না, পরিপাকক্রিয়ায় ভেঙে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড রক্তে চলে যায়, তারপর সারা দেহে ছড়ায়। যেখানে যে কোষের যে অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োজন সেখানে সেই কোষ সেই অ্যামিনো অ্যাসিড টেনে নেয় এবং নতুন টিস্যু আর অ্যান্টিবডি, হরমোন, এনজাইম, রক্তকোষ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বস্তু নির্মাণে ব্যবহার করে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দেহকোষের এনজাইমের ক্রিয়ায় দেহের প্রোটিন ভেঙে যাচ্ছে, সুতরাং শরীর রক্ষা করতে চাইলে ক্ষতিপূরণের জন্য অবিলম্বে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া চাই। উপযুক্ত খাদ্যে দেহকোষ তার এনজাইমের সাহায্যে নতুন অ্যামিনো অ্যাসিডের সমবায়ে নতুন প্রোটিন তৈরি করতে পারে। সুতরাং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রোটিনখাদ্য দরকার।

একজন সাধারণ স্বাস্থ্যবান মানুষের দেহের যা ওজন তার শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ প্রোটিন। মানুষের দেহ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ফ্যাট অর্থাৎ স্নেহ-পদার্থ পেলে তা স্থায়িভাবে সঞ্চয় করে রাখতে পারে, কিন্তু প্রোটিনের বেলায় সে রকম কোনো ব্যবস্থা নেই—প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিন দেহে স্থায়িভাবে সঞ্চিত হতে পারে না। খাদ্যে যদি কখনও প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া না যায় তাহলে দেহ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাদি থেকে, বিশেষ করে যকৃৎ থেকে প্রোটিন টেনে নিয়ে তার কাজ চালায়।

স্বল্প প্রোটিনখাদ্য দিয়ে মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের লিভার, কিডনি, হার্ট আর কঙ্কালের উপরকার পেশীতে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। সবচেয়ে বেশি কমেছে লিভারে অর্থাৎ যকৃতে।

এক টিস্যুর প্রোটিনকে আর-এক টিস্যুর পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রোটিনে পরিবর্তিত করা যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মায়ের দেহে প্রোটিনের অভাব থাকলেও মায়ের প্রোটিনভাণ্ডার থেকে প্রোটিন নিয়ে ভ্রূণ শুধু যে বেঁচে থাকতে পারে তা-ই নয়, বৃদ্ধি লাভও করতে পারে।

আমাদের শরীরে 'readily available' অর্থাৎ সহজেই পাওয়া যায়, এমন কিছু প্রোটিন থাকে। দরকারের সময় অতি দ্রুত সেই প্রোটিন কাজে লাগে। এই ধরনের প্রোটিনকে বলে লেবাইল প্রোটিন বা অস্থির প্রোটিন। সারা দেহে তার পরিমাণ মোট প্রোটিনের পাঁচ শতাংশের বেশি নয়।

আমাদের শরীর যখন যতখানি প্রোটিন ব্যবহার করতে পারে তার চেয়ে বেশি প্রোটিন যদি আমরা খাই তাহলে যকৃৎ রক্ত থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড টেনে নেবে এবং সাময়িকভাবে তাকে এমন প্রোটিনে পরিবর্তিত করবে যা সঞ্চয় করে রাখা যায়। তারপর যে-ই দেহকোষ অ্যামিনো অ্যাসিডকে তার কাজে লাগিয়ে শেষ করে ফেলবে, অমনি শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করতে এগিয়ে আসবে ঐ সঞ্চিত প্রোটিন। সঞ্চিত প্রোটিনের ভাঙনের ফলে যে অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হবে তাতে আবার শূন্য ভাণ্ডার ভরে উঠবে। সুতরাং দেহ যতক্ষণ উপযুক্ত খাদ্য পাবে ততক্ষণ রক্তে এইভাবে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ মোটামুটিভাবে এক থাকবে। দেহ উপযুক্ত খাদ্য না পেলে অর্থাৎ খাদ্যে প্রোটিনের ভাগ কম থাকলে সঞ্চিত প্রোটিন খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তারপর থেকে অবিরত অধিকতর প্রয়োজনীয় জিনিস পুনর্গঠনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় টিস্যু থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড বেরিয়ে আসবে। ফলে, ঐ টিস্যুগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। এইভাবে

মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছরও চলতে পারে। তার ফল কখনই ভালো হতে পারে না। রক্তের প্রোটিন, হরমোন, এনজাইম আর অ্যান্টিবডি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরিমাণে তৈরি হতে না পারায় অলক্ষিতভাবে দেহের ভিতর অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে। মাংসপেশীর রং ঝরে যাবে, দেহে বলিরেখা ফুটে উঠবে—এবং স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে বার্ধক্য এসে জাঁকিয়ে বসবে। অপরপক্ষে, আমরা যদি দেহের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক প্রোটিন খাই তাহলে সঞ্চয়ভাণ্ডারগুলি ভরে যাবার পর যে প্রোটিন অবশিষ্ট থাকবে, যকৃৎ তাকে গ্লুকোজ আর ফ্যাটে পরিবর্তিত করে দেবে, নাইট্রোজেনের অংশ প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। এই পরিবর্তনক্রিয়ায় যে শর্করা আর ফ্যাট তৈরি হবে তা সঙ্গে সঙ্গে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে, আবার ফ্যাট হিসাবে সঞ্চিতও থাকতে পারে। অন্য খাদ্য যদি কম হয় তাহলে ক্যালরির প্রয়োজন মেটাতে শক্তি উৎপাদনের জন্যও প্রোটিন ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থা বড়ো একটা হয় না, কারণ প্রোটিনখাদ্য ব্যয়বহুল বলে শুধু প্রোটিনখাদ্য সাধারণত কেউ খায় না।

শরীরের প্রতিটি কলা গঠনের জন্য ২২টি অ্যামিনো অ্যাসিডের অনেক-গুলিরই প্রয়োজন হয়। এই ২২টি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে ১৪টি দেহের ভিতরেই তৈরি হয়, দেহ তার প্রয়োজনের সময় মেটাবলিক প্রিকারসার অর্থাৎ বিপাক পদ্ধতির সাহায্যে তৈরি করে নেয়—ব্যবহারের পর প্রোটিনের ভাঙনের ফলে যে নাইট্রোজেন বার হয় তার সঙ্গে শর্করা কিংবা ফ্যাট সংযুক্ত করে দেহকোষ তা তৈরি করে নিতে পারে। বাকি যে আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের ভিতর তৈরি হয় না সেই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি আমাদের খাদ্যে থাকা চাই। সেই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি ভিটামিনের মতোই অতি প্রয়োজনীয়। এই যে আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের ভিতর তৈরি হয় না, এই আটটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে বলা হয় 'এসেনশিয়্যাল অ্যামিনো অ্যাসিড' অর্থাৎ 'অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড'। কথাটা বিভ্রান্তিকর, কারণ সকল অ্যামিনো অ্যাসিডই শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কোনো অ্যামিনো অ্যাসিডই পরিহার করার মতো নয়। তাই অধুনা 'এসেনশিয়্যাল অ্যামিনো অ্যাসিড' না বলে 'ইনডিসপেনসেবল অ্যামিনো অ্যাসিড' অর্থাৎ 'অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড' বলা হয়।

মানুষের দেহে যে আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হয় না তা হল—ট্রিপ্টোফেন, লাইসিন, মেথিওনাইন, ফিনাইল-অ্যালানাইন, থ্রিওনাইন, ভ্যালাইন,

লিউসিন এবং আইসোলিউসিন। আর যে ১৪টি অ্যামিনো অ্যাসিড দেহে তৈরি হয় সেগুলি হল—গ্লাইসিন, অ্যালানাইন, গ্লুটামিক অ্যাসিড, প্রোলাইন, হাইড্রক্সিপ্রোলাইন, অ্যাস্পার্টিক অ্যাসিড, সেরাইন, টাইরোসাইন, সিস্টিন, হাইড্রক্সি-গ্লুটামিক অ্যাসিড, নরলিউসিন, ডাই-আয়োডো-টাইরোসাইন, হিস্টিডাইন এবং আর্জিনাইন। শেষোক্ত দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড সাধারণত শিশুদের দেহে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয় না। সুতরাং শিশুদের খাদ্যে এই দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকা খুবই দরকার।

আটটি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে যদি কখনও একটিরও অভাব ঘটে তাহলে তার ফল ক্ষুধামান্দ্য, খিটখিটে মেজাজ আর শরীরে নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালান্স। পরে ঐ অনুপস্থিত অ্যামিনো অ্যাসিডটি পেলেই শরীরে নাইট্রোজেন ব্যালান্স আবার ঠিক হয়ে যায়।

প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকে, কিন্তু প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যের পুষ্টিমূল্য নাইট্রোজেনের মোট পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে প্রোটিন তৈরি সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের উপর। জেল্যাটিনে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু তাতে সব অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড নেই, তাই তার পুষ্টিমূল্য সামান্য। আবার, একথা কখনই মনে করা উচিত নয় যে, কেবল অত্যাবশ্যক আমিনো অ্যাসিডগুলি পেলেই প্রয়োজনীয় প্রোটিন পাওয়া গেল।

অ্যামিনো অ্যাসিডে নাইট্রোজেন আছে, অ্যামিনো অ্যাসিড থেকেই প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। মাটি, জল আর বাতাসের কার্বন ডাই-অকসাইড থেকে উদ্ভিদ অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করে—মাটি থেকে পাওয়া যায় নাইট্রোজেন আর গন্ধক, জল থেকে পাওয়া যায় অকসিজেন আর হাইড্রোজেন আর বাতাসের কার্বন ডাই-অকসাইড থেকে পাওয়া যায় কার্বন আর অকসিজেন। মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া আর ছত্রাকের সাহায্যে উদ্ভিদ এই পদার্থগুলিকে সংশ্লেষিত করে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করে। কোনো প্রাণী বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংশ্লেষণ ঘটিয়ে অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে পারে না, তারা খাদ্য থেকেই অ্যামিনো অ্যাসিড আহরণ করে এবং বিপাকক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড সংশ্লেষ করে। সুতরাং প্রোটিন আছে এমন সমস্ত খাদ্যের, এমন কি মাছ মাংস প্রভৃতি খাদ্যেরও প্রাথমিক উৎস উদ্ভিদসর্গ।

প্রোটিনকে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়—প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন। মাছ মাংস ডিম দুধ ইত্যাদিতে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো

অ্যাসিড থাকায় এগুলি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ; আর চাল ডাল গম তরিতরকারি ইত্যাদিতে যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন পাওয়া যায় তা হল দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন, কারণ এগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সব অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড নেই।

প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন আর দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনের মধ্যে পার্থক্যটা খুব জোরাল নয়। এক-একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনকে আলাদা আলাদা করে দেখলে তাতে সব অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড না থাকতে পারে, কিন্তু এক-সঙ্গে যদি অনেকগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন খাওয়া যায় তাহলে একটার অভাব আর-একটা অনেকখানি পূরণ করতে পারে। সেইজন্য কেবল ভাত বা রুটির চেয়ে ডালভাত বা ডালরুটির প্রোটিনের জৈব্যমূল্য অনেক বেশি। এমন কি, দুধের মতো প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনেরও মূল্য বেড়ে যায় যদি তার সঙ্গে ভাত রুটি আলু ইত্যাদির মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাওয়া হয়।

প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ব্যয়বহুল, স্বল্প আয়ের মানুষের পক্ষে কষ্টসাধ্য। তাঁরা অনায়াসে একসঙ্গে অনেকগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন খেয়ে প্রায় সমান ফল লাভ করতে পারেন। মাছ মাংস ডিম জোটাতে না পারলে ভাত রুটি আলু ইত্যাদির সঙ্গে একটু দুধ খেয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারেন। কম দামের মাখন-তোলা গুঁড়ো দুধেও কাজ চলতে পারে। স্কিম্‌ড্‌ মিল্ক পাউডারে প্রোটিনের 'ইনটেক' বাড়ে।

যে কোনো প্রোটিনের মান নির্ভর করে তাতে কতগুলি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে এবং কী পরিমাণে আছে তার উপর। যে প্রোটিনে প্রচুর পরিমাণে আটটি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডই আছে তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ বা পর্যাপ্ত প্রোটিন। যদি শুধু এই ধরনের কোনো সম্পূর্ণ প্রোটিন যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া যায় তাহলেও স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। দুধ এইরকম এক সম্পূর্ণ প্রোটিন। যে প্রোটিনে এক বা একাধিক অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড নেই অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতখানি দরকার তার চেয়ে কম আছে সেই প্রোটিনকে বলা হয় অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত প্রোটিন।

ডিমের কুসুম, টাটকা দুধ, মেটে ইত্যাদি থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়, সেই কারণে এইসব খাদ্যের প্রোটিনের মান সবচেয়ে বেশি। পেশীময় মাংসের প্রোটিন সম্পূর্ণ প্রোটিন, কিন্তু তাতে গ্রন্থিময় মাংসের প্রোটিনের চেয়ে কিছু কম অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, তাই পেশীর মাংসের মান কিছু কম। তবে সামগ্রিকভাবে মাছ মাংস

ডিম দুধ ছানা চীজ ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিনে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে এবং অধিক পরিমাণেই থাকে। সুতরাং উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে প্রাণিজ প্রোটিন উন্নততর।

বাদাম সয়াবীন তুলাবীজ দানাশস্যের অঙ্কুর ইত্যাদি সম্পূর্ণ প্রোটিন। মটরশুঁটি বীন আর অঙ্কুরবিহীন দানাশস্যে কোনো কোনো অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না, তাই তা অসম্পূর্ণ প্রোটিন। সুতরাং কেবল এই জাতীয় প্রোটিনে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। সম্পূর্ণ আর অসম্পূর্ণের মাঝখানেও বহু প্রোটিন আছে, যেমন—চীনাবাদাম। চীনাবাদামের প্রোটিনে শরীরের বৃদ্ধি হতে পারে, ক্ষয়পূরণ হতে পারে—কিন্তু প্রজননের ব্যাপারে এই প্রোটিন সহায়ক নয়। তাছাড়া চীনাবাদাম ভাজলে তার লাইসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায়। দুধ জ্বাল দিলে তার ভিতরকার লাইসিনও নষ্ট হয়।

সব সময় সম্পূর্ণ প্রোটিনই খেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যদি দুই বা ততোধিক অসম্পূর্ণ প্রোটিন একসঙ্গে খাওয়া যায় তাহলে একের অপূর্ণতা অন্যে পূরণ করতে পারে এবং তারা মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাতে পারে। তবে অসম্পূর্ণ প্রোটিন খেলে একাধিক অসম্পূর্ণ প্রোটিন খেতে হবে এবং একসঙ্গে খেতে হবে।

যেসব খাদ্যে সম্পূর্ণ প্রোটিন আছে তার সবই সুস্বাদু নয়। সুস্বাদু অথচ সম্পূর্ণ প্রোটিনসমন্বিত খাদ্য সব সময়েই ব্যয়বহুল এবং অনেকের আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত সুলভ দুই বা ততোধিক অসম্পূর্ণ প্রোটিনখাদ্য একত্রে আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। আসলে ভক্ষ্য প্রোটিনের মান ও পরিমাণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা চাই।

প্রোটিনখাদ্য সম্বন্ধে সচেতনতা না থাকলে স্বাস্থ্য কখনও ভালো থাকতে পারে না। এই সচেতনতা সম্বন্ধে বলা যায়, "To obtain too little protein is a mark of carelessness or ignorance ; to obtain too much is foolish and expensive ; to obtain an adequate amount is to stay young for your years."

সহজ করে একটা কথা মনে রাখা যেতে পারে, তণ্ডুলজাতীয় শস্যে মোটামুটি ভালো রকমেরই প্রোটিন থাকে, শুঁটিজাতীয় শস্যে থাকে আরও বেশি এবং প্রাণিজ খাদ্যে তার চেয়েও বেশি। তাই প্রোটিনের বিচারে প্রাণিজ খাদ্যই প্রোটিনের সু-উৎস। স্টার্চ-সমন্বিত মূল আর সবজিতে সাধারণত খুব বেশি

প্রোটিন থাকে না।

পশ্চিমী খাদ্যবিজ্ঞানীরা বলেন, কেবল উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে শরীর রক্ষার উপযোগী যাবতীয় প্রোটিন পেতে চাইলে এত বিভিন্ন খাদ্য এত বেশি পরিমাণে খেতে হবে যে, তা একটা ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এবং পরিপাকযন্ত্রের উপর অহেতুক অত্যাচার করা হবে।

পশ্চিমী খাদ্যবিজ্ঞানীদের কথার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথার মিল দেখতে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "যাঁর উদ্দেশ্য কেবল মাত্র ধর্ম্ম জীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটে খুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবন-তরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈ কি? যতদিন মনুষ্য সমাজে এই ভাব থাকবে যে, বলবানের জয় ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোন রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার ক'রতে হবে, নৈলে বলবানের পদতলে দুর্ব্বল পেষা যাবেন। রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বললে চলে না—জাতি জাতির তুলনা ক'রে দেখ। এখন সর্ব্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র পাক হয় এমন খাদ্য খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে,—যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল বাকী আর কি কাম করবার শক্তি রইল?...সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশক্রোশ হেঁটে দিত, দুই কুড়ি কই মাছ কাঁটাশুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, একশ বছর বাঁচতো।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই কথার পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। যাঁরা খেটেখুটে জীবনতরী চালান তাঁদের মাংস খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। অনেকের ধারণা, যাঁরা অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁদের মাংস খাওয়া দরকার, কারণ মাংস পরিশ্রম সহ্য করার শক্তি যোগায়। কিন্তু এই ধারণার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। নিরামিষ খাদ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন থাকে এবং তা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সমস্ত রকম অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় তাহলে পুষ্টির দিক থেকে একজন নিরামিষভোজীকে স্বচ্ছন্দে একজন আমিষভোজীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

হান্টার-গ্যাদারারদের খাদ্যের একটা বড়ো অংশ ছিল মাংস—এবং সে মাংসের বিশেষ বাছবিচার ছিল না। আজও মানুষ ১০০ প্রজাতিরও বেশি প্রাণীর মাংস খায়, তবু পৃথিবীর অনেক দেশেই মাংসের ঘাটতি। পৃথিবীর বহু দেশেই আজ গ্রামের চাষী আর শহরের দরিদ্রদের পাতে কম মাংস ওঠে,

কোথাও কোথাও একেবারেই ওঠে না। ভারতে বহু লোক নিরামিষাশী এবং মাংসের দাম এত বেশি যে, যাঁরা মাংস খান তাঁদের বেশির ভাগই সপ্তাহে কি দু সপ্তাহে ৫০ থেকে ১০০ গ্র্যামের বেশি মাংস খেতে পান না। পুষ্টির দিক থেকে তাঁদেরও নিরামিষাশী বলা যেতে পারে। তাঁরা সকলেই বেঁচে আছেন এবং সুস্থ শরীরেই বেঁচে আছেন। তার কারণ, মাংস খেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই; প্রাণিজ প্রোটিন মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য নয়। পৃথিবীর বহু নিরামিষভোজী মানুষ সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু হয়েছেন। তাঁদের দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ছিল সব সময়েই।

এই প্রসঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অভ মেডিক্যাল রিসার্চ' কর্তৃক প্রকাশিত 'The Nutritive Value of Indian Foods and The Planning of Satisfactory Diets' গ্রন্থের একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "It will be found that – in general, animal proteins are rated higher in the scale of biological values. This only means that as single sources of food, animal foods like milk and egg are better sources of protein than vegetable foods. But diets are usually made up of a mixture of foods and hence it is posssible to have the protein supply in a diet much enhanced in value by a judicious combination of proteins even solely of vegetable origin. It has, in fact, been shown that the protein value of cereals can be improved by the addition of pulses and leafy vegetables. The nutritive value of a mixture of proteins is thus not merely the arithmetic mean of the values for the component proteins but something more than either because of the mutual supplementation among the amino-acids."

আমিষ আর নিরামিষ আহার সম্বন্ধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কথা বলেছেন, "বৌদ্ধযুগে বাংলার খাদ্যের বিশেষ খবর আমরা জানি না। তবে ঐ যুগের নিরামিষ আহার যে অন্ততঃ তৎকালের নগরগুলিতে উপযুক্ত (adequate) ছিল না, তাহা গৌড় নগরের ধ্বংস হইতে অনেকটা অনুমান করা যায়।...হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শাক্তমত এ দেশে প্রাধান্য লাভ করে, ফলে জৈব আমিষ জাতীয় খাদ্যের বেশ প্রচলন দেখা

যায়।…শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, —'পরন্তু জগাই মাধাই প্রভৃতির বৃত্তান্তে জানা যায়, তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া সর্ব্বদা মত্ত এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত, কিন্তু এরূপ বোধ হয় না যে, তাহারা তজ্জন্য জাতিচ্যুত অবস্থায় ছিল। এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পরিয়া বেশ সুখী ছিল।' কিন্তু এই যুগ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই; বস্তুতঃ, বহু বর্ষ বৌদ্ধত্বের পরে বাঙ্গালী যেন কেবলমাত্র পাঁটা কিনিয়া পাটাতে মসলা বাঁটিতে বসিয়াছিল, ইতোমধ্যে দুয়ারে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব মাদলে টঙ্কার দিয়া বৈষ্ণবমত প্রচার করাতে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী পাঁটাকে 'কৃষ্ণের জীব' জ্ঞানে প্রণাম করিয়া ছাড়িয়া দিল এবং মশলা ফেলিয়া পাটাতে চন্দন বাঁটিতে আরম্ভ করিল! অবশ্য চৈতন্য যুগে দেশে দুগ্ধের প্রাচুর্য্য ছিল।"

আমাদের খাদ্যে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে বিভিন্ন প্যাটার্নে এবং একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নই আমাদের দেহের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। কোনো কোনো প্রোটিনে, যেমন মাংস আর ডিমের প্রোটিনে, এই প্যাটার্ন খুব সহজেই পাওয়া যায়। সেই কারণে এই জাতীয় প্রোটিনই মানুষের পুষ্টির পক্ষে সবচেয়ে ভালো। অন্যান্য প্রোটিনে এক বা একাধিক অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড খুব সামান্য পরিমাণে থাকতে পারে, আবার একেবারে না-ও থাকতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাধারণ তণ্ডুলজাতীয় শস্য যা অধিকাংশ মানুষেরই প্রধান খাদ্য তাতে লাইসিন নামক অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড অপেক্ষাকৃত কম থাকে। ভুট্টায় কম থাকে ট্রিপ্টোফেন নামক অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড।

তণ্ডুলজাতীয় শস্যে লাইসিন কম থাকলেও শুঁটিজাতীয় শস্যের প্রোটিনে মোটামুটি ভালো পরিমাণেই লাইসিন থাকে। ডঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিমাপ করে দেখিয়েছেন, সব রকম ডালেই সমস্ত রকম অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। সুতরাং পুষ্টির দিক থেকে শুঁটিখাদ্যের প্রোটিনকে তণ্ডুলখাদ্যের প্রোটিনের 'পরিপূরক' বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, তণ্ডুলখাদ্য আর শুঁটিখাদ্য মিশিয়ে খেলে মানুষের প্রয়োজন মিটতে পারে। সেই কারণে ডালভাত খেয়েও মানুষ বেশ সুস্থ শরীরেই বেঁচে থাকে।

চুলের বৃদ্ধি প্রোটিনবিশেষের উপর নির্ভর করে। গন্ধকযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড সিস্টিন চুল ও লোমের প্রোটিনের উপাদান। যেসব প্রোটিনে সিস্টিন বেশি সেইসব প্রোটিনখাদ্য খেলে চুল বাড়ে। দুধে শতকরা ৩ ভাগ সিস্টিন আছে, পালংশাকে আছে শতকরা ১·৩ ভাগ, বাঁধাকপিতে ১·৩ ভাগ, মুর্গির মাংসে ১·৭ ভাগ।

বৃদ্ধির বয়সে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে প্রোটিন খাওয়া দরকার এবং সেই প্রোটিনের অন্তত অর্ধেক প্রাণিজ প্রোটিন হলে ভালো হয়। শৈশবে দুধ অতিশয় উপকারী। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের চেয়ে দুধের প্রোটিন শিশু ও বালকেরা সহজে পরিপাক করতে পারে। দুধের ছানা ও অ্যালবিউমিন অতি উচ্চস্তরের প্রোটিন। দুধের অ্যালবিউমিন জলে দ্রবীভূত হয় এবং ছানার জলে তা পাওয়া যায়। ছানার জলে বিভিন্ন লবণপদার্থ, বি-ভিটামিন ও এই মূল্যবান প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। সুতরাং ছানা কেটে ছানার জল ফেলে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। এমনি খেতে ইচ্ছা না হলে রান্নায় দিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

সয়াবীনে শতকরা ৪০-৪৬ ভাগ উচ্চস্তরের প্রোটিন, ১২-২৪ ভাগ ফ্যাট, লেসিথিন, ক্যালসিয়ম, ফসফেট, লোহা ও ভিটামিন-এ, বি, ডি এবং ই থাকে। এতে প্রোটিন থাকে ডিমমাংসের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি। হিন্দু বিধবা ও নিরামিষভোজী ব্যক্তিদের পক্ষে সয়াবীন খুবই হিতকর। বাত ও বহুমূত্ররোগেও এর উপকারিতা আছে দেখা যায়।

মাছমাংস ঠাণ্ডা জলে ফেলে আস্তে আস্তে গরম করলে প্রায় সমস্ত লবণজাতীয় পদার্থ এবং জলে-দ্রব পদার্থের অধিকাংশই জলের মধ্যে চলে আসে। সেই কারণে ঠাণ্ডা জলে মাছমাংস আস্তে আস্তে ফুটিয়ে স্থপ কিংবা ঝোল রান্না করা উচিত।

মাছমাংস ভাজলে প্রোটিনের উপরের অংশ জমে কঠিন হয়ে যায়, পরে জলে দিয়ে রান্না করলে লবণের অংশ বেশি নষ্ট হতে পারে না। সেইজন্য মাছমাংস একটু সাঁতলে নিয়ে রান্না করাই ভালো এবং যাঁরা ঝোলটোল বড়ো একটা খেতে চান না তাঁদের উচিত ডালের সঙ্গে অল্প-ভাজা মাছ খাওয়া। কারণ, তাতে মাছের ভিতরকার লবণপদার্থের অপচয় হয় না, উপরন্তু ডালেরও কিছু প্রোটিন আর ভিটামিন-বি পাওয়া যায়। মাছ কড়া করে ভাজলে বাইরের প্রোটিন-অংশ দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে। মাছমাংস বেশি ভাজলে তার প্রোটিন সঙ্কুচিত হতে থাকে, ফলে ভিতরকার লবণাংশ আর রস বেরিয়ে আসে। তখন সেই মাছমাংস খাওয়া অনেকটা আখের ছিবড়ে খাওয়ার মতো হয়।

ডিমের প্রোটিন কিন্তু বেশি উত্তাপে সঙ্কুচিত হয় না, সুতরাং ডিম সিদ্ধ করলে লবণাংশ নষ্ট হবার ভয় নেই। আধসিদ্ধ ডিম কিংবা অল্প-ভাজা ডিম ডালের সঙ্গে খাওয়া ভালো।

অতিরিক্ত কায়িক পরিশ্রমের জন্য কিন্তু অতিরিক্ত প্রোটিন দরকার করে না। খেলোয়াড়দের যে অনেক সময় বেশি প্রোটিন খেতে বলা হয়, সে অনেকটা

মানসিক শান্তির জন্য, নইলে অতিরিক্ত প্রোটিন তাঁদের দরকার করে না। অ্যান্টিয়া লিখেছেন, "An athlete taking normal combinations of foods and consuming 4000-5000 Calories naturally ingests twice the amount of protein. Thus, the advocated high protein diet for athletes has only a psychological effect."

পি ও অ্যাস্ট্র্যাণ্ড ১৯৭০ সালে তাঁর 'ডায়েট অ্যাণ্ড অ্যাথলীটিক পারফরম্যান্স' প্রবন্ধেও এইকথাই বলেছেন।

অত্যধিক কায়িক পরিশ্রমের জন্য প্রোটিনের পরিমাণ না বাড়িয়ে কার্বো-হাইড্রেট বা ফ্যাটের পরিমাণ বাড়ালেই চলে। অবশ্য গুরু পরিশ্রমে পূর্বসঞ্চিত কার্বো-হাইড্রেট ফুরিয়ে গেলে প্রথমে শরীরের সঞ্চিত চর্বি ক্ষয় হয়, পরে কিছু প্রোটিনও ক্ষয় হতে পারে। হঠাৎ অধিক পরিশ্রমে শর্করাজাতীয় পদার্থের উপকারিতার কথা আমরা মোটামুটি জানি, তাই দৌড়ঝাঁপের সময় মিছরির শরবৎ বা গ্লুকোজের জল খাই। অধিক কায়িক পরিশ্রমে যে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের বেশি দরকার তা মাঝিমাল্লা আর চাষীমজুরের খাদ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

প্রতিদিন কার কতখানি প্রোটিন দরকার, বলা মুশকিল। প্রোটিনের চাহিদা নির্ভর করে অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠনের উপর। খাদ্যে কেবল অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের পুরো 'কোটা' থাকলেই হয় না, অনত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডও থাকা চাই—তবেই ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

আবার, কেবল প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য খেলেই যথেষ্টভাবে প্রোটিনের পরিপাক ও পরিব্যবহার হয় না, উপাদান হিসাবে সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিড যদি একসঙ্গে পাওয়া না যায় তাহলে প্রোটিন-অণু গঠিত হতে পারে না। অব্যবহৃত অ্যামিনো অ্যাসিড দেহে সঞ্চিত হয় না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডি-অ্যামিনেটেড হয়ে রাসায়নিক রূপান্তর লাভ করে। সুতরাং প্রোটিনের সদ্ব্যবহার চাইলে খাদ্যে নানারকম প্রোটিনের মিশ্রণ থাকতে হবে।

প্রোটিনের চাহিদা ক্যালরির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। বেশি ক্যালরি খেলে বেশি প্রোটিন খেতে হয়। অর্থাৎ, মোট কতখানি ক্যালরি খাচ্ছি তার উপর প্রোটিনের চাহিদা নির্ভর করে।

যাঁরা অলস কিংবা বসে কাজ করেন তাঁরা যদি বেশি কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট খান তাহলে তা ক্ষয় হতে না পেরে চর্বি হিসাবে জমা হয়ে ভুঁড়ি হয় এবং যথোপযুক্ত পুষ্টির অভাবে নানাবিধ রোগ জন্মে।

চোদ্দ : সব খাদ্যেই শর্করা

ক্যালরির একটা প্রধান উৎস কার্বোহাইড্রেট। দরিদ্র দেশের মানুষ শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ক্যালরি পায় কার্বোহাইড্রেট থেকে। ধনী দেশের খাদ্যে প্রোটিন আর ফ্যাটের পরিমাণ বেশি, কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অল্প—শতকরা ৫০ ভাগ কি তারও কম।

ক্যালরির চাহিদা মেটাবার জন্য ফ্যাট যেমন দরকার তেমনি দরকার কার্বোহাইড্রেট। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বাড়িয়ে ফ্যাটের পরিমাণ কমানো যায়। আবার উলটোটাও করা যায়, অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমিয়ে ফ্যাটের পরিমাণ বাড়ানো যায়। কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট বিনিময়যোগ্য পদার্থ।

প্রতিদিন কার কতখানি কার্বোহাইড্রেট দরকার বলা মুশকিল। কার্বোহাইড্রেটের কোনো ন্যূনতম পরিমাণ বেঁধে দেওয়া যায় না। পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালরির জন্য যতখানি কার্বোহাইড্রেট দরকার, খেতে হবে। তবে মোটামুটিভাবে বলা চলে, আমাদের দেশে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ পুরুষের পক্ষে তার দেহের যা ওজন, প্রতি কিলোগ্র্যাম ওজনের জন্য ৪ থেকে ৬ গ্র্যাম কার্বোহাইড্রেট হলেই যথেষ্ট। একজন মানুষের ঠিক কী পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট দরকার তা হিসাব করার জন্য প্রথমে জানতে হয় মোট কতখানি ক্যালরি তার প্রয়োজন—এবং ক্যালরির প্রয়োজন নির্ভর করে দেহের উচ্চতা ও ওজন আর কী ধরনের কাজ সে করে তার উপর। তারপর সেই ক্যালরি যোগাতে হয় প্রোটিন, ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেটের মাধ্যমে।

এক গ্র্যাম প্রোটিনে ৪ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়, এক গ্র্যাম ফ্যাটে ৯ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায় আর এক গ্র্যাম কার্বোহাইড্রেটেও পাওয়া যায় ৪ ক্যালরি শক্তি। শরীরে মোট যত ক্যালরি শক্তি প্রয়োজন তার শতকরা ১১ ভাগ (শিশু এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী নারীর ক্ষেত্রে শতকরা ১৪ ভাগ) পাওয়া দরকার প্রোটিন থেকে, ফ্যাট খাওয়া দরকার দেহের প্রতি কিলোগ্র্যাম ওজনে ১ গ্র্যাম হিসাবে—এই হিসাবে যে পরিমাণ ক্যালরি বাকি থাকে তা পূরণ করা দরকার কার্বোহাইড্রেট দিয়ে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ৬০ কিলোগ্র্যাম ওজনের একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ

যাঁর দেহের উচ্চতা ১৭৫ সেন্টিমিটার এবং যিনি বসা-কাজে অভ্যস্ত তাঁর দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে ৩০ ক্যালরি হিসাবে ৬০ × ৩০ = ১৮০০ ক্যালরি দরকার। এই ১৮০০ ক্যালরির মধ্যে ২০০ ক্যালরি পাওয়া উচিত প্রোটিন থেকে (মোট ক্যালরির শতকরা ১১ ভাগ ধরে ৫০ গ্র্যাম প্রোটিন), ৫৪০ ক্যালরি পাওয়া উচিত ফ্যাট থেকে (প্রতি কিলোগ্র্যাম ওজনে ১ গ্র্যাম হিসাবে ৬০ গ্র্যাম ফ্যাট) আর বাকি যে ১০৬০ ক্যালরি থাকে তা পাওয়া দরকার কার্বোহাইড্রেট থেকে—এবং হিসাবে তা ২৬৫ গ্র্যাম কার্বোহাইড্রেট দাঁড়ায়।

এখানে বলা দরকার, কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে বি-গ্রুপের সব ভিটামিনই বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ গ্রহণ করে, তাই কার্বোহাইড্রেট শরীরে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। প্রকৃতি অধিকাংশ শস্য ও উদ্ভিদের মধ্যেই কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে ভিটামিন-বি বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য যখন রিফাইন করা হয়, যেমন চাল সাদা করার জন্য পালিশ করা হয়, তখন ভিটামিন-বি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, শরীরে ভিটামিন-বি'র অভাব ঘটে এবং কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়।

আমাদের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের আধার প্রধানত স্টার্চ বা শ্বেতসার এবং শর্করা। উদ্ভিদের বীজে এবং মূলে যেসব কণার মধ্যে ব্যবহারযোগ্য কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত থাকে তা-ই স্টার্চ। বর্ধমান উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে প্রকৃতি এই স্টার্চ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এখন কৃষির উন্নতির ফলে মানুষের প্রধান খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে স্টার্চকণিকা স্পষ্ট দেখা যায়। রান্নায় অর্থাৎ তাপে স্টার্চকণিকা স্ফীত হয়ে ফেটে যায় এবং তার ফলে সহজপাচ্য হয়। এই কারণে কাঁচা আলুর চেয়ে রান্না আলু সহজে হজম হয়।

স্টার্চ-অণু পরিপাকক্রিয়ায় প্রথমে ভেঙে মলটোজ শর্করায় পরিণত হয়, শেষে রূপান্তরিত হয় গ্লুকোজ শর্করায়। তারপর এই গ্লুকোজ যখন টিস্যুর ভিতর অত্যন্ত জটিল অকসিডেশন ক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অকসাইড আর জলে পরিণত হয় তখন দেহে তাপ ও শক্তি যোগায়।

অনেকের ধারণা, অত্যধিক স্টার্চযুক্ত খাদ্য খারাপ। ধারণাটা ঠিক নয়। আসলে ব্যাপার হচ্ছে, যেসব খাদ্যে অত্যধিক স্টার্চ থাকে সেইসব খাদ্যে অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্য, বিশেষ করে প্রোটিন থাকে কম, সেই কারণে অত্যধিক স্টার্চযুক্ত খাদ্যে গুণ কম।

তণ্ডুলজাতীয় শস্য, শুঁটিজাতীয় ফসল, বাদামজাতীয় ফল এবং তৈলবীজ, মূল, কন্দ ইত্যাদিতে স্টার্চ পাওয়া যায়। প্রাণিজ খাদ্যে স্টার্চ থাকে না। চাল গম যব মাইলো ভুট্টা ডাল আলু প্রভৃতি স্টার্চখাদ্যের উদাহরণ।

শর্করা আমাদের শরীরের পক্ষে অপরিহার্য, যেমন অপরিহার্য জল। কিন্তু অত্যধিক জল যেমন শরীরের পক্ষে ভালো নয় তেমনি ভালো নয় অত্যধিক শর্করাও। আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই প্রচুর পরিমাণে শর্করা খেয়ে ফেলি। যাঁরা চা-কফিতে চিনি খান না, সযত্নে সভয়ে ময়রার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন তাঁরাও প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে শর্করা খেয়ে থাকেন। চালে শর্করা আছে, গমে শর্করা আছে, ফলে শর্করা আছে, আছে জ্যাম জেলি কেক বিস্কুট টফি চকোলেট আইসক্রীম পুডিং কাস্টার্ড আর নানারকম তরিতরকারিতে।

আমরা যে খাদ্যই খাই না কেন, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে স্বাভাবিক শর্করা আছে। না থাকলেও এমন জিনিস আছে যা পরে শরীরের ভিতর ভেঙে কোনো-না-কোনো আকারের শর্করায় পরিণত হতে পারে। সমস্ত ফলেই প্রধানত তিন রকমের শর্করা আছে—ফ্রুকটোজ, সুক্রোজ আর গ্লুকোজ। ফ্রুকটোজ ফলের নিজস্ব শর্করা, সুক্রোজ সাধারণ চিনি আর রক্তে যে শর্করা আছে তার নাম গ্লুকোজ। মধু আর আঙুরের কঠিন অংশের প্রায় সবটাই ফ্রুকটোজ আর গ্লুকোজ। মিষ্টি আলু, টাটকা ভুট্টা, বীট, পেঁয়াজ ও অন্যান্য তরিতরকারিতে এই দুই শর্করাই পাওয়া যায়।

গ্লুকোজ ছাড়া অন্যান্য শর্করা রক্তস্রোতে পড়ার আগে অল্পবিস্তর রাসায়নিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যায় এবং সে রাসায়নিক পরিবর্তন সময় ও শক্তিসাপেক্ষ। গ্লুকোজ সরাসরি রক্তস্রোতে গিয়ে শক্তি সরবরাহ করতে পারে বলে রোগীকে তার দুর্বলতার জন্য যেভাবেই হোক, কিছু গ্লুকোজ দিতে পারলে কাজ হয়।

ফ্রুকটোজ আর গ্লুকোজ দুই-ই অন্ত্রের ভিতর এনজাইমের উপস্থিতিতে ফ্রুকটোজ ফসফেট আর গ্লুকোজ ফসফেটে পরিণত হয়ে অন্ত্রের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে রক্তে শোষিত হয়। অতি সামান্য পরিমাণ ফ্রুকটোজ আর গ্লুকোজ এনজাইমের সাহায্য ছাড়াই অন্ত্র থেকে ডিফিউশন অর্থাৎ ব্যাপনক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তে শোষিত হতে পারে, কিন্তু তা শরীরের বিশেষ কাজে লাগে না। রক্তে যে গ্লুকোজ গিয়ে মেশে তা সক্রিয় গ্লুকোজ (গ্লুকোজ ফসফেট), এই গ্লুকোজ যেমন কোষের কাজে লাগতে পারে তেমনি গ্লাইকোজেন হিসাবে মজুত থাকতেও পারে।

আর-একটি খুব উপকারী শর্করা ল্যাকটোজ। কেবল দুধেই এই শর্করা পাওয়া যায়। অন্যান্য শর্করার চেয়ে এই শর্করা পরিপাক হয় কম, কখনও কখনও হয়ই না আপাতদৃষ্টিতে। সেই কারণে এতে মেদবাহুল্য ঘটে না। ল্যাকটোজ যদি পরিপাক হয় তাহলে প্রথমে তা ভেঙে গ্লুকোজ আর গ্যালাকটোজে পরিণত হয়। ল্যাকটোজে মেদবাহুল্য ঘটে না বলে মাতৃস্তন্য খেয়ে বড়ো হয় যেসব শিশু তারা বড়ো একটা মোটা হয় না। কিন্তু যেসব শিশু চিনি মেশানো কৌটোর গুঁড়ো দুধ খায় তাদের মধ্যেই নাদুসনুদুস থলথলে ভাব দেখা যায় বেশি। আমাদের শরীরে অন্ত্রের ভিতর যেসব উপকারী ব্যাকটিরিয়া আছে, ল্যাকটোজ তাদের একটা খাদ্য। এই ব্যাকটিরিয়াই ল্যাকটোজকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। যাঁরা স্নেহপদার্থ খুব কম খান কি খানই না তাঁদের পক্ষে দুধের শর্করা ক্ষতিকর হতে পারে।

গ্যালাকটোজ প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় দেখা যায় না। অ্যাসিড বা এনজাইমের ক্রিয়ায় ল্যাকটোজ সমান পরিমাণ গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে পরিণত হয়। যকৃতে গ্লাইকোজেন হিসাবে গ্যালাকটোজ সঞ্চিত হয়। স্তনগণ্ডে এনজাইমের সাহায্যে গ্লুকোজ থেকেই সম্ভবত গ্যালাকটোজ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে যকৃৎ ও স্তনগণ্ডের কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত। যকৃৎ গ্যালাকটোজকে এবং স্তনগণ্ড গ্লুকোজকে গ্যালাকটোজে পরিণত করে।

সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধেই ল্যাকটোজ আছে। মানুষের দুধে আছে সবচেয়ে বেশি। স্তনগণ্ডে গ্লুকোজ থেকে ল্যাকটোজ তৈরি হয়। সুক্রোজের মতো ল্যাকটোজ পাকস্থলীতে প্রদাহ সৃষ্টি করে না, সুতরাং ল্যাকটোজ অনেক নিরাপদ। স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের গ্যালাকটোসাইড উৎপাদন নির্ভর করে ল্যাক-টোজের উপর। মানুষের দুধে ল্যাকটোজ বেশি থাকায় তার মস্তিষ্কে গ্যালাকটোসাইডও বেশি উৎপন্ন হয়। মানুষ যে উন্নততর মস্তিষ্কের অধিকারী তার অন্যতম প্রধান কারণ সম্ভবত তার দুধে ল্যাকটোজের আধিক্য।

অনেক ফলে এবং সবজিতে, যেমন আপেল আনারস গাজর মটরশুঁটি প্রভৃতিতে সুক্রোজ আছে। সুক্রোজ পরিপাকক্রিয়ায় গ্লুকোজ আর ফ্রুকটোজে পরিবর্তিত হয়। মল্ট অর্থাৎ যবমণ্ড থেকেও অনুরূপ এক শর্করা পাওয়া যায়, তার নাম মল্টোজ। শ্বেতসার যখন পরিপাক হয় তখন অন্ত্রের ভিতর মুহূর্তের জন্য মল্টোজ তৈরি হয়ে তা ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়।

আমাদের দেহে গুপ্ত শর্করার একটা বড়ো উৎস এই শ্বেতসার। টাটকা

ফল আর বিভিন্ন তরিতরকারি থেকে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার পাওয়া যায়। চাল গম ডাল ইত্যাদি তণ্ডুলজাতীয় শস্যেও প্রচুর শ্বেতসার আছে। জীবজন্তুরা তাদের দেহে গ্লাইকোজেন নামক শ্বেতসার হিসাবে শর্করা মজুত করে রাখে, তাই মাছমাংস থেকেও আমরা গ্লাইকোজেনের আকারে শর্করা পেতে পারি। যে কোনো শ্বেতসারের মতো গ্লাইকোজেনও পরিপাক হবার সময় গ্লুকোজে পরিণত হয়। মাছমাংসের প্রোটিনও কিছু পরিমাণ গ্লুকোজে পরিণত হয়। সমস্ত ফ্যাটেই শতকরা ১০ ভাগের মতো গ্লিসারিন থাকে এবং সেই গ্লিসারিন দেহের ভিতর শর্করায় পরিণত হতে পারে।

আজ অনেকেই স্বীকার করেন, সুক্রোজের চেয়ে গ্লুকোজই শরীরের পক্ষে ভালো। চিনির চেয়ে মধু ভালো, কারণ মধুতে গ্লুকোজ আছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ মধুর কদর—সে শুধু সুস্বাদু বলে নয়, ওষুধ এবং পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবেও। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে মধুকে খুব একটা উঁচু আসন দিতে রাজী নন, কারণ বেশির ভাগ মধুতেই শতকরা প্রায় ২০ ভাগ জল আর প্রায় ৭৫ ভাগ শর্করা (প্রধানত ফ্রুকটোজ আর গ্লুকোজ), অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্যের পরিমাণ খুব কম। তবে সাধারণভাবে চিনির চেয়ে মধু যে ভালো সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অন্য যে কোনো পুষ্টিদ্রব্যের মতো শর্করাও শরীরের পক্ষে সমান প্রয়োজন, কিন্তু শরীর সুস্থ রাখতে হলে তা আহরণ করতে হবে অপরিশোধিত, স্বাভাবিক সামগ্রী থেকে। শর্করার প্রয়োজন দেহে শক্তি যোগাবার জন্য। পরিমাণে বেশি হয়ে গেলে বাড়তি শর্করা চর্বি হয়ে সারা জীবন গায়ে লেগে থাকে। এই চর্বিতে দেহকলা তৈরি হয় না, সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে না, সৌন্দর্যও বাড়ে না।

পনের : মেদহ্রাসেও ফ্যাটের ভূমিকা আছে

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিজ্ঞানীরা প্রোটিন, ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেটের প্রতি মনোযোগ দিলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন, কীকরে শরীরের মধ্যে এসব তৈরি হয়, কোথা থেকে এই জিনিসগুলি আসে এবং খাদ্যে এই জিনিসগুলির কোনো প্রয়োজন আছে কিনা। প্রথমে ধারণা ছিল, পশুর দেহে যে চর্বি থাকে তা তাদের খাদ্যের ফ্যাট থেকেই আসে। কিন্তু গবাদি পশু তো ঘাসপাতা খায়, ঘাসপাতায় তো বিশেষ ফ্যাট থাকে না। বুশিংগোল নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী কতকগুলি রাজহাঁসকে এমন খাদ্য খাওয়াতে লাগলেন যাতে মোটেই ফ্যাট নেই। রাজহাঁসগুলি কিন্তু বেশ ভালোই বাড়তে লাগল এবং তাদের দেহে চর্বিও জমল বেশ। এরপর তিনি কতকগুলি পাতিহাঁস নিয়ে পরীক্ষা চালালেন এবং সে ক্ষেত্রেও দেখলেন, ফ্যাটবর্জিত খাদ্য খাওয়ানো সত্ত্বেও পাতিহাঁসগুলির দেহে বেশ ভালো চর্বি জমেছে। অন্যান্য দেশে কুকুর এবং গবাদি পশুর উপর অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়েও দেখা গেল, পশুদেহ কার্বোহাইড্রেট থেকে ফ্যাট তৈরি করতে পারে। মানুষের দেহও পারে। দেহ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ ক্যালরি পায় তখন অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট বিপাকক্রিয়ায় রাসায়নিকভাবে ফ্যাটে রূপান্তরিত হয় এবং চর্বি হিসাবে দেহে জমে।

এর অর্থ এই নয় যে, খাদ্যে ফ্যাটের দরকার নেই। ফ্যাটের শক্তিমূল্য প্রচুর। কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিনে যতখানি শক্তি পাওয়া যায়, সমান ওজনের ফ্যাটে তার চেয়ে সওয়া দুগুণ বেশি শক্তি পাওয়া যায়।

ফ্যাটের প্রতি অনেকেরই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আছে, ফ্যাটকে তাঁরা ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। এটা ঠিক নয়। পুষ্টির দিক থেকে প্রতিটি পুষ্টিদ্রব্যই সমান মূল্যবান। শরীরে ফ্যাটের অভাব হলে অন্য যে কোনো পুষ্টিদ্রব্যের অভাবের মতো নানারকম গোলমাল দেখা দিতে পারে—এবং দেয়ও। ফ্যাটের প্রধান কাজ শরীরে ক্যালরি যোগানো। ফ্যাটের দরুন খাদ্যে একটা রুচিকর সুগন্ধ পাওয়া যায়। ফ্যাট অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় বেশি সময় পাকস্থলীতে থাকে বলে একটা পরিতৃপ্তির ভাবও আসে।

ফ্যাট অনেকরকম এবং তার মানও বিভিন্ন। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে কিছু-না-কিছু ফ্যাট আছে। বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন জাতের ফ্যাট। মস্তিষ্ক আর স্নায়ুমণ্ডলী ঠিকমতো কাজ করতে পারে না যদি-না তাদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় ফ্যাট ও ফ্যাটজাতীয় দ্রব্য যোগানো হয়। অ্যাড্রিন্যাল আর যৌনগ্রন্থির হরমোন বিশেষ ধরনের ফ্যাট দিয়ে তৈরি। আমাদের অন্ত্রের ভিতর অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাকটিরিয়া আছে, তাদেরও ফ্যাট দরকার। যে কোনো পুরনো ফ্যাট থেকেই ক্যালরি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পূর্বোক্ত কাজ-গুলির জন্য কেবল বিশেষ বিশেষ জাতেরই ফ্যাট প্রয়োজন।

ফ্যাট পাকস্থলীতে গিয়ে পরিপাকক্রিয়ায় গ্লিসারিন (গ্লিসারল) আর বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডে ভেঙে যায়। ঐসব ফ্যাটি অ্যাসিডের এক-একটার এক-এক নাম এবং একটা ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে আর-একটা ফ্যাটি অ্যাসিডের অমিল। প্রতিটি ফ্যাটি অ্যাসিডেরই আলাদা আলাদা গুণ।

আমরা যদি ফ্যাট না-ও খাই তবু আমাদের দেহ শর্করা থেকে এইসব অ্যাসিডের অধিকাংশই তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের দেহ কখনই তৈরি করতে পারে না। সেই তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিড হল—লাইনোলিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড এবং লাইনোলিনিক অ্যাসিড। এই তিনটি অ্যাসিডকে বলা হয় অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড। মানুষের শরীরে প্রচুর পরিমাণে লাইনোলিক অ্যাসিড থাকে। যৌন হরমোন ও অ্যাড্রিন্যাল হরমোন তৈরির জন্য লাইনোলিক অ্যাসিড প্রয়োজন। বিকল্পে, অন্য দুটি অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিডের যে কোনো একটি। অন্ত্রের ভিতর উপকারী ব্যাকটিরিয়া আর প্রতিটি দেহকোষের ফ্যাটসমন্বিত অংশের জন্যও এই অ্যাসিড দরকার।

অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায় প্রধানত স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ তেলে। অ-স্বাভাবিক অর্থাৎ হাইড্রোজেন-সহযোগে জমানো উদ্ভিজ্জ তেল এবং প্রাণিজ স্নেহ—যেমন ঘি, মাখন, মাছের তেল, মাংসের চর্বি ও ডিমের কুসুমে এই অ্যাসিড থাকে অতি অল্প।

ফ্যাটি অ্যাসিডের আকৃতি অনেকটা শিকলের মতো—কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো। অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিডের শিকলের গায়ে কতকগুলি আংটা থাকে, সেখানে অনায়াসে অন্য কোনো পদার্থ যোজনা করা যায়। কোনো ফ্যাটে অকসিজেন যোগ করলে সেই ফ্যাট পচে গিয়ে তা থেকে দুর্গন্ধ বার হয়।

হাইড্রোজেন যোগ করলে ফ্যাট আরও কঠিন হয়ে যায়। আমাদের দেহে এই রকম শূন্য আংটাওয়ালা কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড থাকা দরকার অর্থাৎ অপরিপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড—যা অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের অন্যত্র পরিবহণে সাহায্য করতে পারে, আবার তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোষগঠনে ব্যবহৃতও হতে পারে।

আমাদের শরীরে যখন যতখানি শর্করা বা শ্বেতসার দরকার, আমরা যদি তার চেয়ে বেশি খাই তাহলে ঐ বাড়তি অংশ ফ্যাটে পরিবর্তিত হয়— এবং এই ফ্যাট শুধু ফ্যাটি অ্যাসিডের শিকল দিয়েই তৈরি, কিন্তু সেই শিকলে অন্য কোনো পদার্থ যোজনা করা যায় না। এই ফ্যাট ঘন নিবিড় স্নেহপদার্থ। এই কারণে এই ধরনের বাড়তি শর্করায় বা শ্বেতসারে মেদবৃদ্ধি হয়। আমাদের দেহ কিন্তু, আগেই বলেছি, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারে না। শর্করা ফ্যাটে পরিবর্তিত হলেও সেই ফ্যাটকে আবার শর্করায় পরিণত করা যায় না।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, খাদ্যে যদি অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিডের ঘাটতি থাকে তাহলে একজিমা নামক চর্মরোগ হতে পারে। আজকাল এমনও সন্দেহ করা হচ্ছে যে, গর্ভাবস্থায় নারীর খাদ্যে ফ্যাটের ঘাটতি থাকলে প্রসবের পর সন্তানের একজিমা হতে পারে। হতে দেখাও গেছে অনেক ক্ষেত্রে।

বিভিন্ন বি-ভিটামিনের যে কোনো একটির অভাবে যদি একজিমা হয় তাহলে, পরীক্ষায় দেখা গেছে, ফ্যাটে যে লাইনোলিক অ্যাসিড থাকে তা এই ধরনের একজিমার প্রতিষেধক এবং প্রতিকারক।

মেদহ্রাসেও ফ্যাটের একটা ভূমিকা আছে। পায়ের গাঁট, পা, এমন কি উরু অস্বাভাবিক রকম ফোলা অথচ প্রোটিনখাদ্য যথেষ্টই আছে, এমন মেদবহুল লোকের প্রাত্যহিক খাদ্যে কিছুটা করে স্যালাড অয়েল দিয়ে অ্যাডেল ডেভিস দেখেছেন, তাদের মেদ আশাতীত রকম কমেছে। আবার, তেলবর্জিত খাদ্যের উপর নির্ভরশীল মানুষের খাদ্যে তেল যোগ করে দেখেছেন, তাদের যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে, মাসিক রজঃস্রাবের গোলমাল কেটে গেছে এবং গর্ভধারণে অপারগ নারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। খাদ্যে কেবল স্যালাড অয়েল যোগ করে যেমন রুক্ষ শুষ্ক বিবর্ণ চুলে ঔজ্জ্বল্য আনা যায় ও তাতে প্রাণ সঞ্চার করা যায় তেমনি খসখসে খড়ি-ওঠা দগ্ধ চামড়া মসৃণ মনোহর করা যায়।

অত্যধিক কম ফ্যাট খাওয়ার ফলে যে মেদবৃদ্ধি ঘটে তার প্রধান কারণ

খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথমত, বহু স্থূলকায় মানুষ আসলে মেদবহুল নয়, তাদের দেহে জলীয় পদার্থের অংশই বেশি। তাদের বলা যায়, জলবন্দী মানুষ। তাদের খাদ্য যদি উপযুক্ত হয় এবং তাতে যদি বেশ কিছুটা করে স্যালাড অয়েল থাকে তাহলে অনেক সময় তাদের স্থূলতা কমে। দ্বিতীয়ত, অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তাহলে দেহ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য খুব তাড়াতাড়ি শর্করাকে ফ্যাটে পরিবর্তিত করে নেয়। অতি দ্রুত এই ঘটনা ঘটার জন্য রক্তশর্করা হঠাৎ খুব নিচে নেমে যায়, ফলে প্রচণ্ড ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং তখন মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খায়। তাতে মেদবৃদ্ধি ঘটে। তৃতীয়ত, এটা আমাদের প্রায় সকলেরই অভিজ্ঞতা যে, খাদ্যে ফ্যাট বেশি থাকলে অল্পেতেই মুখ মেরে আসে, বেশি খাওয়া যায় না। কিন্তু কম থাকলে খাওয়ার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। খাদ্যে ১০০ ক্যালরি ফ্যাট ছাঁটাই করলে ক্ষুধা এত বেশি হয় যে, ৫০০ ক্যালরি শর্করা বা শ্বেতসার খেতে হয়। ফলে, অবাঞ্ছিত মেদবৃদ্ধি ঘটে।

লাইপেজ নামে এক ধরনের এনজাইম ফ্যাটপরিপাকে সহায়তা করে। কিন্তু লাইপেজ সাধারণত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, পিত্তলবণ তাকে সক্রিয় করে তোলে এবং তার জন্য কিছুটা ফ্যাট দরকার। ফ্যাট যখন অন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করে, কেবল তখনই পিত্তকোষ থেকে প্রচণ্ড ধারায় পিত্তরস বার হতে থাকে। ফ্যাট ছাড়া অতি সামান্যই পিত্তরস তৈরি হয় এবং পিত্তকোষ তার সংরক্ষিত পিত্তরস ছাড়ে না। দিনের পর দিন ফ্যাটবর্জিত খাদ্য খেতে থাকলে শেষপর্যন্ত পিত্তকোষ শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। ফ্যাট আর পিত্তরস ছাড়া অন্ত্র থেকে ভিটামিন-এ, ডি, ই এবং কে রক্তে শোষিত হতে পারে না। ফলে, ফ্যাটবর্জিত খাদ্য খেতে থাকলে কিংবা পিত্তরস অন্ত্রে পৌঁছতে না পারলে শরীরে ঐসব ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়।

ফ্যাটি অ্যাসিড জলে দ্রবীভূত হয় না, তাই প্রাণিদেহের ঝিল্লীর ভিতর দিয়ে পরিব্যাপ্ত হতে পারে না। কিন্তু পিত্তের অ্যাসিডের সঙ্গে মিশে এমন যৌগে পরিণত হতে পারে যা জলে দ্রবণীয় হয় এবং প্রাণিদেহের ঝিল্লীর ভিতর সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। এই যৌগ অনায়াসেই অন্ত্রের গা ভেদ করে চলে যায় রক্তে আর লসিকায়। আমাদের দেহে যে কোটি কোটি কোষ আছে তার প্রত্যেকটাই তার প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড আর ফ্যাট টেনে নেয়। ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রয়োজন কোষের কাজে আর ফ্যাটের প্রয়োজন তাৎক্ষণিক শক্তি সৃষ্টিতে।

কিছু ফ্যাট যকৃতে আটকা পড়ে এবং পরে শক্তির উৎস হিসাবে রক্তে ফিরে যায়। বাকি ফ্যাট অবাঞ্ছিত চর্বি হিসাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জমা হয়।

দেহে শক্তির চাহিদা মেটাবার পর যে ফ্যাট বাড়তি থাকে তা চামড়ার নিচে, উদরগহ্বরে, পেশীতে এবং কিডনি আর ওভারি অর্থাৎ ডিম্বাশয়ের চারদিকে চর্বির ডিপোগুলিতে গিয়ে জমে। একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দেহের ওজনের শতকরা ১৫ থেকে ১৮ ভাগ চর্বি। ষাট কিলোগ্র্যাম ওজনের একজন মানুষের দেহে প্রায় ৯ কিলোগ্র্যাম চর্বি থাকে। এই পরিমাণ চর্বি তাকে চার সপ্তাহেরও বেশি তার প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্যালরি যোগাতে পারে। সেই কারণে চর্বিকে দেহের মজুত জ্বালানি বলা হয়।

শরীরের বৃদ্ধি আর পুষ্টির জন্য যেসব অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড দরকার তা পাওয়া যায় ফ্যাট থেকে। শরীর যদি ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেট থেকে তার প্রয়োজনীয় শক্তি পেয়ে যায় তাহলে আর প্রোটিনে টান পড়ে না, প্রোটিন তখন টিস্যুর বৃদ্ধি আর মেরামতের কাজে লাগতে পারে। একে বলে protein sparing effect of fats and carbohydrates.

শরীরে কিছু জমা ফ্যাট থাকা ভালো। কিডনির চারপাশে কিছু চর্বি থাকলে কিডনি ভালো অবলম্বন পায়। চামড়ার নিচে চর্বির একটা পাতলা আস্তরণ থাকলে মাংসপেশী আর নার্ভ চামড়াকে রক্ষা করে, শরীরের তাপমাত্রাও ঠিক থাকে। অসুস্থতা বা অন্য কোনো সময় যখন আমাদের আহারেচ্ছা থাকে না, আমরা কম খাই তখন এই জমা চর্বি আমাদের দেহে শক্তি যোগায়। তবে অতিরিক্ত জমা চর্বি কোনো সময়েই ভালো নয়।

কখনও কখনও খাদ্যে খনিজ তেল ব্যবহার করা হয়, জোলাপ হিসাবেও অনেকে খনিজ তেল খান। এটা কখনই ভালো নয়। খনিজ তেল হজম হয় না, তাই এই তেল খাদ্য নয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, খনিজ তেলের শতকরা ৬০ ভাগ অন্ত্রে পৌঁছে রক্তে চলে যায়। তারপর রক্তের সঙ্গে যখন সারা দেহে সঞ্চালিত হয় তখন ভিটামিন-এ, ডি, ই এবং কে শোষণ করে ধরে রাখে এবং পরে মলের সঙ্গে বার করে দেয়। ফলে, শরীরে ঐসব ভিটামিনের অভাব ঘটে। এই কারণে খনিজ তেল কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়—ওষুধ হিসাবেও না, শিশুদের গায়ে মাখার জন্যও না, এমন কি কোল্ড ক্রীম বা অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রীতেও না।

ফ্যাটে কার্বন, হাইড্রোজেন আর অকসিজেন থাকে। ঘি মাখন চর্বি প্রভৃতি

প্রাণিজ ফ্যাটে ভিটামিন-এ থাকে, কিন্তু উদ্ভিজ্জ তেলে থাকে না। সেই কারণে বনস্পতি জাতীয় পদার্থে সিন্থেটিক ভিটামিন-এ যোগ করতে হয়।

মার্জারিন হল কৃত্রিম মাখন। মাখনের চেয়ে দামে শস্তা বলে পৃথিবীর বহুদেশে এখন মার্জারিনের বহুলব্যবহার। ১৮৭০ সালে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী প্রথম মার্জারিন তৈরি করেন। গ্রীক মার্জারন শব্দ থেকে মার্জারিন। মার্জারন-অর্থ মুক্তো। দুধের সঙ্গে ফ্যাটের মন্থনে মুক্তোর-মতো-দেখতে ছোটো ছোটো দানা তৈরি হয়। ননীতোলা দুধের সঙ্গে তপ্ত নারকেল তেল, বাদাম তেল বা সয়াবীনের তেলের মতো কোনো উদ্ভিজ্জ তেল মিশিয়ে মন্থন করে মার্জারিন তৈরি করা হয়। দেখতে যাতে মাখনের মতো হয় সেজন্য হলুদ রং মেশানো হয়। মার্জারিন মাখনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলে মাখনে যে পরিমাণ ভিটামিন-এ আর ডি থাকে, মার্জারিনেও যাতে সেই পরিমাণ ভিটামিন-এ আর ডি পাওয়া যায় সেজন্য মার্জারিনে কিছু পরিমাণে ঐ দুটি ভিটামিন যোগ করা হয়।

অপরিশোধিত উদ্ভিজ্জ তেলে ভিটামিন-ই পাওয়া যায়; ঘি, মাখন, ডিমের কুসুম ইত্যাদিতে পাওয়া যায় ভিটামিন-এ। মাছের লিভারের তেলে থাকে ভিটামিন-এ এবং ডি। প্রাণিজ ফ্যাটে কোলেস্টেরল নামে একজাতীয় স্নেহদ্রব্যও থাকে, এবং তা তৈরি হয় যকৃতে। এই কোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন-ডি, যৌন হরমোন, অ্যাড্রিন্যাল হরমোন এবং পিত্তলবণ তৈরি হয়। মস্তিষ্ক আর নার্ভে কোলেস্টেরল থাকতে দেখে অনুমান করা যায়, কোলেস্টেরল আরও বহুবিধ কাজে লাগে যা এখনও আমরা জানি না।

লেসিথিন নামে ফ্যাট জাতীয় আর-একরকম পদার্থ পাওয়া যায় সমস্ত প্রাকৃতিক তেলে, ডিমের কুসুমে, মেটেয় আর ঘিলুতে। কোলিন আর ইনোসিটল নামে দু রকম বি-ভিটামিনের একটা বড়ো উৎস এই লেসিথিন। কোলিন আর অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড পেলে অন্ত্রের দেওয়ালে লেসিথিন তৈরি হতে পারে। লাইনোলিক অ্যাসিড, কোলিন, ইনোসিটল এবং সম্ভবত লেসিথিনেরও অভাবে করোনারি ধমনী রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। কোলেস্টেরলের বড়ো বড়ো কণিকা ধমনীর দেওয়ালে আটকে গিয়ে ক্রমশ পরিমাণে বাড়তে থাকে, তাতে ধমনীর ভিতর অবরোধ সৃষ্টি হয়। ভোজ্য তেল রিফাইন অর্থাৎ পরিশোধন করা হলে কি হাইড্রোজেন-সহযোগে জমানো হলে তাতে লেসিথিন থাকতে পারে না।

ফ্যাট যখন হাইড্রোজেন-সহযোগে জমানো হয় তখন অত্যাবশ্যক ফ্যাটি

অ্যাসিডের শূন্য আংটাগুলিতে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়। ফলে, তার স্বাস্থ্যগঠন-ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এই জাতীয় ফ্যাট ক্যালরি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। এই জাতীয় ফ্যাটের মধ্যে পড়ে বনস্পতি ইত্যাদি জমানো রান্নার তেল, মার্জারিন, এমন কি লার্ডও। লার্ড হল রান্না ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্য উপযোগী করা শুওরের চর্বি।

আধুনিক সভ্যতায় এই ধরনের পরিপৃক্ত, পরিশোধিত ফ্যাটের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ফলে, আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ বহু দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হচ্ছে। হৃদরোগ, মেদবাহুল্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বহুবিধ রোগে অকালে অনেক প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে। অ্যামেরিকার মতো দেশও এখন এই জাতীয় ফ্যাটের ব্যবহার নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, পচা দুর্গন্ধময় ফ্যাট কখনই খাওয়া উচিত নয়। সামান্য পচা ফ্যাট খেলেও শরীরে ভিটামিনের গুরুতর অভাব দেখা দিতে পারে। পচা ফ্যাট খাদ্যেই থাক কি অন্ত্রে অথবা রক্তে, তার দরুন অতি দ্রুত ভিটামিন-ই নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন-এ এবং কে, সেইসঙ্গে বিভিন্ন বি-ভিটামিনও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রত্যেক মানুষেরই ফ্যাট দরকার। কার কতখানি দরকার, নিশ্চয় করে বলা যায় না। দেহের আয়তন, ক্রিয়াকর্ম, আবহাওয়া এবং আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কার কী পরিমাণ ফ্যাট খাওয়া দরকার। শরীরে ফ্যাটের প্রধান কাজ ক্যালরি যোগানো। কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন থেকে ক্যালরির প্রয়োজন যদি অনেকখানি মেটানো যায় তাহলে আনুপাতিক হারে ফ্যাটের চাহিদা কমে। ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ফ্যাটের চাহিদা শীতপ্রধান দেশের তুলনায় অনেক কম। এখানে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে দৈনিক ৫০ থেকে ৬০ গ্রাম ফ্যাটই যথেষ্ট। তবে যাঁরা অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁদের 'হাই-ফ্যাট ডায়েট' দরকার, কারণ তাঁদের ক্যালরির চাহিদা বেশি। তবে আগেই বলেছি, ফ্যাটের পরিবর্তে কার্বোহাইড্রেট দিয়েও সেই চাহিদা মেটানো যেতে পারে। যাঁরা মেদহ্রাসের বাসনায় কিংবা অন্য কোনো কারণে ইচ্ছা করে ফ্যাট বর্জন করেন কি নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা সাবধান—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড তাঁরা পরিহার করে চলেছেন অথবা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খাচ্ছেন।

ফ্যাট সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলা দরকার—পী-নাট বাটার, বনস্পতি-

জাতীয় রান্নার তেল ইত্যাদি যেসব জিনিস হাইড্রোজেন-সহযোগে জমাট বাঁধানো হয় তা সর্বদা পরিহার করে চলবেন ; গোরুর চর্বি, ভেড়ার চর্বি ইত্যাদি কঠিন অর্থাৎ পরিপৃক্ত ফ্যাট বেশি খাবেন না, তার বদলে বরং কম পরিপৃক্ত ফ্যাটযুক্ত মাছ, মুর্গির মাংস প্রভৃতি বেশি করে খাবেন ; নারকেল তেলে রান্না খাবার বিষবৎ পরিত্যাগ করবেন ; প্রত্যহ অন্তত এক থেকে তিন চামচ উদ্ভিজ্জ তেল খাবেন। যে তেলই খান না কেন, তা যেন রিফ্রাইন করা ও হাইড্রোজেন দিয়ে জমানো না হয়। যদি কোনো তেল ঘি চর্বি মাখন বা এই জাতীয় ফ্যাট পচে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধময় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা স্পর্শ পর্যন্ত করবেন না ; কোনো ফ্যাট এমনিতে রেখে দিলে যদি না পচে, বুঝবেন তা পরিশোধিত বা পরিমার্জিত। যতদূর পারেন তা এড়িয়ে চলবেন।

ভারতে কুকিং ফ্যাট বলতে বাদাম তিল সরষে নারকেল সূর্যমুখী সয়াবীন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেল, বনস্পতি জাতীয় জিনিস, ঘি মাখন আর মার্জারিন। ঘি মাখন মার্জারিন সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, তাই নানারকম উদ্ভিজ্জ তেলই ভারতে কুকিং মিডিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তেল ঘি মাখন ইত্যাদি যে মিডিয়মই ব্যবহার করুন না কেন, কোনো কিছু ভাজার সময় তাপমাত্রা ওঠে ১৮০ থেকে ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ভাজার ফলে খাদ্যের ক্যালরিমূল্য অনেক বেড়ে যায়। ১০০ গ্রাম ওজনের একটা সিদ্ধ আলু থেকে মাত্র ৮৭ ক্যালরি পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ ১০০ গ্রাম ওজনের একটা আলু যখন ভাজা হয় তখন তা থেকে দ্বিগুণ ক্যালরি মেলে। ভাজার সময় খাদ্য কী পরিমাণ ফ্যাট শোষণ করবে আর তার দরুন ক্যালরির পরিমাণ কতখানি বাড়বে তা নির্ভর করে কী জাতীয় খাদ্যবস্তু ভাজা হচ্ছে তার উপর, খাদ্যবস্তুর কতখানি জায়গা ফ্যাটের সংস্পর্শে আসছে তার উপর, কীভাবে ভাজা হচ্ছে তার উপর আর কী ধরনের ফ্যাট ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর।

বেগুনের মতো রন্ধ্রবহুল কোনো বস্তু চাক চাক করে কেটে ভাজলে তা এত বেশি তেল টানে যে, ক্যালরিমূল্য শতকরা ৬০% ভাগ ছাড়িয়ে যায়। আবার ডিম ভাজলে তার ক্যালরিমূল্য বাড়ে শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ।

একটা গোটা আলু ভাজলে তার মধ্যে যে পরিমাণ তেল যায় তার চেয়ে অনেক বেশি যায় সেই আলু যখন খণ্ড খণ্ড করে কেটে ভাজা হয়, কারণ তখন আলুর অনেকখানি জায়গায় তেল লাগে।

ডিম আর পাঁউরুটির গুঁড়ো মাখিয়ে কাটলেট অথবা মাছ ভাজলে কম তেল

লাগে। ফলে, ক্যালরির পরিমাণ বেশি বাড়তে পারে না।

কম তাপমাত্রায় ভাজলে অনেক বেশি তেল টানে এবং স্বাদটা তেলতেলে হয়। বেশি তাপমাত্রায় ভাজলে খাদ্যবস্তুর উপর তেলের একটা আস্তরণ পড়ে যায়, তেল বেশি টানতে পারে না।

ভাজা খাবার হজম করা শক্ত। ফ্যাট পাকস্থলীতে হজম হয় না বলে প্রোটিন আর কার্বোহাইড্রেটের পরিপাকে বিলম্ব ঘটে। গুরুতর রকমের অসুখে এবং গ্যাস্ট্রাইটিস, কোলেসিস্টাইটিস, ডিসেন্ট্রি, অ্যাথেরোসক্লেরোসিস প্রভৃতি রোগে ও মেদবাহুল্যে ভাজা খাবার খাওয়া উচিত নয়। মেদ যদি বাড়াতে চান তাহলে মনের সুখে ভাজা খাবার খেতে পারেন।

ষোল : উচ্চারণবিপর্যয়ে ভিটামিন

১৯০৬ সালে ইংল্যাণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত জীব-রসায়নবিদ ফ্রেডরিক গাওল্যাণ্ড হপকিন্স ঘোষণা করেন যে, আমাদের খাদ্যে অজানা এমন একটা কিছু আছে যা স্বাস্থ্য এবং জীবনধারণের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। ১৯১২ সালে তিনি তাঁর ঘোষণা পরীক্ষালব্ধ তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন। কতকগুলি সাদা ইঁদুরশাবককে তিনি শুধু দুধ খাইয়ে দেখেন যে, তারা বেশ ভালোই বাড়ছে ; কিন্তু যখন দুধের ভিতরকার বিশুদ্ধ উপাদানগুলি খাওয়ান তখন দেখা যায়, তাদের যে কেবল বাড়ই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তা-ই নয়, তারা মারাও যাচ্ছে।

কাশিমির ফুঙ্ক নামে একজন পোলিশ রসায়নবিদ ১৯১১ সালে লণ্ডনের লিস্টার ইন্সটিটিউটে কাজ করার সময় জানতে চেষ্টা করেন, তুষের নিচে চালের গায়ে যে আস্তরণ থাকে সেই আস্তরণে অর্থাৎ কুঁড়োয় এমন কী পদার্থ আছে যা বেরিবেরি নাশ করে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেই পদার্থ পৃথক করে তার মোটামুটি রাসায়নিক ধর্মও তিনি নির্ণয় করেন। অনেক পড়াশোনা, চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাঁর ধারণা হয়, কোনো কোনো খাদ্যে যদি একটা বিশেষ পদার্থের অভাব থাকে তাহলে বেরিবেরি, স্কার্ভি ও রিকেট রোগ হতে পারে। সেই বিশেষ পদার্থকে তিনি ১৯১২ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে vitamine (vita+amine) আখ্যা দেন। Vita অর্থাৎ জীবন এবং প্রোটিনের ভগ্নাংশ অ্যামিনো অ্যাসিডের amine নিয়ে vitamine. ইতিপূর্বে হপকিন্স এবং অ্যামেরিকার ওসবোর্ন ও মেণ্ডেল প্রাণিদেহের উপর পরীক্ষায় স্থির করেছিলেন যে, ট্রিপ্টোফেন, লাইসিন, সিষ্টিন, টাইরোসিন প্রভৃতি অ্যামিনো অ্যাসিড জীবনরক্ষায় অপরিহার্য। ফুঙ্ক তাই মনে করলেন, তাঁর আবিষ্কৃত পদার্থে জীবনরক্ষায় অপরিহার্য কোনো-না-কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড আছেই এবং তিনি তার নাম দিলেন vitamine. ১৯২০ সালে বৃটিশ রসায়নবিদ ড্রামণ্ড এই নামটা বজায় রাখলেন বটে, কিন্তু শেষের e অক্ষরটি বাদ দিলেন। শেষে e থাকলে অ্যামিনো অংশযুক্ত জৈব পদার্থ বোঝায়, কিন্তু ভিট্যামিন বলে আবিষ্কৃত পদার্থে ঐ অংশ না পাওয়ায় তিনি vitamin নাম সঙ্গত মনে করলেন। ভিট্যামিন বাংলায় উচ্চারণবিপর্যয়ে ভিটামিন হয়ে গেল।

এযাবৎ প্রায় ১৫ রকমের ভিটামিন স্বাভাবিক খাদ্য থেকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা গেছে—এবং সেগুলি রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করাও সম্ভব হয়েছে। এই ভিটামিনগুলির প্রায় সবই আমাদের দরকার। তবে দেহের পুষ্টির জন্য এ বি সি ডি এবং ই ভিটামিনই বেশি দরকার।

কিছু ভিটামিন ফ্যাটে দ্রবীভূত হয়, আবার কিছু ভিটামিন জলে দ্রবীভূত হয়। ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন হচ্ছে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-ই এবং ভিটামিন-কে। আর জলে দ্রবণীয় ভিটামিন হল ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন-সি এবং ভিটামিন-পি। ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স বলতে প্রধানত ভিটামিন-বি$_১$ বা থায়ামিন, রিবোফ্লেভিন, নায়াসিন ও নায়াসিন্যামাইড, পাইরিডকসিন বা ভিটামিন-বি$_৬$, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ফোলিক অ্যাসিড, বায়োটিন, কোলিন, অ্যামিনো বেনজোয়িক অ্যাসিড, ইনোসিটল এবং ভিটামিন-বি$_{১২}$। ভিটামিন-সি অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড নামেও পরিচিত।

আজ এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, খাদ্য যতই মূল্যবান হোক না কেন, তার মধ্যে যদি ভিটামিন না থাকে তাহলে সে খাদ্য নিষ্প্রাণ। খাদ্যে ভিটামিন না থাকলে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের কোনো কর্মক্ষমতাই থাকে না। ফলে, সেই খাদ্য কোনো কাজেই লাগে না। ভিটামিনহীন খাদ্যকে সেই কারণে চালকহীন শকটের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অথবা, প্রাণহীন পুতুলের সঙ্গে। বাংলায় তাই ভিটামিনকে খাদ্যপ্রাণ বলা হয়।

তবে এই নামকরণে যথেষ্ট বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, ভিটামিন প্রাণ সৃষ্টি করে না, ভিটামিন কোনো খাদ্যের প্রাণস্বরূপও নয়; আবার, ভিটামিনের বিপাক থেকে শক্তির উদ্ভব হয় না, দেহের টিস্যু বা কলা গঠনেও ভিটামিনের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। ভিটামিন আসলে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। শক্তির বিকাশে, এনজাইমকে সক্রিয় করার ব্যাপারে, বিভিন্ন খাদ্যবস্তু ও টিস্যুর বিপাকক্রিয়ায় ভিটামিনের ভূমিকা যাত্রাদলের অধিকারীর মতো।

আজ স্পষ্ট জানা গেছে, প্রোটিন, ফ্যাট, শর্করা প্রভৃতির বিপাকক্রিয়ায় ভিটামিন অত্যন্ত জরুরী এবং শরীরে বিশেষ বিশেষ ভিটামিনের অভাবে নানা রকমের রোগ হতে পারে। সামান্য রোগও হতে পারে, আবার মারাত্মক রোগও হতে পারে।

দেহের সম্যক পুষ্টিসাধনে, প্রজননশক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধিতে, অস্থিগঠনে এবং রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা সৃষ্টিতে ভিটামিনের অশেষ প্রয়োজন। আবার,

স্বাভাবিক পরিপাকশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে, শিশুদের দাঁত ও অস্থির সুগঠনে এবং রোগব্যাধিহীন জীবনলাভেও ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

খাদ্যের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গেই সাধারণত ভিটামিন ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। খাদ্য যদি অত্যধিক রিফাইন করা হয় অর্থাৎ খাদ্যের উপাদান যদি কৃত্রিম উপায়ে অত্যধিক পরিশোধন বা পরিষ্কার করা হয় এবং কোনো কারণে রকমারি খাদ্যের যদি অপ্রতুলতা ঘটে তাহলে ভিটামিনের অভাব হতে পারে। নইলে মানুষ সচরাচর রুচি মেনে যে বিভিন্ন রকমের খাদ্য খেয়ে থাকে তাতে ভিটামিনের বড়ো একটা অভাব হবার কথা নয়।

কোনো কোনো ভিটামিন মেদ ইত্যাদির মতো শরীরে সঞ্চিত হতে পারে এবং কিছুদিন পর্যন্ত খাদ্যে ঐসব ভিটামিন না পেলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, সঞ্চিত ভিটামিনই শরীরযন্ত্রকে চালিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু সঞ্চিত ভিটামিন যখন শেষ হয়ে যায় তখনই ভিটামিনের অভাবজনিত রোগব্যাধি দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, শরীরের বৃদ্ধির সময় এবং পরিশ্রমসাধ্য কাজ করার সময় ভিটামিনের ব্যয় বেশি হয়, সুতরাং বৃদ্ধ এবং অলস-অকর্মণ্য লোকদের চেয়ে অন্তঃসত্ত্বা নারী, শিশু, বালক এবং পরিশ্রমশীল মানুষের পক্ষে ভিটামিনযুক্ত খাদ্য বেশি দরকার।

আমাদের দেহে প্রোটিনের ন্যূনতম চাহিদা দৈনিক ৩০ গ্র্যামের মতো। ভিটামিনের চাহিদা কিন্তু জনে জনে ভিন্ন। কারও দৈনিক কয়েক মিলিগ্র্যাম হলেই চলে যায়, আবার কারও তার চেয়ে কম হলেও আটকায় না। সুতরাং অনেকের মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, প্রোটিনের চাহিদার চেয়ে ভিটামিনের চাহিদা সহজেই মেটে। হয়তো মেটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের শরীরে ভিটামিনের প্রয়োজন যেমন কম তেমনি আমাদের খাদ্যে ভিটামিন থাকেও অল্প।

ভিটামিন সম্পর্কে পৃথিবীর অনেক দেশেই অসম্ভব রকমের একটা উঁচু ধারণা আছে। অনেক ডাক্তার সর্বরোগহর মনে করে গাদা গাদা ভিটামিন লেখেন। আজও বৃটেনে প্রতি বছর কোটি কোটি পাউণ্ড খরচ করা হয় ভিটামিন তৈরিতে, যা টনিক হিসাবে লোকে খায়। কিন্তু কে তাদের বলে দেবে, সুখাদ্য খেলে আলাদা করে ভিটামিন খাওয়ার দরকার করে না এবং অতিরিক্ত ভিটামিনের কোনো টনিক অ্যাকশন নেই?

ভিটামিনকে সর্বরোগহর মনে করে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করলে অনেক সময় শুধু যে ভিটামিনের অপচয় হয় তা-ই নয়, কখনও কখনও সেই ভিটামিনের

দরুন শরীরের ক্ষতিও হতে পারে। ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে অনেকে স্বাস্থ্যলাভের আশায় পুষ্টিকর খাদ্যের পরিবর্তে যথেচ্ছভাবে এবং দীর্ঘদিন ধরে ভিটামিন ট্যাবলেট খান। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, কোনো কোনো ভিটামিন, যেমন ভিটামিন-বি এবং ভিটামিন-সি, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খেলে মলমূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, কিন্তু ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-ডি'র অতিরিক্ত ব্যবহারে যে বিষক্রিয়া হতে পারে তার দৃষ্টান্তও আছে।

ভিটামিনের মতো আর কোনো পুষ্টিদ্রব্য সাধারণ মানুষের এত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। ভিটামিনের প্রতি সাধারণ মানুষের এত বেশি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ বিজ্ঞাপন। এখনও বহু লোক ভিটামিন আর পুষ্টিকে এক করে দেখে। সামান্য পরিমাণ ভিটামিন কীকরে বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট, পেল্যাগ্রা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ নিরাময় করে তা ভেবে তারা অবাক হয়ে যায়।

ভিটামিনের অতিরিক্ত ব্যবহারে বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি লণ্ডনের 'মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড' পত্রিকায় একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, মা-বাবারা তাঁদের সন্তানদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ভিটামিন খাইয়ে বিপদ সৃষ্টি করছেন। তাঁরা আসলে ভিটামিন খাওয়াচ্ছেন না, বিষ খাওয়াচ্ছেন।

নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে, বৃটিশ নারীরা প্রি-মেনস্ট্রুয়াল টেনশন দূর করার জন্য ভিটামিন-বি ফাইরিডকসোজিন খেয়ে থাকেন। অতিমাত্রায় এই জিনিস খেলে হাত-পা'র নার্ভ অসাড় হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ পক্ষাঘাত হতে পারে। অত্যধিক ভিটামিন-সি আর ভিটামিন-ডি কিডনি নষ্ট করে দিতে পারে এবং গল-স্টোন ও অন্যান্য গুরুতর ধরনের বিপত্তি ঘটাতে পারে।

নিবন্ধটিতে চিকিৎসকদের এইরকম হুঁশিয়ারির পরেও ওষুধ কোম্পানিগুলি সমানে কৌশলে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে: শিশুদের বোধশক্তি খাদ্যের উপর নির্ভর করে, খাদ্যে বেশি ভিটামিন থাকা দরকার; তাদের বাড়তি ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে দিলে তাদের **IQ** বাড়বে এবং উগ্রভাব কমবে।

এইরকম সব বিজ্ঞাপনে এমন ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, একটা ট্যাবলেটে যদি অল্প উপকার হয় তাহলে কয়েকটা ট্যাবলেটে নিশ্চয় বেশি উপকার হবে। লোকে বিশ্বাসও করছে: **if one tablet does you good, several tablets will be even better.**

এইরকম বিজ্ঞাপনের পর 'দি কেমিস্ট' নামে একটি বিখ্যাত পত্রিকায় খবর

ছাপা হয়, বৃটেনের বহু শহরে ভিটামিন ট্যাবলেট কেনার ধুম পড়ে গেছে, চাহিদা মেটানোর জন্য একটা নাম-করা কোম্পানিকে বিমানে করে দশ লক্ষ বাড়তি ভিটামিন পিল আনাতে হয়েছে।

ভিটামিন-এ একটা বর্ণহীন পদার্থ। কেবল প্রাণিজ খাদ্যেই তা পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে পাওয়া যায় ভিটামিন-এ তৈরির উপাদান ক্যারোটিন।

উদ্ভিদজগতে ক্যারোটিন নামে হলুদ রঙের এক কঠিন রঞ্জক পদার্থ ভিটামিন-এ'র জনক। প্রাণিদেহে ক্যারোটিন বিশেষ দেখা যায় না। প্রাণিদেহে ক্যারোটিন ভিটামিন-এ'তে রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ সূর্যকিরণের সাহায্যে ক্যারোটিন তৈরি করে। উদ্ভিদভোজী প্রাণী উদ্ভিদ থেকে যতটা ক্যারোটিন পায় তার খানিকটা ভিটামিন-এ'তে পরিণত হয়, বাকিটা ক্যারোটিন হিসাবে যকৃতে সঞ্চিত থাকে যাতে প্রয়োজনের সময় শরীররক্ষার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। মানুষের খাদ্য প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ উভয় প্রকার, ফলে মানুষ প্রাণিজগৎ থেকে একেবারে তৈরি ভিটামিন-এ পায় আর উদ্ভিদজগৎ থেকে পায় ক্যারোটিন এবং সেই ক্যারোটিন থেকে সে নিজের দেহে ভিটামিন-এ তৈরি করে নেয়।

ভিটামিন-এ'র সামান্য অভাবেই দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হয়। ১৯৮৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ভিটামিন-এ'র অভাবের কারণে প্রতি বছর গোটা পৃথিবীতে পাঁচ লক্ষেরও বেশি শিশু অন্ধ হয়ে যায় এবং অন্ধ হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের দুই-তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটে। এছাড়া প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ শিশু মৃদু আকারে ভিটামিন-এ'র অভাবের শিকার হয় এবং তার বড়ো আঘাত এসে পড়ে তাদের চোখে।

১৯৮৫ সালের মে মাসে 'দি রয়্যাল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি ব্লাইণ্ড'-এর প্রোগ্র্যাম ডিরেকটর ডঃ জে ভি ভাট বোম্বাইয়ে ইউ-এন-আই নামে এক সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে বলেন, ভারতে প্রতি ১৩ মিনিটে ৬ বছরের কম বয়সের একজন শিশু অন্ধ হয়ে যায় এবং আর-একজন শিশু আংশিকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারায়। "তা সত্ত্বেও আমরা যে খুব বেশি অন্ধ শিশু দেখতে পাই না তার কারণ প্রতি বছর তাদের শতকরা প্রায় ৭০ জন মারা যায়।"

যে অসুখে তারা অন্ধ হয় তার নাম জেরফথ্যালমিয়া। ভিটামিন-এ'র অভাবের দরুন এই অসুখ হয়। শিশু তার জন্মের পর প্রথম তিনমাস মায়ের

দুধ থেকে তার প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ পেয়ে থাকে। তারপর তাকে প্রত্যহ ৩০ গ্র্যাম ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাদ্য দিতে হয়। তাহলে অন্ধত্বনিবারণ সম্ভব।

অন্ধত্বের সাতটি প্রধান কারণের মধ্যে একটি হল ভিটামিন-এ'র অভাব। ভিটামিন-এ দুর্লভ কিছু না, যেসব খাদ্যে ভিটামিন-এ পাওয়া যায় সেইসব খাদ্য দুর্মূল্যও না। সুতরাং ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত অন্ধত্ব অনেক সহজেই নিবারণ করা যেতে পারে।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এক কোটির উপর অন্ধ আছে এবং তাদের অধিকাংশই অন্ধ হয়েছে পাঁচ বছর বয়সের আগে। পৃথিবীতে যত অন্ধ আছে তার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা যেত একটু সচেতন হলে। ভারতে এখন অন্ধের সংখ্যা ২০ লক্ষের উপর।

আমাদের চোখের মধ্যে 'ভিজ্যুয়াল পার্পল' নামে একপ্রকার পদার্থ তৈরি হয়, তাতে ভিটামিন-এ থাকে। আমরা যখন কোনো বস্তুর দিকে তাকাই তখন সেই বস্তু থেকে আলো ঠিকরে এসে আমাদের চোখে পড়ে, সেই আলো চোখের ভিতরকার ভিজ্যুয়াল পার্পল নামক পদার্থকে অংশত ভেঙে দেয় এবং সেই ভাঙনের ফলে উৎপন্ন পদার্থগুলি নার্ভে স্পন্দন সৃষ্টি করে—আর সেই স্পন্দনই মস্তিষ্ককে বলে দেয়, চোখ কী দেখছে। এইভাবে আমাদের দেখার কারণে অর্থাৎ চোখে আলো প্রবেশের ফলে অবিরাম ভিজ্যুয়াল পার্পল নষ্ট হচ্ছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে ক্ষয়পূরণও হচ্ছে। আবারও ক্ষয় হচ্ছে, আবারও ক্ষয়পূরণ হচ্ছে। এইভাবে চলছে সারা জীবন।

আমরা যতক্ষণ জেগে থাকি, প্রায় ততক্ষণই দেখি। অর্থাৎ, দিনে-রাত্রে সমানে আমাদের দেখার কাজ চলে এবং দিনের দেখা ও রাত্রের দেখা, উভয় দেখাতেই ভিটামিন-এ'র দরকার হয়। শুধু তাই নয়, রাত্রের দেখাটা সম্পূর্ণই ভিটামিন-এ'র উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ভিটামিন-এ'র সামান্য অভাব হলেই প্রথমে রাত্রের দেখায় অসুবিধা হয়। রাত্রে হঠাৎ জোরাল আলোর দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, চোখ বন্ধ করে ফেলতে হয়। জোরাল আলোয় চোখের ভিতরকার ভিটামিন-এ অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। চোখের জলীয় পদার্থে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে তাহলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলেই আমরা আবার আগের মতো দেখতে পাই। কিন্তু যদি এ-ভিটামিনের ঘাটতি থাকে তাহলে খানিকক্ষণ কিছুই দেখতে পাই না। কতক্ষণ, তা নির্ভর করে ঘাটতির পরিমাণের উপর।

ভিটামিন-এ'র অভাব যদি অল্প হয় তাহলে রাত্রে দৃষ্টিক্ষীণতা দেখা দেবে, দিনের বেলায় অবশ্য দেখা যাবে স্পষ্ট, স্বাভাবিক। ভিটামিন-এ'র অভাব কিঞ্চিৎ অধিক হলে চোখের সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি আসবে, দীর্ঘসময় ধরে টেলিভিশন কি সিনেমা দেখার পর যেমন আসে। অভাব যদি আরও বেশি হয় তাহলে চোখে ব্যথা হবে, বিশেষ করে অনেকক্ষণ চোখের কাজ করার পর। তাছাড়া মাথা ধরবে, স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দেবে এবং দেখতে দেখতে চোখ অবসন্ন হয়ে পড়বে। এই ধরনের রাত্রান্ধ লোকেরা উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারেন না, কালো চশমা পরলে তাঁরা অনেক আরাম বোধ করেন।

রাত্রান্ধতা ও মেটের সাহায্যে তা নিরাময় করার কথা (মেটেয় প্রচুর ভিটামিন-এ আছে) খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের মিশরীয় ও চীনা রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমান চিকিৎসকরাও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও রাত্রান্ধতার বহু উল্লেখ আছে।

শরীরে ভিটামিন-এ'র খুব বেশি অভাব হলে চোখ জ্বালা করবে, চোখ চুলকোবে, চোখের পাতা ফুলে উঠবে, গোটা চোখে ব্যথা হবে। চোখের কোণে পিচুটিও জমতে পারে অনেক সময়। চোখের সম্মুখভাগ যার নাম কর্নিয়া বা অচ্ছোদ পটোল তাতে ঘা-ও হতে পারে।

উজ্জ্বল আলোয় চোখের ভিটামিন-এ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। মৃদু আলোয় সম্পূর্ণভাবে ভিটামিন-এ'র উপর নির্ভর করে দেখতে হয় বলে ভিটামিন-এ খরচ হয় বেশি। সেই কারণে মাঝারি আলোই ভালো। যাঁদের প্রখর আলোয় কি মৃদু আলোয় কাজ করতে হয় তাঁদের ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন তাই অপেক্ষাকৃত অধিক। এমন কি, যাঁরা সাদা কাগজে টাইপ করেন তাঁদেরও। কারণ, তাঁদের আলোর ঝলক সহ্য করতে হয় বেশি।

ভিটামিন-এ'র অভাব প্রথমে বিটট্স্ স্পট এবং জেরফথ্যালমিয়া হিসাবে চোখের উপসর্গে ধরা পড়লেও পরিবর্তনটা আগে আসে দেহের চামড়ায়। চামড়ার নিচের দিককার স্তরের কোষ মরে গিয়ে চলটা ওঠার মতো উঠে আসে। মরা কোষ চামড়ার নিচে তেল-ভরা থলি এবং লোমকূপগুলি বন্ধ করে দেয়। ফলে, দেহের ভিতরকার তেল উপরে উঠে আসতে পারে না। তাতে চামড়া শুকিয়ে যায়, খসখসে হয়। অনেক সময় তার দরুন সারা গা চুলকোতে থাকে। চামড়ার খসখসে ভাবটা সাধারণত প্রথমে দেখা দেয় কনুই, হাঁটু, নিতম্ব আর আর বাহুর পিছনদিকে। এটা যদি চলতে থাকে তাহলে ফুসকুড়ি থেকে

কারবাঙ্কল পর্যন্ত বহুতর ব্যাধির সৃষ্টি হতে পারে। এই অস্বাভাবিকতা দূর করা যেতে পারে খাদ্যে ভিটামিন-এ'র পরিমাণ বাড়িয়ে। তবে অন্যসব দিক দিয়েও খাদ্য প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন হওয়া চাই।

ভিটামিন-এ'র অভাবে চুল রুক্ষ হয়, চুলের ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। মাথায় খুসকি জমে, নখে শিরা গজায়, কখনও কখনও গোটা নখই হয়তো উঠে আসে।

আমাদের নাক, সাইনাস, গলা প্রভৃতির অন্তর্দেশে কতকগুলি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পাতলা আস্তরণ থাকে। খাদ্যে ভিটামিন-এ'র অভাব না থাকলে এই ঝিল্লীগুলি থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় একজাতীয় তরল পদার্থ বা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়, যার ফলে কোষের উপর একটা আবরণ পড়ে এবং কোনো ব্যাকটিরিয়া কোষের সংস্পর্শে আসতে পারে না। লক্ষ লক্ষ ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়া আক্রমণের জন্য ছুটে আসে, কিন্তু শ্লেষ্মার আবরণে বাধা পেয়ে থেমে যায় এবং শ্লেষ্মায় ব্যাকটিরিয়া বাঁচতে পারে না বলে তাদের সেখানে অকালমৃত্যু ঘটে। এইভাবে আমরা বহু রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। তাছাড়া শ্লেষ্মায় আমাদের ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির উপরিভাগ আপনা-আপনি পরিষ্কারও হয়ে যায়।

ভিটামিন-এ'র অভাবে নারীদেহে কিছু অতিরিক্ত রোগ হতে পারে। জরায়ু ও যোনিদ্বারের কোষ মরে গিয়ে চলটা ওঠার মতো উঠে আসতে পারে। তার ফলে লিউকোরিয়া অর্থাৎ শ্বেতপ্রদর দেখা দিতে পারে, সঙ্গে প্রচুর ঋতুস্রাব হতে পারে এবং যৌনক্রিয়া যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। দেহের প্রায় যে কোনো অংশে পুঞ্জীভূত মৃত কোষ ঘিরে পূযকোষ সৃষ্টি হতে পারে।

ভিটামিন-এ'র অভাবে নারীর ওভ্যুলেশন অর্থাৎ ডিম্বাণুনির্গমন ব্যাহত হয় বলে নারী সন্তানধারণে অপারগ হয়ে পড়তে পারে।

কেবল স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হওয়া ও রোগপ্রতিরোধক্ষমতা লাভ করার জন্যই যে ভিটামিন-এ'র দরকার তা কিন্তু নয়, হাড় আর দাঁতের এনামেলের বৃদ্ধি, সু-আহারেচ্ছা, স্বাভাবিক পরিপাক, প্রজনন, দুগ্ধক্ষরণ এবং রক্তের শ্বেত ও লোহিত কণিকা গঠনের জন্যও ভিটামিন-এ দরকার।

ভিটামিন-এ তৈরির জন্য যে ক্যারোটিন প্রয়োজন তা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সবুজ শাকপাতায় (পাতা যত পাতলা আর সবুজ হবে তত ভালো)। শিম, গাজর, আলু, রাঙা আলু, পাকা কুমড়ো, পাকা টোম্যাটো, মটরশুঁটি, বাঁধাকপি, লেটুস ইত্যাদিতেও ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন মেটে। হলুদ রঙের প্রায় সমস্ত ফলে ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। এমন কি, টাটকা পাকা লঙ্কাতেও পাওয়া

যায়। যেসব তরিতরকারির আসল রং সবুজ নয় তাতে ভিটামিন-এ থাকে না। বিবর্ণ বাসি তরিতরকারিতেও না।

প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে তৃণভোজী গবাদি পশুর মেটেয় ভিটামিন-এ থাকে প্রচুর, কিডনিতেও থাকে যথেষ্ট, কিন্তু পেশীর মাংসে থাকে না। কড প্রভৃতি মাছের লিভারে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। চাঁই ভেটকি চিতল মৃগেল রুই ইলিশ প্রভৃতি মাছের লিভারের তেলে কড-লিভার অয়েলের চেয়ে অনেক বেশি ভিটামিন-এ থাকে। ছোটো মাছের মধ্যে ট্যাংরা পারসে প্রভৃতি মাছেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। ডিমের কুসুমে এবং মাখনেও পাওয়া যায়। দুধেও যায়।

দুধে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। তৃণভোজী গবাদি পশু তৃণ থেকে ক্যারোটিন সংগ্রহ করে নিজের দেহে ভিটামিন-এ'তে পরিণত করে এবং পরে দুধের সঙ্গে তা আমাদের ঢেলে দেয়। ভিটামিন, প্রোটিন, লবণ—সবদিক থেকেই দুধ অনেকটা 'আদর্শ' খাদ্য। মহাকবি গ্যেটে বলেছেন, 'Milch ist ein ganz besondrer saft' অর্থাৎ 'দুধ প্রকৃতপক্ষেই অমৃতকল্প রস'। আমাদের দেশেও বলা হয়েছে, 'প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ং'।

কিন্তু আধুনিক যুগে দুধ যখন হোমোজেনাইজ অর্থাৎ সমসত্ত্ব করা হয় তখন অকসিজেনের প্রভাবে দুধের অনেকটা ভিটামিন-এ নষ্ট হয়ে যায়।

কোন্ খাদ্যে কতখানি ভিটামিন-এ থাকবে তা অনেকখানি নির্ভর করে তার সংরক্ষণ, হিমায়ন, প্রস্তুতকরণ, পরিবহণ ইত্যাদির উপর। রাসায়নিক সারে যে নাইট্রোজেন থাকে তার দরুন উদ্ভিজ্জ খাদ্যের ক্যারোটিন এবং ভিটামিন-এ নষ্ট হয়ে যায়। এই জাতীয় সারে উৎপন্ন উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে যেসব জীবজন্তু তাদের মাংসেও ক্যারোটিন আর ভিটামিন-এ'র অভাব দেখা যায়।

ক্যারোটিনসমৃদ্ধ শাকসবজি খেলেই যে শরীরে সেই ক্যারোটিন বিশোষিত হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। উদ্ভিজ্জ খাদ্যে ক্যারোটিন থাকে সেল্যু-লোজ দিয়ে তৈরি কোষপ্রাচীরের ভিতর, কিন্তু সেল্যুলোজ মানুষের পাকস্থলীতে পরিপাক হয় না। আবার, ক্যারোটিন জলে দ্রবীভূত হয় না, তাই তা কোষ-প্রাচীর ভেদ করে যেতে পারে না। উদ্ভিজ্জ খাদ্য ভালো করে কেটে, কুচিয়ে, রান্না করে কিংবা চিবিয়ে খেলেই কেবল তার কোষপ্রাচীর থেকে ক্যারোটিন মুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করতে পারে। খাদ্যের আঁশ যত নরম হবে তত বেশি

ক্যারোটিন রক্তে প্রবেশ করবে। রস করে খেলে সবচেয়ে বেশি ক্যারোটিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু খেতে হবে রস করার সঙ্গে সঙ্গে, নইলে বাতাসের অকসিজেনের প্রভাবে ভিটামিনের অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

ভিটামিন-এ আর ক্যারোটিন কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে রক্তে মিশতে পারে না। উভয়েই প্রথমে ক্ষুদ্রান্ত্রে পিত্তলবণের সঙ্গে মেশে। কিন্তু খাদ্যে ফ্যাটের পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে অন্ত্রে অতি সামান্যই পিত্তরস পেঁছয় অথবা মোটেই পেঁছয় না—এবং শতকরা ৯০ ভাগ ভিটামিন-এ আর ক্যারোটিন নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া রক্তে যতখানি ক্যারোটিন পেঁছয় তার সবটাই এ-ভিটামিনে পরিণত হয় না। শরীরে ভিটামিন-ই'র পরিমাণ যদি যথেষ্ট না থাকে তাহলে ভিটামিন-এ রক্তে পেঁছেও নষ্ট হয়ে যায় এবং আগের জমা কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। আবার, শরীরে বি-ভিটামিন কোলিনের পরিমাণ কম থাকলে ভিটামিন-এ সংরক্ষণ করা যায় না।

শরীরে ভিটামিন-এ'র ঘাটতি হলে যেমন বিপদ, আধিক্য ঘটলেও তেমনি সমস্যা। দেখা গেছে, দীর্ঘকাল একটা নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি (প্রত্যহ ৫,০০০ ইউনিটের উপর) ভিটামিন-এ খেলে নানা উপসর্গ সৃষ্টি হতে পারে, যেমন মাথাধরা, চোখে ঝাপসা দেখা, গা চুলকোনি, চুল ওঠা, ঠোঁটে ঘা হওয়া, গাঁটে গাঁটে ব্যথা করা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া ইত্যাদি। তবে কয়েকদিন ভিটামিন-এ বন্ধ করে দিলেই উপসর্গগুলি চলে যায়।

কার কতখানি ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন, সাধারণভাবে বলা যায় না। এক-একজনের এক-একরকম প্রয়োজন। শিশুদের চেয়ে বয়স্কদের প্রয়োজন বেশি, আবার নারীদের চেয়ে পুরুষদের বেশি। বৃদ্ধদের চাহিদাও অল্পবয়সীদের তুলনায় অধিক। আলোর তীব্রতা, চোখের কাজের পরিমাণ, ঋতুর প্রকৃতি ইত্যাদি আরও বহুবিধ কারণের উপর ভিটামিন-এ'র চাহিদা নির্ভর করে। সুতরাং কোনো নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না।

সকল বয়সের লোকেরই ভিটামিন-এ'র প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে শিশু আর প্রসূতির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি।

অন্তঃসত্ত্বা নারীকে বেশি পরিমাণে ভিটামিন-এ দিলেও ভ্রূণের দেহে কিন্তু বেশি সঞ্চিত হয় না। তবে প্রসূতির খাদ্যে ভিটামিন-এ'র পরিমাণ বাড়ালে শিশুর দেহে তা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। গর্ভবতী নারী যদি বহুদিন ভিটামিন-এ থেকে বঞ্চিত থাকেন তাহলে প্রসবের পর পর্যাপ্ত পরিমাণে এই ভিটামিন

দিলেও তাঁর নিজের প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত তাঁর দুধে তা বিশেষ আসতে পারে না। সুতরাং গর্ভাবস্থাতেই প্রয়োজনমতো এই ভিটামিন দেওয়া দরকার।

আজকের দিনে আমাদের প্রায় সকলেরই খাদ্যে বি-ভিটামিনের বড়ো অভাব। কিন্তু ১০০ বছর আগেও এই অভাব ছিল না। তখন অতি দরিদ্র ব্যক্তিও প্রচুর পরিমাণে বি-ভিটামিন পেতেন।

১৮৬২ সালে এমন এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হল যার সাহায্যে প্রায় সমস্ত রকমের দানাশস্য রিফাইন অর্থাৎ বিশোধন করা গেল। আর সেই হল আমাদের কাল। আগে আমাদের প্রায় সমস্ত রকমের খাদ্যে কিছু-না-কিছু বি-ভিটামিন থাকতই, কিন্তু এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর যে-ই খাদ্যশস্য রিফাইন করা হতে লাগল, অমনি আমাদের খাদ্যে বি-ভিটামিনের অভাব দেখা দিল। খাদ্য রিফাইন করার ফলে অধিকাংশ পুষ্টিদ্রব্যই নষ্ট হয়ে যায়। গুড়ে প্রচুর বি-ভিটামিন আছে, কিন্তু এখন সাদা চিনির চল। চিনিতে আসল পুষ্টিদ্রব্য কিছুই নেই। এতে অতি দ্রুত আহারেচ্ছা নষ্ট হয় এবং কতকগুলি বি-ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে যায়। একে এই যন্ত্রসভ্যতার যুগে আমাদের ছোটাছুটি কমে যাওয়ায় এবং বেশির ভাগ লোক বসে কাজ করতে অভ্যস্ত হওয়ায় পিতামহ-প্রপিতামহদের তুলনায় আমাদের আহারের পরিমাণ অনেক কমে গেছে, তার উপর যদি আহারেচ্ছা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে শরীর যে কম পুষ্টিকর পদার্থ পাবে তাতে সন্দেহ নেই।

আজ আমরা, বিশেষ করে শহরের ফ্যাশনদুরস্ত অধিবাসীরা, যেসব খাদ্য খাই তার অধিকাংশই রিফাইন করা—পালিশ-করা সাদা চালের ভাত, সাদা পাঁউরুটি, সাদা চিনি, প্রসেস্‌ড্‌ চীজ, জ্যাম, জেলি, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি। ফলে, আমাদের খাদ্যে বি-ভিটামিনের অভাব থাকেই।

আমাদের শরীরে বি-ভিটামিন কিছু তৈরিও হয় এবং তা তৈরি করে অন্ত্রের ভিতরকার উপকারী ব্যাকটিরিয়া। অন্ত্রের ব্যাকটিরিয়া কতকগুলি বি-ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে তৈরি করতে পারে। সুতরাং অন্ত্রের ভিতর এই ব্যাকটিরিয়া যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, বরং অধিক সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। দেখা গেছে, দুধের শর্করায় এই ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি ঘটে সবচেয়ে বেশি, কিন্তু সঙ্গে কিছু ফ্যাট থাকা চাই। অতএব দুধবর্জিত ও ফ্যাটবর্জিত খাদ্য সুখের খাদ্য নয়।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অরিওমাইসিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিক এবং সালফোনামাইড এই ব্যাকটিরিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে, তাতে অনেক সময় শরীরে অতি দ্রুত বহু বি-ভিটামিনের অভাবের লক্ষণ ফুটে ওঠে। তখন নতুন করে এই ব্যাকটিরিয়া সৃষ্টির জন্য দই জাতীয় খাদ্য খাওয়া দরকার। দই ইত্যাদি গাঁজানো খাদ্যে ব্যাকটিরিয়া তৈরি হয়।

বি-ভিটামিন শরীরের প্রত্যেকটি কোষের পক্ষে সমান প্রয়োজন। শরীরে বি-ভিটামিনের অভাব হলে তার লক্ষণ ফুটে ওঠার অনেক আগেই প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যায়—এবং সে ক্ষতি সারা দেহেই হয়। বয়স্ক মানুষের বেলায় ক্ষতিটা সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে পড়ে এবং অনেক সময় তাদের শরীরের বৃদ্ধি দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, সমস্ত বি-ভিটামিনই খাদ্যে একত্রে থাকে, সুতরাং কারও শরীরে কখনই কোনো বিশেষ একটি বি-ভিটামিনের অভাব হয় না। হলে একসঙ্গে সব ক'টি বি-ভিটামিনেরই অভাব হয়। বি-ভিটামিনের অভাবে প্রথমে পরিবর্তন আসে জিভে। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন—স্বাদগ্রহণের জন্য জিভের উপরিভাগে যে ছোটো ছোটো কুঁড়ি থাকে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এই কুঁড়ি যখন খুব বেশি নষ্ট হয় তখন খাবারের স্বাদ পাওয়া যায় না। অনেক সময় বৃদ্ধরা খেতে বসে অনুযোগ করেন, খাবারে স্বাদ নেই। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তাঁদের শরীরে বি-ভিটামিনের প্রচণ্ড অভাব রয়েছে।

যাঁদের জিভের পরিবর্তন খুব বেশি, দেখা গেছে, তাঁদের পাকস্থলীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয় না এবং পাচক এনজাইম তৈরি হয় স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম। ফলে, তাঁদের হজমের গোলমাল হয়, পেট ফাঁপে এবং পেটে বায়ু হয়।

সমস্ত বি-ভিটামিনই জলে দ্রবীভূত হয়। সেই কারণে কোনো বি-ভিটামিনই দেহে সঞ্চিত থাকে না। প্রতিটি দেহকোষ তার প্রয়োজনীয় বি-ভিটামিন নিয়ে নেবার পর যদি কিছু অবশিষ্ট বা অপ্রয়োজনীয় থাকে তাহলে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

সমস্ত বি-ভিটামিনই একসঙ্গে কাজ করে। আমরা যদি কখনও কোনো একটা বি-ভিটামিন আলাদা করে খাই, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে বাকি সব বি-ভিটামিনের চাহিদা বেড়ে যায়। সেই কারণে একসঙ্গে বহু বি-ভিটামিন গ্রহণের বিধি।

বি-ভিটামিনের সংখ্যা অনেক। বারটি কি তারও বেশি বি-ভিটামিনকে একত্রে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স বলা হয়। এই যে অনেকগুলি বি-ভিটামিন নিয়ে ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, এর কোনোটাই খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া না। বি-গ্রুপের ভিটামিনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে তাই কিছুটা বেশি পরিমাণে খাদ্য খেতে হয়। বি-গ্রুপের কোনো ভিটামিনই ভিটামিন-সি'র মতো নয়—অনেক ফলে প্রচুর ভিটামিন-সি থাকে এবং সেইসব ফল অল্প খেলেই কাজ চলে যায়, যেমন একটা কমলালেবুতেই একদিনের প্রয়োজন মেটে।

ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের তিনটি ভিটামিনকে অ্যান্টি-স্ট্রেস ভিটামিন বলা হয়।

সাধারণ অবস্থায় অ্যান্টি-স্ট্রেস ভিটামিনের বড়ো একটা দরকার হয় না। যে সামান্য একটু দরকার হয় তা শরীরের ভিতরেই তৈরি হতে পারে। যতদূর মনে হয়, অন্ত্রের মধ্যে ব্যাকটিরিয়াই তা তৈরি করে।

সাধারণ অবস্থায় উপযুক্ত খাদ্যের পর অ্যান্টি-স্ট্রেস ভিটামিন দরকার হয় না বটে, কিন্তু শরীরের উপর যদি স্ট্রেস পড়ে তাহলে এই ভিটামিন একান্তভাবেই দরকার হয়।

পরিভাষায় স্ট্রেস অর্থ পীড়ন। শরীরের উপর কোনোকিছুর অতিরিক্ত চাপ পড়লে তাকে স্ট্রেস বা পীড়ন বলা হয়। ওষুধপত্র, রাসায়নিক, রোগসংক্রমণ, শব্দ, অতিরিক্ত শ্রান্তি, মানসিক গোলযোগ, বিরক্তি, ক্ষোভ, ঘৃণা ইত্যাদি শতেক কারণে এই স্ট্রেস সৃষ্টি হতে পারে। তখন শরীরে সব পুষ্টিদ্রব্যই সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। অ্যান্টি-স্ট্রেস ভিটামিনের প্রয়োজন হয় বেশি। যে কোনো প্রাণীর লিভার অর্থাৎ মেটেয় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-স্ট্রেস ভিটামিন থাকে। কিডনি, সয়াবীন ইত্যাদিতেও থাকে কিছু। এই ভিটামিন কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করা যায় না, সুতরাং তা ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসিউলের আকারে বাজারে পাওয়া সম্ভব নয়। এই ভিটামিন সম্বন্ধে আজও বিশেষ গবেষণা হয় নি।

আরও কতকগুলি বি-ভিটামিন সম্বন্ধে তেমন গবেষণা হয় নি। এইসব ভিটামিন খাদ্যে কীভাবে থাকে এবং শরীরে তার প্রয়োজন কতখানি তা এখনও রহস্যাবৃত। শরীরে এইসব ভিটামিনের যদি অভাব হয়, সহজে ধরা পড়ে না।

বায়োটিন এইরকম একটি বি-ভিটামিন। বায়োটিন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ঈস্টে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহে বায়োটিনের অভাব হলে একজিমা অর্থাৎ চর্মরোগ হয়, লোম ঝরে যায়, হৃৎপিণ্ডে গোলযোগ দেখা

দেয়, ফুসফুসও আক্রান্ত হয়। অল্পবয়স্ক প্রাণীর বাড় দারুণভাবে ব্যাহত হয়, বয়স্ক প্রাণী রোগা হয়ে যায়—এবং উভয় ক্ষেত্রেই মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়ে পড়ে।

প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অ্যাসিডকে একটি অতি প্রয়োজনীয় বি-ভিটামিন বলা হয় এবং এই ভিটামিন প্রথমে **anti-gray-hair vitamin** অর্থাৎ চুল-পাকা-বন্ধ-করার ভিটামিন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ, এই ভিটামিনের অভাবে কালো রঙের প্রাণীর গায়ের লোম সাদা হয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের চুল-পাকা বন্ধে কিংবা পাকা চুল কাঁচা করায় এই ভিটামিনের কোনো ভূমিকা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অ্যাসিডকে ভিটামিন হিসাবেই গণ্য করতে চান না, কারণ তার আবশ্যকতা কেবল অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, উচ্চতর প্রাণীর খাদ্যে এই পদার্থের প্রয়োজন দেখা যায় না।

ইনোসিটল আর-একটি বি-ভিটামিন। ফল মাংস মেটে দুধ বাদাম তরি-তরকারি গোটাদানা (বিশেষ করে, গম আর ভুট্টা) ঈস্ট ব্যাকটিরিয়া এবং অপরি-শোধিত গুড়ে এই ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, এই ভিটামিনের অভাবে চুল পড়ে যায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, একজিমা হয় এবং চোখে গণ্ডগোল ঘটে। পুরুষের মাথায় টাক পড়ার একটা কারণ হয়তো ইনোসিটলের অভাব। অ্যাডেল ডেভিস একসময় বেশকিছু টাক-মাথা পুরুষকে অন্যান্য বি-ভিটামিনে সমৃদ্ধ খাদ্যের সঙ্গে ইনোসিটল খেতে দেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাদের চুল-ওঠা বন্ধ হয়েছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায়, নতুন চুল গজিয়েছে।

কিন্তু শারীরবিজ্ঞানীরা বলেন, ইনোসিটলের অভাবে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় বলে জানা যায় না এবং মানুষের পুষ্টি ও বিপাকের ক্ষেত্রে ইনোসিটলের কোনো ভূমিকা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে না।

রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে ইনোসিটলের একটা ভূমিকা আছে দেখা গেছে।

কোলিনও একটা বি-ভিটামিন এবং লেসিথিন তৈরিতে তার সমধিক প্রয়োজন। লেসিথিন একটা ফ্যাটজাতীয় পদার্থ। আমাদের খাদ্যে যদি কোনোরকম ঘাটতি না থাকে তাহলে যকৃৎ অনায়াসেই পর্যাপ্ত পরিমাণে লেসিথিন তৈরি করতে পারে। লেসিথিনই কোলেস্টেরল-কণিকাকে ক্ষুদ্রাকারে রাখে। নার্ভকে রক্ষা করার জন্য বর্ম হিসাবে যে আবরণ থাকে তার অনেকটাই

লেসিথিন দিয়ে তৈরি এবং এই বর্ম নষ্ট হয়ে গেলে মাল্টিপ্‌ল্‌ স্ক্লেরোসিস রোগ হতে পারে। আবার, সমস্ত কোষেরই ঝিল্লীর একটা অপরিহার্য উপাদান লেসিথিন। ফ্যাট আর ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন-এ, ডি, ই এবং কে'র পরিপাক, পরিশোষণ ও রক্তে পরিবহণের জন্যও লেসিথিন দরকার। দেহকোষে ফ্যাট যাতে ঠিকমতো ব্যবহৃত হতে পারে তার জন্যও লেসিথিন প্রয়োজন। সুতরাং লেসিথিনের অংশ হিসাবে কোলিনের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

জীবজন্তুর উপর পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোলিনের অভাবে কিডনি এমন নষ্ট হয়ে যায় যে, কিডনিতে রক্তক্ষরণজনিত রোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, প্রস্রাবের সঙ্গে অ্যালবিউমিন আর রক্ত বার হয়, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। তাদের খাদ্যে এই ভিটামিনের অভাব থাকলে পাকস্থলীতে আলসার অর্থাৎ ঘা হয়, যকৃতে ক্যান্সার হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীতে আর অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থিতে রক্তক্ষরণ হয়।

আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে অর্থাৎ নিউক্লিয়সে নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে এবং ডি-এন-এ ও আর-এন-এ তৈরিতে কোলিনের প্রয়োজন খুব।

কোলিন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ঘিলু, মেটে, কিডনি, ডিমের কুসুম, ঈস্ট আর গমের অঙ্কুরে। আমাদের খাদ্যে কোলিনের ঘাটতি থাকলে পর্যাপ্ত পরিমাণে লেসিথিন তৈরি হতে পারে না, ফলে ধমনীতে কোলেস্টেরল জমে ধমনীর ভিতর রক্তচলাচলে বাধা সৃষ্টি করে এবং তার পরিণাম হয় মারাত্মক। সুতরাং খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে এই ভিটামিন থাকতেই হবে। সাধারণ তাপমাত্রায় জমে থাকে এমনসব ফ্যাট—যেমন ঘি মাখন চর্বি বনস্পতি নারকেল-তেল ইত্যাদি যদি পরিহার করে চলা যায় তাহলে শরীরে কোলিনের প্রয়োজন কম হয়, ফলে রক্তে অপ্রয়োজনীয় কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হতে পারে না। আবার, লেসিথিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টিদ্রব্যের সঙ্গে অধিক কোলিন সমন্বিত খাদ্য খেয়েও রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমানো যায়।

অধিকাংশ বি-ভিটামিনই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় মেটে, ঈস্ট, চালের কুঁড়ো প্রভৃতিতে। তবে ভিটামিন-বি$_{১২}$ পাওয়া যায় কেবল প্রাণিজ খাদ্যে—যেমন দুধ ডিম চীজ এবং প্রায় সমস্ত রকম মাংসে। এই ভিটামিনের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস মেটে।

শরীরে বি-ভিটামিনের অভাব হলে এবং সেই অভাব দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে মুখে আর জিভে ঘা, নিউরাইটিস, ঋতুস্রাবে গোলযোগ, গা থেকে এক-

জাতীয় কটু গন্ধ, পিঠে ব্যথা, হাঁটতে গেলে কষ্ট—এই ধরনের নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণত নিরামিষাশীরাই এইসব উপসর্গের শিকার হয়ে থাকেন। সেই কারণে নিরামিষাশীদের বেশ কিছুটা করে দুধ খাওয়া দরকার।

খাদ্যে ভিটামিন-বি১২য়ের অভাব থাকলে অ্যানিমিয়া অর্থাৎ রক্তাল্পতা দেখা দেয়। ভিটামিন-বি১২ এবং ফোলিক অ্যাসিড নামে আর-একটি বি-ভিটামিনের অভাবে মারাত্মক ধরনের অ্যানিমিয়া হতে পারে। মেটে, বাদামজাতীয় ফল, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদিতে প্রচুর ফোলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যাসিড সমন্বিত কোনো খাদ্যসামগ্রী উত্তপ্ত করা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ফোলিক অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায়। আবার, সিদ্ধ করার পর জল যদি ফেলে দেওয়া হয় তাহলেও ঐ ফোলিক অ্যাসিড জলের সঙ্গে চলে যায়, যেমন যায় অন্য সমস্ত বি-ভিটামিন। সেই কারণে সিদ্ধ করার পর সেই জল দিয়েই রান্না করা উচিত।

দেহের সমস্ত কোষের বিভাজনের জন্য ফোলিক অ্যাসিডের একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ডি-এন-এ আর আর-এন-এ তৈরির জন্যও ভিটামিন-বি১২ আর ফোলিক অ্যাসিড দরকার। এই ডি-এন-এ আর আর-এন-এ'র মধ্যেই আমাদের বংশগতির সমস্ত রহস্য নিহিত থাকে, তারাই বংশগতির ছাঁচ বহন করে। ফোলিক অ্যাসিড ছাড়া শরীরের কোনোকিছুরই বৃদ্ধি সম্ভব নয়—চুলেরও না, নখরেও না, এমন কি খালি-চোখে-অদৃশ্য শুক্রকীটেরও না। ফোলিক অ্যাসিড না হলে কোনো ক্ষতও সারতে পারে না। আমাদের দেহকোষে বহু এনজাইম আছে, শর্করা আর অ্যামিনো অ্যাসিডের সদ্ব্যবহারে এবং রোগসংক্রমণ-প্রতিরোধে অ্যান্টিবডি তৈরিতে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু ঐসব এনজাইমের একটা অংশ ফোলিক অ্যাসিড। সুতরাং আমাদের শরীরে ফোলিক অ্যাসিড অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমাদের শরীরে ফোলিক অ্যাসিডের খুব বেশি অভাব হলে সাঙ্ঘাতিক ধরনের রক্তাল্পতা দেখা দেয়, একটুতেই ক্লান্ত লাগে, শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়, মাথা ঝিম ঝিম করে, মানসিক অবসাদ আসে, শ্বাসকষ্টও হয় কিছু, চামড়ার রঙেও পরিবর্তন ফুটে ওঠে। ফোলিক অ্যাসিডের অভাব বেশি দেখা যায় গর্ভাবস্থায়, তখন অনেক সময় অবস্থা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে—রক্তপাত হতে পারে, গর্ভপাত হতে পারে, সন্তানের অকাল জন্ম হতে পারে, প্রসবের পরে সন্তান রক্তাল্পরোগে ভুগতে পারে, এমন কি সন্তান মারাও যেতে পারে। সুতরাং গর্ভাবস্থায় ফোলিক অ্যাসিডের কোনোরকম অভাব যাতে না হয় তা দেখা

একান্ত প্রয়োজন। আবার, যাঁরা গর্ভনিরোধক পিল খান তাঁদেরও ফোলিক অ্যাসিডের প্রয়োজন বেশি। তাঁদের বেশি করে ফোলিক অ্যাসিড সমন্বিত খাদ্য খাওয়া দরকার।

প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড আর-একটা বি-ভিটামিন। দেহের প্রতিটি কোষে এই ভিটামিন দরকার। এই ভিটামিন ছাড়া শর্করা আর ফ্যাট শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। শরীরে প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের অভাব হলে বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি এবং তার ফলে কর্টিসোন ও অন্যান্য হরমোন তৈরি হতে পারে না। আমরা যখন অসুস্থ হই কি আমাদের যখন চোট লাগে অথবা অস্ত্রোপচার হয় কিংবা মানসিক বিপর্যয় ঘটে বা অন্য কোনো প্রকারে আমরা আহত হই তখন এইসব হরমোন বেশি পরিমাণে দরকার হয় এবং তা তৈরি করতে বেশি পরিমাণে প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের প্রয়োজন হয় বলে প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের চাহিদা আনুপাতিক হারে বেড়ে যায়।

তবে মানুষের শরীরে কদাচিৎ প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের অভাব দেখা যায়।

শরীরে প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের দৈনিক চাহিদা কখনও স্থির থাকে না, শরীরের উপর কী ধরনের পীড়ন পড়ে এবং কী পরিমাণে পড়ে তার উপর নির্ভর করে চাহিদার হেরফের হয়।

পাইরিডকসিন কিংবা পাইরিডকসিন হাইড্রোক্লোরাইড অথবা ভিটামিন-বি$_৬$ নামে আর-একটি বি-ভিটামিন আছে। মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়ার জন্য এই ভিটামিন প্রয়োজন। রক্তে এবং টিস্যুতে ম্যাগনেসিয়মের মাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখার জন্যও এই ভিটামিন খুব প্রয়োজন। আবার, ভিটামিন-বি$_৬$ সমন্বিত বহু এনজাইমকে সক্রিয় করে তোলার জন্য ম্যাগনেসিয়ম দরকার। ভিটামিন-বি$_৬$ আর ম্যাগনেসিয়ম শরীরে একত্রে কাজ করে, একটাকে বাদ দিলে আর-একটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের খাদ্যে ভিটামিন-বি$_৬$ আর ম্যাগনেসিয়ম দুই-ই একই সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা দরকার।

অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, লাইনোলিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন থেকে প্রাপ্ত বহু অ্যামিনো অ্যাসিড শরীর গ্রহণ করার আগেই শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-বি$_৬$ থাকা দরকার। এই ভিটামিন ছাড়া টিস্যু তৈরি হতে পারে না, লেসিথিন-সংশ্লেষণ সম্ভব হয় না এবং রক্তের কোলেস্টেরল স্বাভাবিক মাত্রায় রাখা যায় না। শরীরে এই ভিটামিন কম হয়ে গেলে ট্রিপ্টোফেন নামে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ঠিকমতো কাজে লাগে না।

গর্ভাবস্থায় ভিটামিন-বি$_৬$য়ের প্রয়োজন অনেক বেড়ে যায়। বমি-বমি ভাব, বমি, মাথাধরা, ভয়-ভয় করা, পায়ে খিঁচুনি, রক্তাল্পতা প্রভৃতি যেসব সাধারণ উপসর্গ গর্ভাবস্থায় সৃষ্টি হয়, ভিটামিন-বি$_৬$ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে তার উপশম হতে দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, গর্ভাবস্থায় বমি-বমি ভাব এবং বমির উপসর্গে ভিটামিন-বি$_৬$ দিয়ে যে ফল পাওয়া যায় তা অনেকটাই হয়তো মানসিক কারণে।

যাঁরা গর্ভনিরোধক বড়ি খান তাঁদেরও ভিটামিন-বি$_৬$য়ের প্রয়োজন বেশি।

ভিটামিন-বি$_৬$ নানাভাবে শরীর রক্ষাও করে। প্রতিদিন কার কতখানি ভিটামিন-বি$_৬$ দরকার তা নির্ভর করে তিনি কতখানি প্রোটিন, ফ্যাট এবং বিশেষ করে অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড খান তার উপর।

ভিটামিন-বি$_৬$ পাওয়া যায় ঈস্ট, কালো গুড়, গমের কুঁড়ো, মেটে, কিডনি ইত্যাদিতে। রান্নায় এই ভিটামিন অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। অনেকদিন ধরে সংরক্ষিত খাদ্যে, প্রসেস করে কৌটোয় রাখা খাদ্যে এবং বেশি আলোর সংস্পর্শে আসা খাদ্যে এই ভিটামিন বেশি থাকতে পারে না।

নায়াসিন বা নায়াসিন অ্যামাইড আর-একটি বি-ভিটামিন। ঈস্ট, মেটে, গমের অঙ্কুর, কিডনি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। মাছ, পেশীর মাংস, ডিম আর বাদামজাতীয় ফলেও কিছু পাওয়া যায়। এইসব খাদ্য ছাড়া অন্যত্র নায়াসিন দুর্লভ। খাদ্যে প্রোটিন এবং ভিটামিন-বি$_১$, বি$_২$ আর বি$_৬$ যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তাহলে ট্রিপ্টোফেন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের সাহায্যে শরীরে অতি অল্প মাত্রায় নায়াসিন তৈরি হতে পারে। দুধে নায়াসিন প্রায় মোটেই থাকে না। সেই কারণে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের শরীরে নায়াসিনের অভাব বেশি দেখা যায় এবং তারা প্রায়ই ভয়ানক রকমের পেটের অসুখে ভোগে বলে একটা ধারণা আছে। ধারণাটা ঠিক নয়। দুধে নায়াসিন না থাকার জন্য দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দেহে নায়াসিনের অভাব হবার কথা নয়। কারণ, দুধের মধ্যে ট্রিপ্টোফেন নামে যে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে তা থেকে নায়াসিন তৈরি হয়। নায়াসিনের অভাবে যে পেল্যাগ্রা রোগ হয় তা নিরাময়ের জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

শরীরে নায়াসিনের অল্প অভাব হলে সাধারণত জিভে ময়লার একটা প্রলেপ পড়ে। আসলে ওটা ময়লা নয়, ব্যাকটিরিয়ার আস্তরণ। এই ব্যাকটিরিয়ার জন্যই মুখে দুর্গন্ধ হয়, ছোটো ছোটো ঘা হয়। এই রোগে আক্রান্ত লোকেদের মেজাজ

হয় খিটখিটে, একটুতেই তারা বিরক্ত হয়ে ওঠে। তাদের মাথা ঝিমঝিম করে, মাঝে মাঝে মাথাব্যথা করে, রাত্রে ঘুম হয় না, স্মরণশক্তি কমে যায়। অনেক সময় দেহের চামড়া শুকিয়ে যায়, খসখসে হয়। সেইসঙ্গে রক্তাল্পতা ও হজমের গণ্ডগোলও দেখা দেয়। পাকস্থলীতে তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে এনজাইম, পাচক-রস আর অ্যাসিড তৈরি হয় না বলে খাদ্য ঠিকমতো হজম হতে পারে না। কোষ্ঠ-কাঠিন্য আর উদরাময় প্রথমে পালা করে আসে ; পরে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, কিন্তু উদরাময় থেকে যায়।

নায়াসিনের অভাব যদি চলতেই থাকে তাহলে অবস্থা একসময় প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে মানসিক জড়তা সৃষ্টি করতে পারে এবং আক্রান্ত মানুষ অনেক সময় হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। কখনও কখনও রোগী সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়েও যেতে পারে। আজকের এই যন্ত্রসভ্য সমাজে যত রকমের অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়—আত্মহত্যা আর পরহত্যাও—তার অধিকাংশের মূলে আছে স্কিটসোফ্রিনিয়া নামক উন্মাদরোগ এবং অনুসন্ধান করলে হয়তো দেখা যাবে, এই রোগের অন্যতম প্রধান কারণ খাদ্যে নায়াসিনের অভাব। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা এখন বলতে শুরু করেছেন, "It will someday be recognised that our disgraceful crime rate, our tremendous loss from suicides, and our millions of alcoholics are in part brought on by food industries which, ignoring health, flood the market with over-refined and overprocessed products designed merely to make money."

ক্রাইমের একটা বড়ো কারণ মদ্যপান। স্বাস্থ্যহানিরও একটা কারণ মদ্যপান। মদ্যপানে একবার অভ্যস্ত হলে ছাড়া কঠিন। কিন্তু বি-ভিটামিনের সাহায্যে অনেকসময় কিছু সুফল পাওয়া যায়।

যাঁরা অত্যধিক মদ্যপান করেন তাঁদের অনেকরকম পুষ্টির অভাব থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করতে নায়াসিন অ্যামাইডের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সুতরাং যথোপযুক্ত খাদ্যের সাহায্যে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে মদ্যপান নিরোধ করা যেতে পারে। যাঁরা অত্যধিক মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং অত্যধিক মদ্যপানের জন্য ভিতর থেকে একটা তাড়না অনুভব করেন তাঁদের যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বি-ভিটামিন, বিশেষ করে নায়াসিন অ্যামাইড দিয়ে সেইসঙ্গে সহানুভূতিসূচক কথা বলে চিকিৎসা করা যায় তাহলে

তাঁদের মন্থাকাঙ্ক্ষা কমে যেতে পারে।

ভিটামিন-বি$_2$য়ের অপর নাম রিবোফ্লেবিন। শরীরে এই ভিটামিনের অভাব ঘটলে সাধারণত ঠোঁটেই প্রথম উপসর্গ ফুটে ওঠে। নিচের ঠোঁটে লম্বা লম্বা দাগ দেখা দেয়, মনে হয় কুঁচকে গেছে। পরে এই দাগ মিলিয়ে গিয়ে ঠোঁটটা এবড়োখেবড়ো আর খসখসে হয়ে ওঠে, মনে হয় ফাট ধরেছে। যখন তখন ঠোঁটের চামড়া উঠে আসে। ঠোঁটের পরে পরিবর্তন আসে জিভে। জিভের রং হয় টকটকে লাল কিংবা রক্তবেগুনী। স্বাদগ্রহণের জন্য জিভের উপর যেসব ছোটো ছোটো কুঁড়ি আছে, ইংরেজীতে যাকে টেস্ট বাড বলে, বাংলায় যাকে স্বাদকুঁড়ি বলা যেতে পারে—তার মধ্যে রক্ত জমে যায় বলে জিভ লাল দেখায়।

ভিটামিন-বি$_2$য়ের ঘাটতি যখন খুব বেশি হয় তখন মুখের দুই কোণ ফেটে যায় এবং সেই ফাটা সহজে সারে না। যদিও-বা সারে, আবার ফেটে যায় এবং বার বার এইরকম হয়। ফাটা জায়গা থেকে রক্ত বার না হলেও বেশ যন্ত্রণা হয়। ফাটা অংশ অনেকসময় ভিতরে-বাইরে অনেক বড়ো দেখায়, চোখে লাগে।

ঘাটতি যদি অল্প হয় এবং অনেকদিনের হয় তাহলে অনেকসময় মুখের কোণে ফাট সৃষ্টি হয় না, পরিবর্তে উপরের ঠোঁট ক্রমশ ছোটো হয়ে যেতে থাকে। বহুক্ষেত্রে উপরের ঠোঁট একেবারে মিলিয়েও যায়।

ভিটামিন-বি$_2$য়ের অভাব হলে প্রথম উপসর্গ, চোখে বেশি আলো সহ্য হয় না, কালো চশমা পরলে আরাম বোধ হয়। খাদ্যে ভিটামিন-এ আর ভিটামিন-ই যদি ঠিক থাকে তাহলে দৃষ্টিশক্তির হেরফের হয় না, তবে মৃদু আলোয় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। বেশি আলোয় কষ্ট হলেও বেশি আলো ছাড়া কাজ করতে অসুবিধা হয়, বিশেষ করে লেখাপড়ার কাজ।

অভাব আরও বেশি হলে এবং প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে চোখ দিয়ে জল ঝরে, চোখের পাতা চুলকোয়, আবার চোখ জ্বালাও করে। কখনও কখনও মনে হয়, চোখে বালি ঢুকেছে। চোখে অত্যধিক চাপ পড়লে চোখ রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। গালের চামড়াতেও কখনও কখনও লাল লাল দাগ দেখা দেয়।

চোখের দৃষ্টিশক্তির উপর খাদ্যের একটা বিরাট প্রভাব আছে, তাতে ভিটামিন-বি$_2$য়ের ভূমিকা সংশয়াতীতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভিটামিন-বি$_2$ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় মেটেয়, তারপর ঈস্টে। কিন্তু এই দুই খাদ্যই দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য। প্রাণিদেহের কিডনি, ডিমের কুসুম, ছানার

জল আর দুধেও প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। এসবও কিছু সাধারণ মানুষের আওতার মধ্যে নেই। সাধারণ মানুষের মোটামুটি আওতার মধ্যে যেসব খাদ্যে ভিটামিন-বি$_{২}$ পাওয়া যায় তা হল বাঁধাকপি, পালংশাক, পোস্তদানা, মটর মুসুর মুগ প্রভৃতি ডাল, শাঁখ আলু, বেগুন ইত্যাদি। শাকপাতায় এই ভিটামিন পাওয়া যায়, কিন্তু শাকপাতা রান্না করে না খেলে তার ভিতরকার ভিটামিন পরিশোষিত হতে পারে না। কৃত্রিম উপায়েও এই ভিটামিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যেমন হয়েছে ভিটামিন-বি$_{১}$ এবং নায়াসিন।

প্রাণীরা উদ্ভিদজগৎ থেকে ভিটামিন-বি$_{২}$ সংগ্রহ করে। দুধের ভিটামিন-বি$_{২}$ আসলে ঘাস থেকেই আসে।

সমস্ত বি-ভিটামিন একসঙ্গে খাওয়া উচিত। যদি মাত্র একটা কি দুটো-চারটে বি-ভিটামিন আলাদা করে খাওয়া হয় তাহলে না-খাওয়া বি-ভিটামিনগুলির চাহিদা বেড়ে যায়। তখন খাওয়া বি-ভিটামিনগুলির দরুন যে উপকার হয় তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হয় না-খাওয়া বি-ভিটামিনগুলির জন্য।

'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী' বলে একটা কথা আছে, বি-ভিটামিনের বেলায় কথাটা বেশি করে মনে রাখা দরকার। পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-বি$_{১}$ খেলে শরীরের ভিতর শক্তি উৎপন্ন হয়, শরীরের ক্লান্তি শ্রান্তি অবসাদ কেটে গিয়ে শরীর ঝরঝরে লাগে। কিন্তু পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি। তখন এমনসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে যার প্রতিকার খুব একটা সুসাধ্য নয়। সুতরাং শরীরে শক্তি পাবার জন্য নিয়মিত যাঁরা ভিটামিন-বি$_{১}$ ট্যাবলেট খান তাঁরা একটু সমঝে চলবেন। তাঁরা মনে রাখবেন, শরীরে কোনো ভিটামিনের অভাব হলে খাদ্যে সেই ভিটামিন যোগ করে ত্বরিত ফল পাওয়া যায়, কিন্তু দেহকোষের যতখানি ভিটামিন প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি খেলে ফল মেলে না। তখন অন্যান্য যেসব বি-ভিটামিন পরিমাণে কম খাওয়া হয়েছে তার ঘাটতি বেড়ে যায়।

ভিটামিন-বি$_{১}$ থায়ামিন নামেও পরিচিত। এই ভিটামিন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় গমের অঙ্কুরে আর চালের কুঁড়োয়। অঙ্কুর গজানোর আগে বীজের এই ভিটামিন দরকার হয়, সুতরাং সমস্ত দানাশস্যে, বাদামজাতীয় ফলে, শিমে, মটরশুঁটিতে, সয়াবীনে ও ডালে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন-বি$_{১}$য়ের অভাবে অত্যন্ত কষ্টদায়ক সব উপসর্গ দেখা দিলেও তার কাজ, এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, মাত্র একটি। একটা এনজাইমের অংশ

হিসাবে এই ভিটামিন গ্লুকোজকে শক্তি কিংবা ফ্যাটে পরিবর্তিত করে। শক্তি উৎপাদনের জন্য শর্করা যখন ভাঙে তখন পাইরুভিক অ্যাসিড আর ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। ভিটামিন-বি১ আছে যেসব এনজাইমে সেইসব এনজাইমের সাহায্যে পাইরুভিক অ্যাসিড সঙ্গে সঙ্গে আবার ভেঙে গিয়ে কার্বন ডাই-অকসাইড ও জল তৈরি হয় আর ল্যাকটিক অ্যাসিড পরিণত হয় গ্লাইকোজেনে। এখন, শরীর যদি এই ভিটামিন কম পরিমাণে পায় তাহলে এইসব পরিবর্তন হতে পারে না, ফলে টিস্যুতে ঐ অ্যাসিড দুটি থেকে যায়—এবং ক্রমশ জমতে থাকে, বিশেষ করে মস্তিষ্কে, নার্ভে, হৃৎপিণ্ডে এবং রক্তে। শেষপর্যন্ত অবশ্য প্রস্রাবের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায়। যা-ই হোক, শর্করা থেকে শক্তি উৎপাদন মন্থর হয়ে যায়। তখন যে শক্তি পাওয়া যায় তা কেবল অর্ধদগ্ধ শর্করা থেকে কিংবা ফ্যাট থেকে। টিস্যুতে যে অ্যাসিড জমে থাকে তার দরুন টিস্যু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আবার, কেবল ফ্যাট থেকে ঠিকমতো শক্তি উৎপন্ন হতে পারে না বলে সারা শরীরে একটা শ্রান্তি, একটা অবসাদ, একটা আলস্য দেখা দেয়। এই সময় যদি ভিটামিন-বি১ খাওয়া যায় তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়।

ভিটামিন-বি১য়ের অভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বই বদলে যায় এবং মানসিক অবসাদ, চিন্তার গোলমাল, বিস্মরণ ইত্যাদি নানাবিধ উপসর্গ দেখা দেয়। তার কারণ কিন্তু দুটি। প্রথম, মস্তিষ্কের কোষ কেবল শর্করা থেকেই শক্তি আহরণ করে, কিন্তু এই ভিটামিনের অভাবে গ্লুকোজ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। দ্বিতীয়, মস্তিষ্কের কোষে যে পাইরুভিক অ্যাসিড ও ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হয় তা কিছুটা বিষবৎ।

ভিটামিন-বি১য়ের অভাবে নানাভাবে হজমের গোলমাল হয়। তখন ঠিকমতো শক্তি উৎপন্ন না হওয়ায় পাকস্থলী এবং আন্ত্রিক প্রাচীরের মাংসপেশীর সঙ্কোচন শ্লথ হয়ে যায়, পাচক-রস আর এনজাইমের সঙ্গে খাদ্য ভালোভাবে মিশতে পারে না এবং যে খাদ্য ইতিপূর্বে হজম হয়েছে তা পরিশোষক স্তরের কাছে আসতে পারে না বলে রক্তে মেশার সুযোগ পায় না। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের আংশিক অথবা পূর্ণ অভাবের দরুন বেশ কতকগুলি ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়, প্রোটিন পরিপাক হয় অসম্পূর্ণভাবে এবং বহু খনিজ পদার্থ থেকে যায় অদ্রবীভূত। ফলে, পেটে গ্যাস হয়, পেট ফাঁপে। তখনও খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন না হলে গুরুতর সব উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

শরীরে শক্তির উৎপাদন ব্যাহত হলে বৃহদন্ত্রের প্রাচীরের সঙ্কোচনক্ষমতাও কমে যায়, ফলে যতক্ষণ সেখানে মল থাকার কথা তার চেয়ে বেশি সময় থাকে। বৃহদন্ত্রের কাজ হচ্ছে, রক্তে জল শোষণ করে জলের অপচয় কমানো। এখন, মল যদি বেশিক্ষণ থাকে তাহলে জলের অভাবে তা শুকিয়ে যাবে—এবং যত বেশি সময় থাকবে তত বেশি শুকোবে ও শক্ত হবে। এই অবস্থাকেই বলে কোষ্ঠকাঠিন্য। বি-ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য খেয়ে কোষ্ঠকাঠিন্যের কবল থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শরীরে যদি প্রয়োজনমতো শক্তি উৎপন্ন হয় তাহলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

ভিটামিন-বি$_1$য়ের অভাবে শর্করার দহন ঠিকমতো হয় না। ফলে, হৃৎপিণ্ডেও গোলযোগ দেখা দেয়। হৃৎপিণ্ড এমন একটা দেহযন্ত্র যাকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমানে কাজ করে যেতে হয়। সুতরাং তাকে সুস্থ রাখা একান্তই দরকার—এবং সেজন্য তাকে অবিরাম শক্তি যোগাতে হয়। ভিটামিন-বি$_1$য়ের অভাবে শক্তি-উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং জমে যাওয়া পাইরুভিক অ্যাসিড আর ল্যাকটিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের পেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই উত্তেজনার ফলে হৃৎস্পন্দনে গোলমাল সৃষ্টি হয় এবং হৃৎপিণ্ডে জল জমে হৃৎপিণ্ড স্ফীত হয়ে পড়ে। তখনও যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বি-ভিটামিন দেওয়া না হয় তাহলে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। শরীরে ভিটামিব-বি$_1$য়ের নিদারণ অভাব হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে—এবং সে মৃত্যু অতি দ্রুতও আসতে পারে।

ভিটামিন-বি$_1$য়ের অভাবে প্রায়ই নিউরাইটিস রোগ দেখা দেয়। মস্তিষ্কের কোষের মতো নার্ভও ভিটামিন-বি$_1$য়ের অভাবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নার্ভের কাজ কেবল শর্করাদহন। শর্করাদহনে অপারগ নার্ভ রোগাক্রান্ত হলে তার উপসর্গ হিসাবে নার্ভপথে সামান্য ব্যথাও হতে পারে এবং সে ব্যথা কখনও কখনও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়কও হতে পারে। প্রথমে হয়তো জমে যাওয়া অ্যাসিডের কারণে ব্যথা হয়, পরে নার্ভকোষে সত্যিকারের ক্ষতির দরুন ব্যথা হয়। অ্যাসিডের কারণেই সম্ভবত মাথার যন্ত্রণা এবং নার্ভের উত্তেজনা হয় যার ফল হিসাবে প্রথমে আসে বমনেচ্ছা, পরে বমন।

ভিটামিন-বি$_1$য়ের অভাবের লক্ষণ নানাবিধ এবং নানামাত্রিক। একই লোকের শরীরে এক-একদিনে এক-একরকম লক্ষণও ফুটে উঠতে পারে এবং একই লক্ষণ বার বার দেখা দিতে পারে।

যব, ভুট্টা, ধান ও গমের অঙ্কুরে বা আস্ত দানায় এবং ঈস্ট অর্থাৎ সুরাবীজে সাধারণত ভিটামিন-বি$_1$ বেশি থাকে। টাটকা শাকসবজি, বাঁধাকপি, লেটুস, গোল আলু ও পেঁয়াজে বিভিন্ন প্রাণীর মাথার ঘিলু, মেটে, কিডনি, ডিমের কুসুম ও মাছের ডিমের চেয়ে বেশি ভিটামিন-বি$_1$ পাওয়া যায়। মুগ, মুসুর ও মটর ডাল আর পোস্তদানাতেও এই ভিটামিন বেশি আছে। আতপ চালের চেয়ে সিদ্ধ চালে এই ভিটামিন বেশি। লাল সিদ্ধ চালের ভাত (ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত হলে তো অতি উত্তম) আর অন্তত একবেলা হাতে-গড়া লাল আটার রুটি ও সেইসঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাল যদি খাওয়া যায় তাহলে পুষ্টির দিক থেকে ভালো হয়। ভাতের মাড় না ফেলে যদি তা ভাতেই শুকিয়ে ফেলা হয় তাহলে পুষ্টির পরিমাণ বাড়ে। মাঝে মাঝে খিচুড়ি খেলেও বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়।

স্নায়ুতন্ত্র স্নিগ্ধ ও দৃঢ় রাখতে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে এবং পরিপাকশক্তি বাড়াতে ভিটামিন-বি$_1$য়ের ভূমিকা অপরিসীম। এই ভিটামিনের অভাব হলে শরীরের বৃদ্ধি কমে যায়। এর অভাবে পাকস্থলী ও অন্ত্রের পাচক-রস ভালোভাবে নিঃসৃত হতে পারে না, ফলে পরিপাকশক্তি হ্রাস পায়।

আপাতদৃষ্টিতে বি-ভিটামিন সুলভ মনে না হলেও দুর্লভ নয় মোটেই। আমাদের বহু খাদ্যে এই ভিটামিন থাকে, কিন্তু আমরা অনেকসময়েই তা নষ্ট করে ফেলি। ময়দার চেয়ে আটা ভালো আমরা জানি, তবু ময়দার প্রতি আমাদের ঝোঁক। কলে-পেষা সাদা ময়দার চেয়ে জাঁতায়-পেষা লাল আটায় প্রচুর ভিটামিন-বি পাওয়া যায়। কলে যখন গম পেষা হয় তখন ঘর্ষণের দরুন যে তাপ সৃষ্টি হয় তাতে ভিটামিনের অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। রিফাইন বা পরিশোধনে অন্তত ২৫ রকমের পুষ্টিদ্রব্য নষ্ট হয়। তবে একথা ঠিক যে, সময়ের প্রয়োজনে জাঁতা প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছে, তাই কলে-পেষা আটা বা ময়দাই আমাদের মেনে নিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, টাটকা আটাই ভালো। একসঙ্গে অনেক আটা কিনে ঘরে রেখে দিয়ে দিনের পর দিন কি মাসের পর মাস ধরে খেলে তাতে পুষ্টি মেলে কম। আটাকে একটা পচনশীল জিনিসের মতোই দেখা উচিত।

চালের ব্যাপারেও এই একই কথা। ফ্যাশনের কবলে পড়ে আজ আমাদের পালিশ-করা চালের সাদা ধবধবে ভাত না হলে চলে না। অবশ্য পালিশ-করা চাল বেশিদিন রাখা যায়। কিন্তু পালিশ করতে গিয়ে চালের গা থেকে যে

লালচে খোসাটা অর্থাৎ কুঁড়োটা উঠে আসে তাতে ভিটামিন চলে যায়। তবে ইদানীং আধুনিক ধানকলগুলিতে যে পদ্ধতিতে চাল তৈরি করা হয় তাতে চালের খাদ্যমূল্য অনেকখানি সংরক্ষণ করা সম্ভব।

হাইড্রোজেন-সহযোগে তেল জমিয়ে যখন বনস্পতিজাতীয় ঘিয়ে পরিণত করা হয় তখন তার ভিটামিন-ই আর লাইনোলিক অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায়, কোলিনের চাহিদা বাড়ে এবং রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মদ চোলাইয়ে যে ঈস্ট ব্যবহৃত হয় সেই ঈস্ট আমাদের দেশে খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করার চল নেই। থাকলে ভালো হত, খুব শস্তায় খুব বেশি পরিমাণে ভিটামিন-বি পাওয়া যেত। পুষ্টিসমস্যার অনেকটাই তাতে মিটত। অ্যাডেল ডেভিস বলেছেন, "The use of yeast alone could correct the majority of the world's nutritional problems : the proteinless meals of China and India ; the B-vitamin needs in the Orient and the tropics ; the iron starvation of women the world over ; and the trace-mineral deficiencies of both sexes of all ages of every nationality."

প্রকৃতপক্ষে, যত রকম খাদ্যের কথা আমরা জানি তার যে কোনোটির চেয়ে ঈস্টেই পুষ্টি আছে বেশি। ডেভিস বলেছেন, "Yeast can be grown in a few hours without acres of land or sweat of a laborer's brow, its nutritive value increased by the touch of a chemist's hand. It is said that three hundred years have been required to introduce most new foods, for example, potatoes and tomatoes. Perhaps by the year 2275, yeast will save our overpopulated planet from famine."

ঈস্টে ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেট নেই বললেই চলে। প্রোটিন আছে অনেক। এতে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, মৌলিক বিপাকক্রিয়া বাড়ে এবং দেহের অবাঞ্ছিত মেদ ঝরে। সুতরাং যাঁরা রোগা অর্থাৎ স্লিম হতে চান তাঁরা খাওয়া কমিয়ে কি একবেলা খেয়ে বিপদ ডেকে না এনে ঈস্টের আশ্রয় নিতে পারেন। তবে ঈস্ট খাবার নিয়ম আছে, সেটা আগে জেনে নিতে হবে।

অন্তত তিনরকম বি-ভিটামিনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ, রক্তের কোলেস্টেরলকে স্বাভাবিক মাত্রায় রাখা এবং সেই তিনরকম বি-ভিটামিন

হচ্ছে—কোলিন, ইনোসিটল এবং ভিটামিন-বি৬। যখনই এই তিনজাতীয় বি-ভিটামিনের কোনো একটি কম হয়ে যায় তখনই রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ধমনীতে কোলেস্টেরলের পলি জমা আজকের দিনে একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। অনেকের ধারণা, হৃদরোগে মৃত্যুর একটা বড়ো কারণ ধমনীতে কোলেস্টেরল জমা। যন্ত্রসভ্যতার যুগে যখন থেকে আমরা আমাদের খাদ্যসামগ্রী যন্ত্রে প্রস্তুত করতে শুরু করেছি তখন থেকেই এই সমস্যার সূত্রপাত। যন্ত্রে খাদ্যশস্যের খনিজ পদার্থ আর ভিটামিনের অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্যসামগ্রী থেকে এই তিন ধরনের বি-ভিটামিন ছাড়াও ভিটামিন-ই প্রচুর পরিমাণে বাদ চলে যায়।

আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্য যদি ঠিক থাকে তাহলে রক্তের কোলেস্টেরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার আকারে থাকতে পারে এবং অতি সহজেই ধমনীর দেওয়াল ভেদ করে টিস্যুতে চলে যেতে পারে। খাদ্যে পুষ্টির অভাব হলে কোলেস্টেরল-কণিকার আকার এত বড়ো হয়ে যায় যে, ধমনীর দেওয়াল ভেদ করে বার হতে পারে না। ফলে, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে শেষে ধমনীর গায়ে জমতে শুরু করে। তাতে ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যেতে থাকে এবং ধমনী ক্রমশ কঠিন হতে আরম্ভ করে। ধমনী কঠিন ও অমসৃণ হলে তাতে কোলেস্টেরল-কণিকা জমার পথ আরও প্রশস্ত হয়, কারণ নিশ্চল স্থানেই কোনোকিছু পাকা বাসা বাঁধতে পারে। এইভাবে ধমনী কঠিন হয়ে তাতে কোলেস্টেরল জেঁকে বসতে শুরু করলে শেষপর্যন্ত যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অ্যাথারোসক্লেরোসিস বলে। অল্প অল্প করে সারা দেহের ধমনীতে কোলেস্টেরল জমে পরিমাণে যখন অনেক বেশি হয় তখন ধমনী সঙ্কুচিত হয়ে যায়, তার ভিতরকার শূন্যস্থান অনেকটাই ভরে যায়। ফলে, রক্তচলাচল ব্যাহত হয়। জলের পাইপে পলি জমলে যেমন জলের প্রবাহ বাধা পায়, জল ঠিকমতো প্রবাহিত হতে পারে না—এক্ষেত্রেও তেমনি হয়। রক্তপ্রবাহ বাধা পায়, কখনও কখনও সাজ্ঘাতিকভাবে পায়। ফলে অকসিজেন আর খাদ্য শরীরের নানা স্থানের টিস্যুতে সহজে পৌঁছতে পারে না। টিস্যু ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে অ্যাথারোসক্লেরোসিসের প্রচণ্ডতার উপর এবং কতদিন ধরে রক্তে কোলেস্টেরল বেড়েছে তার উপর।

সাধারণভাবে, ১০০ সিসি রক্তে ১৮০ মিলিগ্র্যাম থেকে ২৫০ মিলিগ্র্যাম কোলেস্টেরল থাকে। ২৫০ মিলিগ্র্যামের বেশি হলে তাকে অত্যধিক বলা হয়

এবং তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ১০০ সিসি রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ যদি ২৬০ মিলিগ্র্যাম ছাড়িয়ে যায় তাহলে হৃদরোগ হবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্যই যে হার্ট অ্যাটাকের প্রকৃত কারণ, একথা এখনও পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নি। তবে কোলেস্টেরলের আধিক্যের কারণে হৃৎপিণ্ডের পেশীতে এবং সেইসঙ্গে দেহের সমস্ত অংশে রক্তচলাচল দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়, একথা সত্য। ধমনীর গায়ে জমা কোলেস্টেরল ভেঙে আবার সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত করা যায় না। কিন্তু উপযুক্ত খাদ্যের সাহায্যে কোলেস্টেরল-জমা প্রতিরোধ করা যায়।

কোলেস্টেরল কথাটা আজকাল প্রায় মুখে মুখে ফেরে। করোনারি রোগে মৃত্যুর হার অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় কোলেস্টেরল কথাটার বহুলপ্রচলন। করোনারি রোগ মানে করোনারি ধমনীতে কোলেস্টেরল জমে রক্তচলাচলের পথ প্রায় রুদ্ধ করে দিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাজে বাধাসৃষ্টি। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের উপর কোলেস্টেরলের প্রভাব গুরুতর।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, দেহের কোনো একটি ধমনীতে যদি কোলেস্টেরল জমতে থাকে তাহলে অন্য ধমনীগুলিও বাদ যায় না। সব ধমনীতে একইভাবে কোলেস্টেরলের পলি জমতে শুরু করে। রক্তবাহের মধ্যে কোলেস্টেরল জমে যাওয়ায় রক্তবাহের ভিতরকার পথ সরু হয়ে যায়, ফলে রক্তচলাচল ব্যাহত হয়। চোখের সঙ্গে যেসব রক্তবাহ যুক্ত সেইসব রক্তবাহ এইভাবে সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলে দৃষ্টিসম্পর্কিত সমস্যা জটিল হয়ে পড়ে, চোখে ছানি থাকলে তাতেও গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু কোলেস্টেরল কমাতে পারলে দৃষ্টি আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে চেষ্টা করে।

রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে মস্তিষ্কেরও ক্ষতি হয়। রক্তই মস্তিষ্কে অকসিজেন পৌঁছে দেয়, সুতরাং রক্ত যদি ঠিকমতো মস্তিষ্কে যেতে না পারে তাহলে মস্তিষ্কে অকসিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়। ফলে, অতি বড়ো মেধাসম্পন্ন মানুষও বিভ্রান্তির শিকার হন, স্মরণশক্তি হারান, এমন কি বুদ্ধিহ্রাস ও অন্যমনস্কতার কবলেও পড়েন। এইসব উপসর্গ বিশেষ করে দেখা দেয় বার্ধক্যে।

রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরলের দরুন হার্ট অ্যাটাক হয় কি হয় না সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, যেভাবেই হোক রক্তে কোলেস্টেরল যদি কমানো যায় তাহলে করোনারি ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্তচলাচল সহজ হয়ে হৃৎপিণ্ডের পেশীর

টিস্যুতে বেশি অকসিজেন পৌছতে পারে, তাতে হৃৎপিণ্ড আরও সতেজ ও নীরোগ হতে পারে।

রক্তের কোলেস্টেরলের উপর খাদ্যের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হলেও শুধু বি-ভিটামিনের প্রভাব নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয় নি। বেশকিছু হৃদরোগীকে কোনোরকম ওষুধ না দিয়ে কেবল কোলিন, ইনোসিটল এবং লিভার কনসেনট্রেট দিয়ে অর্থাৎ সমস্তরকম বি-ভিটামিন দিয়ে দেখা গেছে, তাদের শ্বাসকষ্ট আর বুকের ব্যথা কমেছে, মনে জোর ফিরে এসেছে এবং সাধারণভাবে তারা অনেকটা সুস্থ বোধ করেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, প্রচুর পরিমাণে ঘি মাখন ডিম মেটে ইত্যাদি খাওয়া সত্ত্বেও রক্তের কোলেস্টেরল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

আমাদের খাদ্য যদি ঠিক থাকে তাহলে লিভার অর্থাৎ যকৃৎ অনেকটা মোমের-মতো-দেখতে কতকগুলি জিনিস তৈরি করে—এবং প্রত্যহই করে। সেই জিনিসগুলিকে একত্রে বলা হয় লেসিথিন। লেসিথিন চলতি নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ফস্ফোলিপিড। এই লেসিথিনই কোলেস্টেরলকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত করে যাতে তা অতি সহজে টিস্যুতে চলে যেতে পারে। শরীরে লেসিথিন অত্যল্প পরিমাণে তৈরি হলে কোলেস্টেরল-কণিকার আকার বড়ো হয়ে যায় এবং তখন ঐ বৃহদায়তন কণিকা ধমনীর গা ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না, রক্তে আর ধমনীর গায়ে আটকা পড়ে যায়।

লেসিথিন তৈরি হয় ফ্যাট, কোলিন, ইনোসিটল আর কতকগুলি অত্যাবশ্যক অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে। তবে ভিটামিন-বি$_6$যুক্ত কো-এনজাইম আর ম্যাগনেসিয়ম ছাড়া লেসিথিন তৈরি হতে পারে না। শেষোক্ত পাঁচটি পদার্থের কোনো একটি পরিমাণে কম হলে লেসিথিন তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। তখন রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। উদ্ভিজ্জ তেলে লাইনোলিক অ্যাসিড থাকে, রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর জন্য এই তেল প্রয়োজন। সমান প্রয়োজন কোলিন, ইনোসিটল, ভিটামিন-বি$_6$ আর ম্যাগনেসিয়ম। খাদ্যে এই জিনিসগুলি ঠিকমতো থাকলে প্রয়োজনীয় সমস্ত লেসিথিনই শরীর তৈরি করে নিতে পারে।

লেসিথিনের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন। এমন কি, অনেক চিকিৎসকও না। ফলে, অত্যধিক কোলেস্টেরলজনিত রোগ অ্যাথারোস-ক্লেরোসিসের চিকিৎসার ব্যাপারে একটা বড়ো রকমের বিভ্রান্তি চলছে।

চিকিৎসকরা এককথায় ডিম, মাখন, ঘি, বড়ো মাছ, চর্বিওয়ালা মাংস প্রভৃতি খাদ্য বন্ধ করে দেন। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে, অত্যধিক কোলেস্টেরলের রোগীকে রোজ ১০টি করে ডিম খেতে দিলেও রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে না, যদি খাদ্যে লেসিথিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী থাকে। সুতরাং দেখতে হবে, কিসে লেসিথিন তৈরি হয়। শরীরে লেসিথিন তৈরি হতে না পারলে ডিম, মাখন, ঘি ইত্যাদি কোলেস্টেরলসমৃদ্ধ খাদ্য অবশ্যই ক্ষতিকর।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যে কোলেস্টেরল থাকে না, কিন্তু অনেক উদ্ভিজ্জ তেল স্বাভাবিকভাবেই বেশি সংপৃক্ত অথবা অসংপৃক্ত উদ্ভিজ্জ তেলকে হাইড্রোজেন দিয়ে জমিয়ে আমরা সংপৃক্ত করে তুলি। এইসব সংপৃক্ত উদ্ভিজ্জ তেল কোলিনের চাহিদা বাড়িয়ে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। নারকেল তেল এমনি এক উদ্ভিজ্জ তেল এবং সবচেয়ে বেশি অপকারী। জমাট-বাঁধা ফ্যাট—তা সে যেখান থেকেই আসুক না কেন—রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়। কিন্তু তরল ফ্যাট তা করে না। এমন কি, শরীরে অপ্রয়োজনীয় ক্যালরি থেকে উৎপন্ন চর্বি বা ফ্যাটও সংপৃক্ত—এবং তাতেও কোলিনের চাহিদা বেড়ে যেতে পারে। ফলে, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পেতে পারে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, মোটা লোকদের অনেকেই অ্যাথারোসক্লেরোসিসের রোগী।

আমাদের জানা দরকার, ঘি মাখন দুধ ডিম মাংস ইত্যাদি বেশি খেলেই রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে না। সুইজারল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ড ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের লোকেরা এইসব খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খায়, তাদের রক্তে কিন্তু কোলেস্টেরল বেশি পাওয়া যায় না, তারা হৃদরোগে আক্রান্তও হয় না বেশি। তাদের খাদ্যে লেসিথিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকে।

আরও জানা দরকার, মোটা লোকদের মধ্যে যাঁরা একবেলা না খেয়ে কি পুরো একদিন উপবাস করে রোগা হবার চেষ্টা করেন তাঁরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনেন। আমাদের শরীর অবিরাম একটু একটু করে খাদ্য কাজে লাগায়, সুতরাং সব সময়েই পাকস্থলীতে কিছু খাদ্য থাকা দরকার। তা যদি না থাকে, উপবাসের পর পাকস্থলীতে যদি একসঙ্গে পুরো একদিনের খাদ্য ঢোকানো হয় তাহলে গোটা দেহ অভিভূত হয়ে পড়ে গোলমাল বাধায়। প্রত্যহ মাত্র একবার কি দুবার আহার করলে রক্তে কোলেস্টেরল অত্যধিক বেড়ে যায়। কিন্তু যদি বারবার অল্প অল্প করে আহার করা হয় তাহলে

কোলেস্টেরল বাড়তে তো পারেই না, বরং কমে।

পরিশেষে, রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধির পিছনে যন্ত্রসভ্যতারও একটা ভূমিকা আছে। যন্ত্রপরিশোধিত, বিশেষ করে যন্ত্রে প্রস্তুত চাল আটা ইত্যাদিতে ভিটামিন-বি অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়, তাতে হৃদরোগের পথ প্রশস্ত হয়।

ভিটামিন-সি নামটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এ নাম এই শতাব্দীর। কিন্তু দুই শতাধিক বছর আগেও এই জিনিসটির কথা জানা ছিল। এই ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি রোগ যে বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছিল, ইতিহাসের পাতায় তা কালো অক্ষরে লেখা আছে। ১৭৫৪ সালে জেম্‌স্ লিণ্ড লেখেন, লেবুর রস খেলে এই রোগ হয় না, আর যদি হয়েও থাকে তাহলে সেরে যায়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, টাটকা খাদ্য না খাওয়ার দরুনই স্কার্ভি হয়।

ভিটামিন-সি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় লেবুজাতীয় ফলে এবং পেয়ারায়। টোম্যাটো, বাঁধাকপি ইত্যাদিতেও কিছু পাওয়া যায়।

ভিটামিন-সি'র বহুবিধ কাজের মধ্যে একটি কাজ কোল্যাজেন তৈরি করা ও তা রক্ষা করা। আমাদের দেহের সমস্ত কোষকে একসঙ্গে ধরে রাখার জন্য কোল্যাজেন দরকার। আমাদের দেহটাকে যদি একটা বাড়ি ধরি আর কোষগুলিকে ইট, তাহলে কোল্যাজেন হচ্ছে সিমেন্ট। ইট দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে গেলে সিমেণ্ট যে কাজে লাগে, কোষ দিয়ে তৈরি আমাদের এই দেহটাতে কোল্যাজেনও সেই কাজ করে। সুস্থ দেহের কোল্যাজেন অনেকটা শক্ত, ঘন জেলির মতো এবং তা কানেকটিভ টিস্যু অর্থাৎ সংযোজক কলা নামে পরিচিত। সংযোজক কলা ঘনীভূত থাকে কার্টিলাজ বা তরুণাস্থি, লিগ্যামেণ্ট বা সন্ধিবন্ধনী এবং ব্লাড-ভেসেল বা রক্তবাহের দেওয়াল, অস্থির বনিয়াদ ও উঠতি দাঁতের মধ্যে —এবং এগুলিকে যেমন শক্তি যোগায় তেমনি স্থিতিস্থাপকতা দেয়। এই জেলি তৈরি করতে যেমন ভিটামিন-সি দরকার তেমনি তাকে শক্ত করতে দরকার ক্যালসিয়ম। ক্যালসিয়ম কিন্তু সংযোজক কলার অংশ নয়, তার কাজ শুধু সংযোজক কলা তৈরি হবার পর তাকে শক্ত ও ঘন করা।

সংযোজক কলাকে অবশ্যই সুদৃঢ় হতে হবে। আমাদের দেহকোষের দেওয়াল অত্যন্ত পাতলা—ভাইরাস, বিষ, অধিবিষ, বিপজ্জনক ওষুধ, অ্যালার্জেন এবং বহু বহিরাগত পদার্থ যা প্রায়শই আমাদের দেহে প্রবেশ করে, অনায়াসেই এই সূক্ষ্ম দেওয়াল ভেদ করে কোষের ভিতর চলে যেতে পারে। কিন্তু সংযোজক

কলা যদি শক্ত হয় তাহলে তাকে ভেদ করা সহজ হয় না, কোষ অনেকটা নিরাপদ থাকে। এখন, শরীরে ভিটামিন-সি কম হলে এই কলা ভেঙে যায় এবং ক্যালসিয়ম কম হলে এই কলা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন সমস্ত রক্ষাকবচ চলে যায়, শত্রুর আক্রমণ সহজ হয়।

রক্তবাহের দেওয়াল এমন হওয়া চাই যেন প্রয়োজনমতো সম্প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হতে পারে। যখন যেখানে যে পরিমাণ রক্তের দরকার তা পাওয়া যাবে কিনা নির্ভর করে এই সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন ক্ষমতার উপর। সুতরাং রক্তবাহের স্থিতিস্থাপকতা ও দৃঢ়তা দুই-ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক রক্তবাহ রবারের মতো স্থিতিস্থাপক—টান পড়লে বড়ো হয়, ছেড়ে দিলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এখন, শরীরে ভিটামিন-সি'র আংশিক অভাব হলে সমস্ত রক্তবাহেরই দেওয়ালে পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু কৈশিক অর্থাৎ কেশের মতো অত্যন্ত সরু রক্তবাহের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। ভিটামিন-সি'র অভাবে কৈশিক রক্তবাহের দেওয়াল সহজেই ভেঙে যায় এবং রক্ত পথ পেয়ে চলে যায় টিস্যুতে অর্থাৎ কলায়। এই যে সামান্য রক্তক্ষরণ, এটা প্রথম হয় অন্ত্রের দেওয়ালে, অস্থিমজ্জায় এবং সন্ধিতে। এই রক্তক্ষরণে কখনও কখনও বেশ যন্ত্রণা হয়, সন্ধির গায়ে রাসায়নিক প্রদাহের দরুন সন্ধির ভিতর জল জমে ফুলে উঠে বাতরোগও সৃষ্টি করতে পারে। চামড়ার উপরদিকে যখন দেওয়াল ভাঙে তখন রক্ত বিবর্ণ হয়ে গিয়ে কালশিরার মতো দেখায়। এই কালশিরা দেখেই বুঝতে হবে, রক্তবাহের দেওয়াল ভঙ্গুর হয়ে গেছে, তার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়েছে। ভিটামিন-সি'র অভাবের এ-ই হচ্ছে প্রথম বাহ্য লক্ষণ—বিশেষ করে, নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে, কারণ তাদের দেহপেশী অপেক্ষাকৃত নরম। পুরুষের পেশী তুলনায় শক্ত বলে সবসময় প্রথমেই কালশিরা পড়ে না। চামড়ায় কালশিরা পড়া আর দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়া দুই-ই ভিটামিন-সি'র অভাবের বিপদসঙ্কেত।

ভিটামিন-সি'র অভাবে শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয়। উঠলেও আস্তে আস্তে ওঠে। আবার কখনও-বা উঠতে উঠতে সাময়িকভাবে ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। ভিটামিন-সি'র অভাবের সময় যে ডেন্টিন তৈরি হয় তা সরন্ধ্র এবং কোমল, সুতরাং পরে যদি ক্ষয় আরম্ভ হয় এবং এনামেল পর্যন্ত পৌঁছয় তাহলে অবাধে তা এনামেল ভেদ করে যায়। তখন দাঁতের ভিতরকার মজ্জা অতি দ্রুত সংক্রামিত হয়ে পড়ে এবং অনেকসময় দাঁত চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

শরীরে ভিটামিন-সি যদি ঠিকমতো না যায় তাহলে হাড়ের বনিয়াদ অংশত ভেঙে পড়ে এবং খনিজ পদার্থ নষ্ট হয়। হাড় তখন ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং তার স্থিতিস্থাপকতা ও শক্তি কমে যায়। এই জাতীয় হাড় সহজেই ভাঙে।

শরীর ঠিকমতো ভিটামিন-সি না পেলে দাঁতের মাড়ি ফুলে ওঠে, স্পঞ্জের মতো হয়—এবং মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে। মাড়ির টিস্যুর যেসব কোষ মরে যায়, ব্যাকটিরিয়া তাদের আশ্রয় করে। ফলে, পাইওরিয়া জাতীয় রোগের সংক্রমণ ঘটে এবং শেষে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়।

কোনো ক্ষতস্থান শুকোবার সময় সেখানে যে টিস্যু জন্মায় তা কোল্যাজেন দিয়ে তৈরি সংযোজক কলা। তার শক্তি নির্ভর করে ভিটামিন-সি আর ক্যালসিয়মের উপর। ক্ষতস্থান কত দ্রুত শুকোবে এবং ক্ষতস্থানের টিস্যুর শক্তি কেমন হবে তা সরাসরি নির্ভর করে কতখানি ভিটামিন-সি শরীর পেল তার উপর।

ভাঙা হাড় জোড়া লাগার ব্যাপারে ভিটামিন-সি'র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন-সি ছাড়া ভাঙা হাড় জোড়া লাগে না। ভিটামিন-সি'র অভাবে হাড়ের বনিয়াদের কোল্যাজেন তৈরি হতে পারে না, ফলে ভাঙা দুটি অংশ একত্র থাকলেও আঁট হতে পারে না। সাধারণত বৃদ্ধ বয়সেই এটা বেশি দেখা যায়, কারণ তখন খাদ্যে পুষ্টিদ্রব্যের অভাব থাকে বেশি।

স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য ভিটামিন-সি দরকার। সুস্থ চোখে এই ভিটামিন ঘনীভূত থাকে লেন্স আর একুয়িয়াস হিউমারের ভিতর। চোখে রোগসংক্রমণ হলে কি প্রদাহ হলে বেশি পরিমাণে ভিটামিন-সি খাইয়ে ভালো ফল পাওয়া গেছে।

ভিটামিন-সি শরীরে সঞ্চয় করে রাখা যায় না, তবে জলে-ভেজা স্পঞ্জের মতো দেহের টিস্যুসমষ্টিকে এই ভিটামিনে সংপৃক্ত করা যায়। সংপৃক্তির পর অতিরিক্ত ভিটামিন-সি প্রস্রাবের ভিতর দিয়ে শরীর থেকে বার হয়ে যায়।

সমস্ত উদ্ভিদই এনজাইমের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন-সি তৈরি করে নেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার, যে এনজাইম এই ভিটামিন তৈরি করে সেই এনজাইমই বিপরীত ক্রিয়ায় অতি দ্রুত ভিটামিনটা নষ্ট করে ফেলে। তাই ফসল কেটে তোলার পর তার ভিটামিন খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ঐ এনজাইম বাতাসের অকসিজেনের সঙ্গে মিশেও ভিটামিন নষ্ট করে ফেলে। তাই কোনো ফল বা সবজি খোসা ছাড়িয়ে কিংবা কেটে বাতাসে রেখে দিলে

তার ভিটামিন নষ্ট হয় খুব তাড়াতাড়ি। তবে ফ্রিজারে রেখে দিলে নষ্ট হতে পারে না, কারণ ঠাণ্ডায় এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আবার, ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মতো তাপমাত্রায় গরম করলে ঐ এনজাইম নষ্ট হয়ে যায়। বার বার গরম করলে বেশি নষ্ট হয়।

ভিটামিন-সি জলে দ্রবীভূত হয়, সুতরাং ফল কিংবা সবজি খোসা ছাড়িয়ে কেটে তারপর যদি আস্তে আস্তে জলে ধোয়া হয় বা জলে ভিজিয়ে রাখা হয় অথবা জলে সিদ্ধ করা হয় তাহলে ভিটামিনের অনেকটাই কি সবটাই জলের সঙ্গে চলে যায়। অতএব তরিতরকারি আর ফল কাটার পর না ধুয়ে ধোয়ার পর কাটা উচিত। যদি জলে ভিজিয়ে রাখা হয় কি জলে সিদ্ধ করা হয় তাহলে ঐ জলটাও কাজে লাগানো উচিত।

ভিটামিন-সি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় লেবুজাতীয় ফলে। ফল রস করে খেলে সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, বাতাসের অকসিজেনের সংস্পর্শে এলে ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায়। টাটকা রসে প্রচুর ভিটামিন-সি থাকে, কৌটোয় বা শিশিতে ভরা রসে থাকে অনেক কম। কমলালেবু ভিটামিন-সি'র খনি। কমলালেবু যত মিষ্টি হবে ততই তার ভিটামিন-সি'র পরিমাণ বেশি হবে।

কোন্ তরিতরকারি আর ফলে কী পরিমাণ ভিটামিন-সি পাওয়া যাবে তা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন—কোন্ জলবায়ুতে হয়েছে, কেমন মাটিতে হয়েছে, পেকেছে কতখানি, কোথায় কীভাবে কত তাপমাত্রায় রাখা হয়েছে, কীভাবে নাড়াচাড়া করা হয়েছে, রান্না হয়েছে কোন্ পদ্ধতিতে, যদি কৌটোয় বা শিশিতে রাখা হয়ে থাকে তাহলে তা হয়েছে কীভাবে। খাদ্য যদি সাধারণ তা পমাত্রায় এমনিতে ঘরে মজুত করে রাখা হয় কিংবা জলে ভেজানো হয় বা সিদ্ধ করা হয় এবং সেই জল ফেলে দেওয়া হয় তাহলে ভিটামিন-সি'র অনেকটাই চলে যায়। স্যালাড হিসাবে কিছু টাটকা কাঁচা শাকসবজি খেলে অনেক ভিটামিন-সি পাওয়া যায়।

লেবুজাতীয় ফলের শাঁসে, বিশেষ করে খোসার গায়ে নিচের দিকে যে সাদা পর্দা থাকে তাতে বায়োফ্ল্যাভোনয়েড নামে কিছু জিনিস থাকে। কিন্তু রসে থাকে না। এই বায়োফ্ল্যাভোনয়েড ভিটামিন-সি'র চাহিদা কমিয়ে দেয় এবং ভিটামিন-সি'কে বেশি কার্যকর করে তোলে।

ভিটামিন-সি'কে বলা হয় 'মির‍্যাক্‌ল্ ড্রাগ'। কারণ, এই ভিটামিন কতভাবে

কত রোগের কবল থেকে আমাদের রক্ষা করে তার ইয়ত্তা নেই।

যখন কোনো বিষ বা বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে তখন যদি শরীরের ভিতর ভিটামিন-সি'র অভাব না থাকে তাহলে বিষক্রিয়া হওয়ার সুযোগ পায় না। শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকলে অ্যান্টিবডি ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়াকে নিরীহ জীবে পরিণত করতে পারে। ব্যাকটিরিয়া-জনিত রোগের মতো ভাইরাস-জনিত রোগেও ভিটামিন-সি সমান উপকারী। আবার, বাত কিংবা স্টম্যাক ও ডুওডেনাল আলসারের মতো যেসব রোগ সংক্রামক নয় সেইসব রোগেও এই ভিটামিন ফলপ্রদ। এছাড়াও দেখা গেছে, সর্দি, নিউ-মোনিয়া, মেনিনজাইটিস, রিউম্যাটিক ফিভার, যক্ষ্মা, ডিফথিরিয়া প্রভৃতি রোগে এবং প্রস্টেট, চোখ, কান, নাক, টনসিল ইত্যাদিতে রোগসংক্রমণ হলে ভিটামিন-সি বেশ কাজ দেয়।

ভিটামিন-সি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে দেখা গেছে, হৃৎপিণ্ডে রক্তচলাচল কমে যায়, শ্বাসকষ্ট হয় এবং ই-সি-জি'তে বেশ পরিবর্তন আসে। বর্তমান যুগে মানুষের অকালমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ, হৃদরোগ। হৃৎপিণ্ডকে সবল ও সচল রাখতে ভিটামিন-সি'র ভূমিকা কম নয়।

রক্তে যখন বহিরাগত কোনো জিনিস এসে মেশে তখন কিছু-না-কিছু বিষক্রিয়া হয়ই। ভিটামিন-সি'র প্রয়োগে ক্ষতিটা রোধ করা যায়। কিন্তু তা করতে গিয়ে ভিটামিনটাই নষ্ট হয়ে যায়। বহু ওষুধ আমাদের শরীরের ভিতরকার ভিটামিন-সি নষ্ট করে দেয়। তাই অনেক ওষুধের সঙ্গে ভিটামিন-সি'ও দেওয়া হয়। সাধারণ জ্বর থেকে শুরু করে কত দুরূহ রোগে ভিটামিন-সি সুফল দেয় তা বলে শেষ করা যায় না। ভিটামিন-সি শরীরে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য না করলেও ক্লান্তি নিবারণে তার একটা ভূমিকা আছে।

প্রতিদিন কতখানি ভিটামিন-সি খেতে হবে, ঢালাওভাবে বলা কঠিন। কারন, এক-একজনের এক-একরকম প্রয়োজন। তবে প্রয়োজন যা-ই হোক না কেন, বেশি খেলে ক্ষতি নেই, কেননা অতিরিক্ত অংশ শরীরে থাকে না, অবিলম্বে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তাই পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেলেও বিষক্রিয়া হয় না। তবে কখনও কখনও গায়ে র‍্যাশ বার হতে পারে। কিন্তু তার কারণ বেশি ভিটামিন-সি নয়, ভিটামিন-সি ট্যাবলেটের ফিলার পদার্থ। তখন ব্র্যাণ্ড বদল করলে উপকার পাওয়া যায়। পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেলে কখনও কখনও পেট খারাপও হতে পারে। তখন পরিমাণ কমিয়ে দিলে সুফল পাওয়া যায়।

সব সময়েই মনে রাখা দরকার, ট্যাবলেটের আকারে তৈরি কৃত্রিম ভিটামিন-সি'র চেয়ে তরিতরকারি বা ফলে যে ভিটামিন-সি পাওয়া যায় তা অনেক ভালো। তবে দরকার হলে ট্যাবলেটও খেতে হবে।

কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবিলেবু, আপেল, আম, আনারস, আঙুর, টোম্যাটো ইত্যাদি অম্লমধুর ফলে এবং পেয়ারা, পেঁপে, পাকা লঙ্কা, গোল আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টাটকা শাকসবজি আর অঙ্কুরিত মুগ-ছোলা প্রভৃতিতে প্রচুর ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। কাঁচামুগ ও বরবটি অঙ্কুরিত হলে অনেক বেশি ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। কমলালেবুর রসের চেয়ে খোসায় বেশি ভিটামিন-সি থাকে। ফল যত পাকে, ভিটামিন-সি'র পরিমাণও তত বাড়ে। পুরো পাকা ফলে ভিটামিন-সি'র পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

কচি শাঁসযুক্ত ডাবের জলেও যথেষ্ট ভিটামিন-সি থাকে। কচি শাঁসযুক্ত ডাবের জলে যে পরিমাণ ভিটামিন-সি থাকে তাতে রোজ এইরকম একটি ডাব খেলেই আমাদের দেহের প্রয়োজন মেটে। কচি শাঁসওয়ালা ডাবের জল ছাড়া ঝুনো নারকেলের ফোঁপড়াতেও মোটামুটি ভালোই ভিটামিন-সি পাওয়া যায়।

ডাব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে একটা ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন, ডাবের জল খুব পুষ্টিকর। তাই অসুখ হলেই ডাব খেতে দেন। হাসপাতালে ডাবের ডাঁই জমে যায়। গরমকালে সুস্থ লোকেরাও উপকারী মনে করে যখন-তখন ডাবের জল খান। কলকাতা শহরে যত্রতত্র ডাবের পাহাড় এক মস্ত সমস্যা। কিন্তু জানা দরকার, ডাবের জল বাইরে থেকে দূষিত হতে পারে না বলে স্বাস্থ্যসম্মত, কিন্তু কিছু ভিটামিন-সি ছাড়া তার পুষ্টিমূল্য খুবই সামান্য। সুতরাং ডাব কেটে শহরের সমস্যা না বাড়িয়ে এবং দেশের অর্থনীতির ক্ষতি না করে গাছে থাকতে দেওয়াই ভালো। ঝুনো নারকেল বরং বেশি উপকারী—এবং তা থেকে অনেকরকম শিল্পও হতে পারে। নারকেলের শাঁস, নারকেলের মালা, নারকেলের ছোবড়া অনেক শিল্পের কাঁচামাল।

ভিটামিন-সি সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার, এই ভিটামিন বাতাসের অকসিজেনের সংস্পর্শে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য ফল রস করে রেখে দিয়ে পরে খাওয়া ঠিক নয়। ফলপাকড় যত টাটকা খাওয়া যায় তত ভালো।

সাধারণ রান্নার তাপেও ভিটামিন-সি'র অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। বাঁধাকপির অর্ধেক ভিটামিন-সি এইভাবে নষ্ট হয় এবং গাজরের ভিটামিন-সি'র

প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। পালংশাক ইত্যাদি তেলে কড়া করে ভাজলে তার ভিটামিন-সি থাকে না। বার বার গরম করলেও খাদ্যের ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায়।

তরিতরকারির কোষে অ্যাস্কর্বিক অকসিডেজ নামে একরকম এনজাইম থাকে। তরিতরকারি যত ছোটো করে কাটা হবে তত বেশি এই এনজাইম বার হবে এবং তত বেশি ভিটামিন-সি নষ্ট হবে। তারপর রান্নার সময় তাপমাত্রা যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তখন এই এনজাইমের অকসিডেশনের হারও বাড়বে আর ভিটামিন-সি নষ্ট হবে। অর্থাৎ, তরিতরকারি ঠাণ্ডা জলে দিয়ে সিদ্ধ করলে ভিটামিন-সি অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি ফুটন্ত জলে ফেলে সিদ্ধ করা হয় তাহলে ভিটামিন-সি বেশি নষ্ট হতে পারে না, কারণ গরম জলে অ্যাস্কর্বিক অকসিডেজ বাঁচে না।

অন্যান্য ভিটামিনের চেয়ে ভিটামিন-সি অনেক সহজে নষ্ট হয়। প্রধানত ৬টি কারণে আমাদের খাদ্যের ভিটামিন-সি নষ্ট হয় : (১) তরিতরকারি খুব ছোটো ছোটো করে কাটলে, (২) তরকারি কাটার পর ধুলে এবং বেশি জলে ধুয়ে জলটা ফেলে দিলে, (৩) তরকারি ঠাণ্ডা জলে দিয়ে আস্তে আস্তে সিদ্ধ করলে, (৪) বেশি সিদ্ধ করলে বা ভাজলে, (৫) খাওয়ার আগে অনেকক্ষণ গরম রাখলে, এবং (৬) তরকারির রং ঠিক রাখার জন্য সোডিয়ম বাইকার্বোনেট ব্যবহার করলে (ক্ষারে ভিটামিন-সি নষ্ট হয়)।

আধুনিক পদ্ধতিতে তরিতরকারি জলশূন্য করে শুকিয়ে রাখলে কিংবা ঠাণ্ডায় সংরক্ষণ করলে অথবা বায়ুশূন্য কৌটোয় বা কাঁচের পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখলে ভিটামিন-সি বেশ কিছুটা বজায় রাখা যায়।

সাধারণত আমরা যেসব খাদ্য খাই তাতে অন্যান্য ভিটামিনের তুলনায় ভিটামিন-ডি পাওয়া যায় খুবই কম। অথচ, হাড়ে উপযুক্ত পরিমাণে ফসফরস আর ক্যালসিয়ম ধরে রাখার জন্য ভিটামিন-ডি খুবই দরকার। আবার, রক্তে ফসফরস আর ক্যালসিয়মের সমতা রাখার জন্যও দরকার। দেহের বৃদ্ধি আর সুস্থতাবিধানেও এই ভিটামিনের প্রয়োজন আছে। এই ভিটামিন ছাড়া দাঁত আর হাড়ের বৃদ্ধি ঠিকমতো হতে পারে না। এই ভিটামিনের অভাবে শিশুদের রিকেটরোগ এবং বয়স্কদের অস্টিওম্যালেশিয়া নামে একজাতীয় অস্থিরোগ হয়ে থাকে। মেয়েদের খাদ্যে ভিটামিন-ডি'র অভাব হলে প্রসবদ্বারের সন্নিকটস্থ

হাড় ঠিকমতো পুষ্ট হতে পারে না, ফলে প্রসবের সময় সন্তানের মৃত্যু ঘটতে পারে। ভিটামিন-ডি'র অভাবে দাঁতে ক্যারিজরোগও হয়ে থাকে। অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও কমে যায়।

ভিটামিন-ডি দাঁতের ক্ষয় রোধ করে। আমরা নানাভাবে অত্যধিক শর্করা খাই, আমাদের মুখের মধ্যে ব্যাকটিরিয়া যে এনজাইম সৃষ্টি করে সেই এনজাইম ঐ শর্করা ভেঙে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। যে কোনো অ্যাসিডই ক্যালসিয়মের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সুতরাং মুখের ভিতর যেখানে অ্যাসিড তৈরি হয় সেখানে যদি লালা পৌঁছতে পারে আর লালায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়ম দ্রবীভূত থাকে তাহলে লালার ভিতরকার ক্যালসিয়মে অ্যাসিড নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে—এবং দাঁত ক্ষয়ের কবল থেকে রক্ষা পায়।

লালা সাধারণত কিছুটা অ্যাসিডধর্মী, তার উপর ব্যাকটিরিয়া-সৃষ্ট এমজাইম শর্করা ভেঙে যে অ্যাসিড তৈরি করে তাতে লালা আরও অ্যাসিডিক হয়ে যায়। এখন, ভিটামিন-ডি'র অভাবে দাঁতের ছিদ্রপথগুলি যখন বড়ো ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে তখন অ্যাসিড ঐ ছিদ্রপথগুলি দিয়ে ভিতরে ঢোকে এবং দাঁতের ক্ষয় করে। এইভাবে দাঁতে যখন প্রদাহ হয় তখন তাকে ক্যারিজ বলে। মাড়িতে প্রদাহ হলে তাকে বলে পাইওরিয়া। পাইওরিয়া-প্রতিরোধে ভিটামিন-ডি'র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভিটামিন-ডি'র অভাবে যে ক্যারিজ বা পাইওরিয়া হয় তাতে অন্যান্য চিকিৎসার সঙ্গে যদি ভিটামিন-ডি দেওয়া হয় তাহলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

অনেকের ধারণা, ভিটামিন-ডি কেবল শিশুদেরই দরকার। ধারণাটা ঠিক নয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই এই ভিটামিন দরকার। এই ভিটামিনের অভাবে বয়স্কদের অস্টিওম্যালেশিয়া আর অস্টিওপোরোসিস নামে দু রকম রোগ হয়ে থাকে। অস্টিওম্যালেশিয়া মানে মন্দাস্থি আর অস্টিওপোরোসিস হল সরন্ধ্র অস্থি। প্রথমটিতে হাড় খারাপ হয়ে যায় আর দ্বিতীয়টিতে হাড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজস্র ছিদ্র সৃষ্টি হয়। দুটি রোগই সমগোত্রীয়, পার্থক্য কেবল রোগের প্রকোপে। উভয় ক্ষেত্রেই হাড় এত কম খনিজ পদার্থ পায় যে, তা সরন্ধ্র হয়ে ওঠে এবং তখন দেখতে অনেকটা মাছিরিক্ত মৌচাকের মতো লাগে। রোগের প্রকোপ বেশি হলে মানুষ অনেক সময় ক্ষুদ্রকায় হয়ে যায়, পেশীতে আক্ষেপ সৃষ্টি হয় এবং টান ধরে। অস্টিওপোরোসিসে সাধারণত যন্ত্রণা কম হয়, কিন্তু অস্টিওম্যালে-শিয়ায় বেশ যন্ত্রণা হয়, বিশেষ করে নিতম্বদেশে। এই যন্ত্রণাকে অনেকসময়

বাতের ব্যথা বলে ভুল হয়। এই রোগে একটু আঘাতেই চট করে হাড় ভেঙে যাবার আশঙ্কা থাকে। চীন এবং ভারতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি—বিশেষ করে, গর্ভবতী নারীদের মধ্যে, যখন তাদের দেহে নানাবিধ খনিজ দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়। বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক সার্ রবার্ট ম্যাকক্যারিসন ভারতীয় মুসলমান নারীদের মধ্যে অষ্টিওম্যালেশিয়া রোগ বেশি দেখতে পেয়েছেন, কারণ মুসলমান নারীরা অনেকেই পর্দাপ্রথা অনুযায়ী কৈশোর থেকেই গৃহবন্দী এবং প্রয়োজনে বাইরে বার হতে হলে সারা অঙ্গ তাদের বোরখায় আবৃত থাকে। অর্থাৎ, প্রকৃত অর্থেই তারা অসূর্যম্পশ্যা। তার উপর তাদের খাদ্যে ভিটামিন-ডি'র অভাব।

ভিটামিন-ডি'র অভাবে শিশুদের যে রোগ সবচেয়ে বেশি হয় তা হল রিকেট। ভিটামিন-ডি'র আংশিক অভাবে শরীরে নানারকম বিকৃতি ও বিকলতা দেখা দিতে পারে, যেমন—সরু এবং অপরিণত বুক ও মুখ, এবড়ো-খেবড়ো এবং বাঁকা দাঁত, ঢালু কিংবা বাইরে-বেরিয়ে-আসা চিবুক আর কপাল, গর্তে-বসা চোখ ইত্যাদি।

শরীরে যাতে ভিটামিন-ডি তৈরি হতে পারে তার জন্য সূর্যের আলো চাই। বিশেষভাবে বলতে গেলে, সূর্যের আলোয় যে অতিবেগুনী রশ্মি থাকে সেই রশ্মির সংস্পর্শে এলে শরীরে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়। দেহের চামড়ায় যে তেল থাকে তার উপর সূর্যের আলোর অতিবেগুনী রশ্মি এসে লাগলে একটা ক্রিয়া হয় আর তাতেই উৎপন্ন হয় ভিটামিন-ডি।

চামড়ার তেল বলতে আর্গস্টেরল। আমাদের দেহের চামড়ায় আর্গস্টেরল থাকে, সৌরকরের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে তা ভিটামিন-ডি'তে পরিণত হয়। স্বচ্ছ মেঘ থেকে বিচ্ছুরিত সূর্যের আলোয় এবং জল ও বালি থেকে প্রতিফলিত রৌদ্রে অতিবেগুনী রশ্মি সাধারণত বেশি থাকে।

আমাদের দেশে নবজাত শিশুকে ভালো করে তেল মাখিয়ে রৌদ্রে শুইয়ে রাখার যে প্রথা ছিল এবং এখনও গ্রামাঞ্চলে স্নানের আগে তেল মাখার যে রীতি আছে তার উপকারিতা থাকতে পারে। গায়ে ভালো করে তেল মেখে রোদ লাগিয়ে বেশ খানিকক্ষণ পরে স্নান করা উচিত।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, গায়ে ভালো করে তেল মেখে কিছুক্ষণ রোদ লাগাতে হবে, তারপর স্নান করতে হবে—তবেই ভিটামিন-ডি তৈরি হয়ে শরীরে পরিশোষিত হবে। তেল মেখেই অমনি যদি কেউ স্নান

করেন তাহলে তেল ধুয়ে যাবে, পরে গায়ে রোদ লাগালে কোনো কাজ হবে না। আবার, তেল মেখে গায়ে একটু রোদ লাগিয়েই অমনি যদি স্নান করা হয় তাহলেও ব্যাপারটা নিরর্থক, কারণ অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে তেলে যে ভিটামিন-ডি তৈরি হল সেটা দেহে পরিশোষিত হবার আগেই তেলটা ধুয়ে চলে গেল এবং তার সঙ্গে ভিটামিনও গেল। ঠাণ্ডা জলেই অনেকটা তেল ধুয়ে যায়, গরম জলে আরও যায়, গরম জলের সঙ্গে যদি সাবান থাকে তাহলে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

গায়ে তেল মাখা নিয়ে অবশ্য ভিন্নমতও আছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, বাইরের তেলে কোনো কাজ হয় না। গায়ে তেল মাখুন আর না-ই মাখুন তাতে কিছু যায়-আসে না; দেহে সূর্যের আলো লাগাতে হবে, তবেই চামড়ার ভিতরকার তেল অর্থাৎ আর্গস্টেরল থেকে শরীরে ভিটামিন-ডি তৈরি হবে।

এ প্রসঙ্গে অ্যাডেল ডেভিস বলেছেন, "Most medical textbooks say that Vitamin D is formed by sunlight on the oils *in* the skin although it was proved years ago [A. C. Helmer and C. H. Jansen, "The Absorption of Vitamin D Through the Skin" and "Vitamin D. Precursors Removed from Human Skin by Washing", *Studies of the Institutum Divi Thomae,* I (1937), 83, 207.] that the oils must first be *on* the skin, then exposed to ultraviolet light, and later absorbed back into the body. If persons take a bath before going into the sunshine, the oils are washed off, and no Vitamin D is formed; if they do not bathe before exposure to sunshine but bathe immediately afterward, the oils are removed before the Vitamin can be absorbed into the body. Most of the oils appear to be washed off by cold water, still larger quantities by warm water, warm soapy water does the job thoroughly."

আধুনিকতার ছোঁয়া লাগার আগে পর্যন্ত আমাদের দেশের পল্লীবালাদের গায়ে অনেক বেশি আলো-হাওয়া লাগতে পারত, ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকত এবং তাদের স্তনে দুধের অভাব হত না। তাদের শিশুসন্তান মাতৃস্তনের দুধেই বড়ো হয়ে উঠত।

আমাদের দেশে এখনও যে অনেক জায়গায় অনেককে নদীর মধ্যে বা নদীর তীরে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সূর্যস্তব করতে দেখা যায় তা থেকে বোঝা যায়, এদেশের প্রাচীনেরা কেবল ধর্মসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে এই রীতির প্রবর্তন করেন নি। পাশ্চাত্য দেশে সমুদ্রের ধারে প্রায় অনাবৃত দেহে সান-বাথ বা রৌদ্রস্নানের রেওয়াজ যে কেবল ফ্যাশন নয় তা-ও অনুমান করা যায়।

আগেই বলেছি, আমাদের খাদ্যে ভিটামিন-ডি থাকে খুব কম। তবু খাদ্য থেকেই ভিটামিন-ডি যতটা পারা যায় সংগ্রহ করতে হবে। ডিমের কুসুমে কিছু ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। হাঁসের ডিমের চেয়ে মুর্গির ডিমেই সাধারণত ভিটামিন-ডি বেশি থাকে। তবে মুর্গির খাদ্যের উপর ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ নির্ভর করে। আবার, মুর্গি যদি বদ্ধ জায়গায় না থেকে রৌদ্রে ছোটাছুটি করে বেড়াতে পারে তাহলে এই ভিটামিন আরও বেশি পাওয়া যায়। হাঁসমুর্গি গুগলি খেতে পেলেও ডিমে ভিটামিন-ডি'র পরিমাণ বাড়ে, কারণ গুগলিতে ভিটামিন-ডি থাকে।

দুধেও খানিকটা ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। কিন্তু এখানেও কথা আছে, —ছায়াচ্ছন্ন খাটালের বদ্ধ গোরু নয়, মাঠে-চরা গায়ে-রোদ-লাগা গোরু হওয়া চাই। ভিটামিন-ডি'র সবচেয়ে ভালো প্রাকৃতিক আধার হল মাছের লিভারের তেল। কড-লিভার অয়েলে প্রচুর ভিটামিন-ডি থাকে।

ফ্যাট না থাকলে রক্তে ভিটামিন-ডি পরিশোষিত হতে পারে না। সুতরাং শিশুদের মাখন-তোলা দুধ খেতে দেওয়া উচিত নয়। শিশুর খাদ্য যখন শুধুই দুধ তখন তাকে মাখন-তোলা দুধ দিলে তার শরীরে ফ্যাটের অভাব ঘটবে। ফলে, ভিটামিন-ডি কাজে লাগবে না, শিশু রিকেটের শিকার হবে। কিছুকাল আগেও শিশুদের কড-লিভার অয়েল খাওয়াবার যে চল ছিল সেটা খুবই ভালো ছিল। যতদিন শিশুর বৃদ্ধি চলে, কড-লিভার অয়েল খাওয়ালে ভালো হয়। কিন্তু সেই কড-লিভার অয়েল সবসময় ফ্রিজারে ঠাণ্ডায় রাখতে হবে। সুন্দর সুষম বৃদ্ধির জন্য অন্তত ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে প্রত্যহ ভিটামিন-ডি সমন্বিত একটা ভালো কিছু খেতে দেওয়া উচিত।

বয়স্কদেরও ভিটামিন-ডি প্রয়োজন। নারীপুরুষনির্বিশেষে প্রত্যহ প্রয়োজন। সারা জীবনই প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায়, প্রসবের পর এবং রজোনিবৃত্তির সময় নারীদের ভিটামিন-ডি বেশি করে প্রয়োজন হয়। রজোনিবৃত্তি অর্থাৎ চিরতরে মাসিক বন্ধের সময় শরীর সাধারণভাবে বেশি ক্যালসিয়ম পায় না,

যেটুকু পায় তা যাতে অন্ত্র থেকে পরিশোষিত হতে পারে তার জন্য ভিটামিন-ডি দরকার।

আবার, যাঁরা সূর্যের আলো থেকে দূরে বদ্ধ ঘরে কিংবা রাত্রে কাজ করেন এবং যাঁরা সারাক্ষণ সারা গা কাপড়চোপড়ে ঢেকে রাখেন, সূর্যের আলো যাঁদের স্পর্শ করতে পারে না তাঁদের কিছু বেশি ভিটামিন-ডি দরকার হয়।

ক্যালসিয়ম সহজে দ্রবীভূত হয় না। খাদ্যের ক্যালসিয়ম যদি দ্রবীভূত না হয় তাহলে তা অন্ত্রের ভিতর থেকে যায় এবং পরে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। টিস্যুতে ক্যালসিয়মের যোগান বাড়ানোর সহজ উপায়, ক্যালসিয়ম আছে এমন খাদ্য বেশি করে খাওয়া কিংবা বেশি করে ভিটামিন-ডি খাওয়া। তবে মনে রাখতে হবে, অত্যধিক ভিটামিন-ডি'তে বিষক্রিয়া হতে পারে এবং তার উপসর্গ বহুবিধ—দুর্বলতা, শ্রান্তি, বমি, পেট খারাপ, পেটে খিঁচুনি, মাথাধরা, মাথা ঝিমঝিম করা এবং হাড়ের খনিজ পদার্থ লোপ পাওয়া। রক্তে ক্যালসিয়মের পরিমাণ বেশি হয়ে যাওয়ায় রক্তের চাপও বেড়ে যায় এবং টিস্যুতে ক্যালসিয়ম জমে। অত্যধিক ভিটামিন-ডি'র জন্য যে বিষক্রিয়া হয় তার প্রায় সবটাই হয় বিকিরণের সাহায্যে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন-ডি'র জন্য। মাছের লিভার কিংবা মাছের লিভারের তেলে যে ভিটামিন-ডি থাকে সেই ভিটামিন-ডি'র কারণে কখনও বিষক্রিয়া হতে দেখা যায় না।

ভিটামিন-ই চিকিৎসকদের কাছে অনেকটা অবহেলিত। কিন্তু ভিটামিন-ই'র প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। খাদ্যে যদি ভিটামিন-ই না থাকে তাহলে পুরুষ তার পুরুষত্ব হারায়, নারী গর্ভধারণ করলেও গর্ভস্থ ভ্রূণ অকালে মারা যায় কিংবা অপূর্ণকালে সন্তান প্রসব করে এবং সেই সন্তান প্রসূত হয় বহু বিকলতা ও বিকৃতি নিয়ে, যেমন—অপূর্ণবর্ধিত হৃৎপিণ্ড, নষ্ট মস্তিক ফুসফুস আর কিডনি এবং ক্ষুদ্র ও অস্বাভাবিক চোখ। পূর্ণবয়স্করা ভিটামিন-ই'র অভাবে বহুবিধ উপসর্গের কবলে পড়তে পারে, যেমন—রক্তাল্পতা, প্রস্টেটগ্রন্থির বৃদ্ধি, লিভার ও কিডনির গোলযোগ ইত্যাদি। অকালে তাদের দেহে বার্ধক্য নেমে আসতে পারে। মাসকিউলার ডিস্ট্রফির মতো মারাত্মক রোগেও আক্রান্ত হতে পারে। তবে সুখের কথা, মানুষের দেহে ভিটামিন-ই'র অভাব বড়ো একটা হয় না।

ভিটামিন-ই খাদ্যের মধ্যে নানা আকারে পাওয়া যায় এবং তা মিক্সড টোকোফেরল নামে পরিচিত। ভিটামিন-ই পাওয়া যায় সমস্ত দানাশস্যের,

বাদামজাতীয় ফলের ও বীজের তেলে। একমাত্র আলফা টোকোফেরল ছাড়া ভিটামিন-ই বাতাসের সংস্পর্শে এলে কি উত্তপ্ত করলে অথবা খুব ঠাণ্ডায় রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যখন কোনো জিনিস তেলে ভাজি তখন সেই তেলের শতকরা অন্তত ৯৮ ভাগ মিক্সড টোকোফেরল নষ্ট হয়ে যায়। রাসায়নিক উপায়ে নিষ্কাশিত তেলে, অত্যধিক সাদা ময়দায় এবং প্যাক করা শস্যে ভিটামিন-ই'র বিন্দুবিসর্গও থাকে না। এই অবস্থায় ভিটামিন-ই আমরা পেতে পারি কেবল বাদামজাতীয় ফলে, টাটকা অঙ্কুরিত ছোলায়, অনুত্তাপে নিষ্কাশিত তেলে, জাঁতায় পেষা আটায় আর তণ্ডুলজাতীয় শস্যে।

মনে রাখা দরকার, পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-ই খেলেও শরীরে কাজে লাগবে না যদি-না তা অন্ত্রের ভিতর গিয়ে সেখানে কোনো ফ্যাট আর পিত্তরসের সাক্ষাৎ পায়। অর্থাৎ, ভিটামিন-ই পরিশোষণের জন্য অন্ত্রের ভিতর ভিটামিন-ই'র সঙ্গে ফ্যাট আর পিত্তরস দুই-ই থাকা চাই। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের যদি কেবল মাখন-তোলা দুধ খাওয়ানো হয় তাহলে তাদের রক্তে এই ভিটামিন পৌঁছয় না।

ভিটামিন-ই'র অভাবে নানারকম উপসর্গ দেখা দিলেও শরীরে তার কাজ কিন্তু একটাই—অকসিজেনের হাত থেকে অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফ্যাট জাতীয় পদার্থগুলিকে রক্ষা করা। অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ফ্যাট জাতীয় পদার্থ অকসিজেনের সংস্পর্শে এলে নষ্ট হয়ে যায়। ফ্যাট জাতীয় পদার্থ বলতে প্রধানত ভিটামিন-এ, ক্যারোটিন, অত্যাবশ্যক অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পিটুইটারি, অ্যাড্রিন্যাল ও যৌন হরমোন। মজার ব্যাপার, অকসিজেনের কবল থেকে তাদের রক্ষা করতে গিয়ে ভিটামিন-ই নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়।

দেহের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়স গঠনের জন্য ভিটামিন-ই দরকার। বিভিন্ন ভিটামিন, হরমোন এবং ফ্যাটি অ্যাসিডকে অনর্থক অকসিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে না দিয়ে ভিটামিন-ই আমাদের শরীরে অকসিজেনের চাহিদা প্রচণ্ড রকম কমিয়ে দেয়। ভিটামিন-ই'র অভাবে অকসিজেন ঐসব পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হলে অনেক অকসিজেন অপচয় হত এবং আমাদের আরও অকসিজেনের দরকার পড়ত।

সমস্ত শিশুই ফ্যাটে-দ্রবীভূত-হয় এমন ভিটামিন কম নিয়ে জন্মায়, যেমন—ভিটামিন-এ, ডি, ই এবং কে। কিন্তু প্রসূতির দেহে যদি ভিটামিন-ই'র অভাব ঘটে তাহলে অকালপ্রসব হতে পারে। ভিটামিন-ই অকালপ্রসবের একটা

বড়ো কারণ। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন তার পরিবেশে অকসিজেন থাকে কম, কম অকসিজেনেই সে বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ভূমিষ্ঠ হবার পর যখন সে খোলা বাতাসে নিশ্বাস নেয় তখন অকসিজেন-সমুদ্রে পড়ে একটা ধাক্কা খায়। যত বেশি অকসিজেনের মধ্যে পড়ে তত তাড়াতাড়ি তার দেহের অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড নষ্ট হয় এবং অতি দ্রুত তার দেহকোষ ভাঙতে থাকে। এই সামূহিক বিপদের কারণ, ভিটামিন-ই'র অভাব। ভিটামিন-ই'র অভাবেই তার দেহের অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে দেহকোষ ভাঙতে শুরু করে।

প্রসূতিকে যদি আগে থাকতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-ই দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে প্রসবের পর শিশু বাতাসের অকসিজেনের সংস্পর্শে আসামাত্র তার রক্তের লোহিত কণিকা এত বেশি সংখ্যায় ভাঙতে শুরু করে যে, অনেক সময় জণ্ডিসরোগ হতে দেখা যায়। তবে সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে ভিটামিন-ই দেওয়া আরম্ভ করলে অচিরেই রোগ সেরে যায়।

শিশুদের রক্তাল্পতা-রোগের প্রধান কারণ, ভিটামিন-ই'র অভাব। মা গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-ই খেলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কৌটোর বেবিফুডেও অনেক সময় প্রয়োজনানুযায়ী ভিটামিন-ই থাকে না বলে যেসব শিশু কেবল কৌটোর দুধ খায় তাদের অনেকে রক্তাল্পতা-রোগে ভোগে। মাতৃস্তন্যের দুধে এই সমস্যা নেই।

ভিটামিন-ই'র অভাবজনিত রক্তাল্পতা-রোগ যে কোনো বয়সেই হতে পারে। তবে বয়ঃসন্ধিকালে, রজোনিবৃত্তির সময়ে এবং গর্ভাবস্থাতেই এই ধরনের রক্তাল্পতা বেশি দেখা যায়। শৈশবে তো যায়ই। এখানে উল্লেখ করা দরকার, কেবল উপসর্গ দেখেই ভিটামিন-ই'র অভাবজনিত রক্তাল্পতা কি লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা তা বোঝা যায় না। শরীরে ভিটামিন-ই'র অভাব আছে কিনা পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত বলা যায় না, এই রক্তাল্পতা ভিটামিন-ই'র অভাবজনিত রক্তাল্পতা কিনা। সুতরাং কেবল উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করলে বিভ্রাট বাধার আশঙ্কা।

ভিটামিন-ই'র অভাবে রক্তের লোহিত কণিকা যেমন সহজে ভেঙে যায় তেমনি সহজেই ভাঙে পেশীর কোষ। অন্তঃসত্ত্বা নারী ভিটামিন-ই না খেলে তার সন্তান এমন দুর্বল পেশী নিয়ে জন্মায় যে, ঘাড়ের উপর মাথা শক্ত হয়ে থাকতে পারে না, নড়বড় করে। এই ধরনের শিশুর বসতে, হামাগুড়ি দিতে,

দাঁড়াতে এবং হেঁটে বেড়াতে সাধারণত দেরি হয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভিটামিন-ই'র প্রভাবে পুরুষের শুক্রাণু-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শুক্রাণুর উৎকর্ষ ও চলনক্ষমতাও বাড়ে; আর নারী গর্ভপাত এবং অকাল-প্রসবের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণকালে সুস্থ সবল শিশু প্রসব করে।

ভিটামিন-ই না পেলে অবিরাম অকসিজেন নষ্ট হয়, ফলে শরীরে অকসিজেনের চাহিদা প্রচণ্ড রকম বেড়ে যায়। ভিটামিন-ই'র ক্রিয়ায় ব্যথাবেদনা দূর হয় এবং কাটা ঘা আর পোড়া ঘায়ের জায়গায় চিহ্ন থাকে না। বহু রোগপ্রতিরোধে ও রোগের প্রতিকারে এই ভিটামিন প্রায় অলৌকিক ফল দেয়। যাঁরা গর্ভনিরোধক পিল খান তাঁদের ভিটামিন-ই'র দরকার বেশি। ক্যান্সার এবং করোনারি থ্রম্বোসিস প্রতিরোধেও ভিটামিন-ই'র একটা ভূমিকা আছে বলে অনুমান করা হয়। সংরক্ষিত খাদ্যে অনেক সময় নানারকম ক্ষতিকর পদার্থ থাকে। সাধারণ খাদ্যেও কিছু কীটনাশক পদার্থ এবং রাসায়নিক সারের নাইট্রাইট ও নাইট্রেট এসে যায়। শিল্পজাত কিছু বিষ এবং ওষুধের বিষও আমাদের শরীরে অহরহ প্রবেশ করে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রচুর ভিটামিন-ই পেলে লিভার এইসব বিষ নষ্ট করে দিতে পারে। আর না পেলে লিভারের ক্ষতি প্রায় অনিবার্য। ভিটামিন-ই'র অভাবে সমস্ত রকম পিট্যুইটারি হরমোন তৈরি কমে যায়—পিট্যুইটারি গ্রোথ হরমোন, অ্যাড্রিন্যালকে উত্তেজিত করার হরমোন এবং থাইরয়েড ও যৌন গ্রন্থির উত্তেজক হরমোন। যদি না-ও কমে এবং স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়—তবু ভিটামিন-ই'র যোগান কম হলে পিট্যুইটারি, অ্যাড্রিন্যাল এবং যৌন হরমোন নষ্ট হয়ে যায়।

অনেকের ধারণা, নারীর স্তন যে ক্রমশ ছোটো হয়ে যাচ্ছে এবং নিতম্বের আয়তন হ্রাস পাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ, খাদ্যে ভিটামিন-ই'র অভাব। খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন-ই না থাকায় পিট্যুইটারি এবং যৌন গ্রন্থি ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না বলে ঐ বিপত্তি। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, বিপত্তি বাড়তে বাড়তে এমন এক সময় আসবে যখন বাইরে থেকে নারীপুরুষে আর হয়তো প্রভেদ করা যাবে না।

ভিটামিন-ই'র অবর্তমানে অকসিজেন সংযোজক-কলা আর কোষপ্রাচীরের অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড নষ্ট করে দেয়। ফলে, ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া আর অ্যালার্জেন টিস্যুর ভিতরে প্রবেশ করার মুক্তপথ পেয়ে যায় এবং দেহ হয় ব্যাধির আধার। শিশুরা সাধারণত ভিটামিন-ই পায় না, কিন্তু এটা জানা কথা

যে, ভিটামিন-ই'র রক্ষাহাত ছাড়া ভিটামিন-এ বাঁচে না। সেই কারণে শিশুরা বড়ো বেশি রোগের শিকার হয়।

ভিটামিন-ই'র দৈনিক চাহিদা কখনও স্থির থাকে না। এক-একজনের এক-একরকম চাহিদা এবং অবস্থাবিশেষে সেই চাহিদার হেরফেরও হয়। শারীরিক বা মানসিক চাপ বেশি হলে, তেল-ঘি প্রভৃতি স্নেহপদার্থ বেশি খেলে, অনেকদিন এই ভিটামিন ঠিকমতো না খাওয়া হয়ে থাকলে, রজোনিবৃত্তি ঘটলে এবং যৌন হরমোন খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ভিটামিন-ই'র চাহিদা বেড়ে যায়। এই হরমোন সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায় যে, বেশি খেলে ক্ষতি হয় না।

সতের : খনিজ, কিন্তু খনি থেকে নয়

অ্যাডেল ডেভিস ক্যালসিয়মের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "Calcium can be as soothing as a mother, as relaxing as a sedative, and as life-saving as an oxygen tent."

কথাটার বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত সত্য। ক্যালসিয়মের সামান্য অভাবে জীবন যে কী দুর্বহ হয়ে উঠতে পারে, ভাবা যায় না। আমাদের দেহে যত ক্যালসিয়ম আছে তার শতকরা ৯৯ ভাগ আছে হাড়ে আর দাঁতে অর্থাৎ শক্ত জায়গায় এঁটে। কিন্তু নার্ভ আর কোমল টিস্যুতেও ক্যালসিয়ম আছে—এবং সেই ক্যালসিয়ম যদি কম হয়ে যায় তাহলে জীবন হয়ে ওঠে অসহনীয়।

আমাদের নার্ভে যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় তার পরিবহণে ক্যালসিয়ম দরকার। নার্ভ তার প্রয়োজনমতো ক্যালসিয়ম যদি না পায় তাহলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার ফলস্বরূপ মেজাজ খিটখিটে হয়। শুধু তা-ই নয়, শরীরে ক্যালসিয়মের অভাব হলে শক্তির অপচয় হয় এবং পরিশ্রমের তুলনায় বেশি ক্লান্তিবোধ হয়। আবার, রক্তে ক্যালসিয়ম অস্বাভাবিক রকম বেশি হয়ে গেলে একটা অস্বাভাবিক তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়, কখনও কখনও গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হতে হয়। তখন বৈদ্যুতিক স্পন্দনে নার্ভ এবং পেশীর উত্তেজিত হবার ক্ষমতাও কমে যায়।

যাঁদের খাদ্যে ক্যালসিয়ম কম তাঁদের পেটে সাধারণত বেশি বাতাস ঢোকে। এই ধরনের লোকেরা প্রায়শ তাড়াতাড়ি কথা বলেন, তাতে অনেকসময় গলা দিয়ে পাকস্থলীতে বাতাস ঢোকে। আবার, ঘন ঘন ঢোক গেলার দরুন পাকস্থলীতে লালার সঙ্গে কিছুটা বাতাসও যায় এবং লোভার্ত শিশুর মতো তাড়াতাড়ি গবগব করে খাওয়ার দরুন খাদ্যের সহযাত্রী হয় বাতাস। পেটের ভিতর এইভাবে বাতাস জমে বেশ গণ্ডগোল বাধায়। বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে। পাকস্থলীতে আগের যে খাবার অবশিষ্ট থাকে তাতে অনেকসময় কিছু-না-কিছু উদ্বায়ী তেল থাকে, বিশেষ করে পেঁয়াজ রসুন কাঁচালঙ্কা ইত্যাদির তেল। সেই তেল বাতাসের বুদ্বুদের মধ্যে ঢুকে যায় এবং যখনই ঢেকুর ওঠে তখনই তার স্বাদ পাওয়া যায় আর তাতে মনে হয় বদহজম হয়েছে। কিন্তু আসলে এটা বদহজমের ব্যাপার নয়। তবু লোকে বদহজম মনে করে হজমের জন্য তখন

সোডা খায়। সোডার কার্বন ডাই-অকসাইডের চাপে পাকস্থলীর উপরদিককার ভ্যাল্‌ভ্‌ খুলে যায় এবং তার ফলে গ্যাস আর বাতাস সমানভাবে বেরিয়ে গিয়ে শরীরে স্বস্তি আনে। কিন্তু কষ্ট দেয় অন্যভাবে। পাকস্থলীতে যে অতি প্রয়োজনীয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে, সোডার ক্রিয়ায় তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে, খাদ্যে সামান্য ক্যালসিয়ম থাকলেও তা অকেজো হয়ে যায়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অভাবে ক্যালসিয়ম দ্রবীভূত হতে পারে না, রক্তে তার মেশার পথ বন্ধ হয়ে যায়। আবার, নানাভাবে গিলে ফেলা বাতাস কখনও কখনও অন্ত্রের ভিতরও চলে যায় এবং শরীরের উত্তাপে প্রসারিত হয়ে আয়তনে বাড়ে। তাতে পেট ফাঁপে, এমন কি ব্যথাও হয়।

ক্যালসিয়মের অভাবে অনেকসময় অনিদ্রারোগ হয়। অনিদ্রারোগের সহজ প্রতিকার হিসাবে অনেকে স্লিপিং পিল খান। অভ্যাসে পরিণত হলে স্লিপিং পিলে অপরিমেয় ক্ষতি হয়, একথা জানা সত্ত্বেও তখন স্লিপিং পিল ছাড়া শক্ত হয়। অথচ ছেলেবেলায় মা-ঠাকুমার কাছে অনেকেই শুনেছেন, শোবার আগে এক গেলাস গরম দুধ খেলে ভালো ঘুম হয়। আমাদের খাদ্যের মধ্যে দুধেই সবচেয়ে বেশি ক্যালসিয়ম আছে। ঠাণ্ডা দুধের চেয়ে গরম দুধই পরিপাকের পক্ষে ভালো। দুধের ভিতর যে ক্যালসিয়ম আছে তাতে নার্ভ প্রশমিত হয়। তখন ধীরে ধীরে ঘুম আসার পথ প্রশস্ত হয়।

ক্যালসিয়মের অভাবে মাংসপেশীতে যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপ সৃষ্টি হতে পারে। রক্তে ক্যালসিয়ম প্রচণ্ড রকম কমে গেলে ধনুষ্টঙ্কারের মতো আক্ষেপ সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। যৌবনে পদার্পণোদ্যত কিশোরকিশোরীরা প্রচুর ক্যাল-সিয়ম না পেলে উদ্ধত, একগুঁয়ে ও রাগী হয়ে ওঠে।

রক্ত জমাট বাঁধার ব্যাপারেও ক্যালসিয়মের প্রচণ্ড ভূমিকা আছে। দুর্ঘটনায় রক্তক্ষরণের সময় যদি রক্ত জমাট বাঁধা না যায় তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ক্যালসিয়মের ভূমিকা তখন অপরিসীম। ক্যালসিয়ম দেহের কোষপ্রাচীরের ভেদ্যতা কমিয়ে দিতে পারে বলে অ্যালার্জিন, ভাইরাস প্রভৃতি ক্ষতিকর পদার্থ কোষের ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। ক্যালসিয়মের আরও বহু ভূমিকা আছে।

ক্যালসিয়মের অভাবে দাঁতের ক্ষয় ও হাড়ের খনিজ পদার্থের বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত হয়, কেবল ভিটামিন-ডি দিয়ে সে পথ রুদ্ধ করা যায় না। ভিটামিন-ডি'র সঙ্গে ক্যালসিয়মও দরকার।

আমাদের সমস্ত খাদ্যের মধ্যে দুধেই বেশ কিছুটা ক্যালসিয়ম পাওয়া যায়। দুধ দিয়ে তৈরি দইতেও সমান পরিমাণ পাওয়া যায়। কিছু তরিতরকারি আর ফলে পাওয়া যায় যৎসামান্য। কিন্তু ছোটো ছোটো মাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে খেলে প্রচুর ক্যালসিয়ম পাওয়া যায়।

ক্যালসিয়ম ট্যাবলেট কিংবা পাউডার যদি খেতে হয় তাহলে দুধ কিংবা ফলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াই ভালো। আবার, ক্যালসিয়ম সমন্বিত বিভিন্ন ট্যাবলেট আর পাউডারের মধ্যে ক্যালসিয়ম গ্লুকোনেট আর ক্যালসিয়ম ল্যাকটেট কিংবা গ্লুকোজ আর ল্যাকটোজের সঙ্গে সংমিশ্রিত ক্যালসিয়মই ভালো, বিশেষ করে বিশোষণের পক্ষে। ক্যালসিয়ম খুব বেশি বিশোষিত হতে চায় না, স্বাভাবিক অবস্থাতেও না। অন্ত্রের ভিতর থেকে অন্ত্রের গা ভেদ করে রক্তে গিয়ে মেশার আগে ক্যালসিয়মকে পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হতে হয়। এখন, দুধের সঙ্গে ক্যালসিয়ম খেলে দুধের ভিতরকার ল্যাকটোজ আন্ত্রিক ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় ল্যাকটিক অ্যাসিডে ভেঙে যায়, তার ফলে ক্যালসিয়ম-বিশোষণ বেড়ে যায়। ফ্যাটেও ক্যালসিয়ম-বিশোষণ বাড়ে। সেই কারণে শিশুদের মাখন-তোলা দুধ না দেওয়াই ভালো।

প্রসঙ্গত একটা কথা মনে রাখা দরকার, খাদ্যে যদি অত্যধিক ফসফরস থাকে তাহলে প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর ক্যালসিয়ম বেরিয়ে যায়। প্রতিটি দেহ-কোষের জীবনপ্রক্রিয়ায় ফসফরস অতি প্রয়োজনীয়। দাঁত এবং হাড় ঠিক রাখতে ফসফরসের সঙ্গে ক্যালসিয়মের রাসায়নিক সংযোগ অত্যাবশ্যক। এখন, ফসফরসের তুলনায় ক্যালসিয়ম যদি পরিমাণে কম হয়ে যায় তাহলে ফসফরস সংযুক্ত হবার মতো কিছু না পেয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। যা-ই হোক, রক্তে কিন্তু সব সময় ক্যালসিয়ম থাকতেই হবে। যদি আমরা ক্যালসিয়ম সমন্বিত খাদ্য না খাই তাহলে রক্ত হাড় থেকে ক্যালসিয়ম টেনে নেয়। আবার, ঐ যে প্রস্রাবের সঙ্গে ফসফরস বেরিয়ে যায়, সে কিন্তু শুধু ফসফরস নয়—ক্যালসিয়ম-ফসফরস লবণ। অর্থাৎ, ফসফরসের সঙ্গে বেশকিছু ক্যালসিয়মও চলে যায়। শরীরে ক্যালসিয়ম ও ফসফরস দুই-ই দরকার অথচ দুটি পদার্থই হিসাবের ভুলে শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই কারণে ফসফরস সমন্বিত কোনো ক্যালসিয়ম সল্ট বা লবণের পরিবর্তে ক্যালসিয়ম গ্লুকোনেট কিংবা ক্যালসিয়ম ল্যাকটেট খাওয়াই ভালো।

আমাদের শরীরে এমনিতেই ক্যালসিয়মের পরিমাণ কম, স্থতরাং অত্যধিক ফসফরস সমন্বিত খাদ্য খেলে ক্যালসিয়ম গ্লুকোনেট অথবা ক্যালসিয়ম ল্যাকটেট খাওয়া দরকার। নইলে ক্যালসিয়মের তুলনায় ফসফরসের পরিমাণ এত বেশি হয়ে যাবে যে, প্রস্রাবের সঙ্গে বাড়তি ফসফরস বেরিয়ে গিয়ে শরীরে সাঙ্ঘাতিক রকমের ক্যালসিয়ম-ঘাটতি সৃষ্টি করবে।

দুধ ছাড়া মাছ আর নটে পালং সজনে কুমড়ো প্রভৃতি শাকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়ম পাওয়া যায়।

ক্যালসিয়মের মতো ম্যাগনেসিয়মও শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। নার্ভের উপর এই মৌলিক ধাতব পদার্থের প্রচণ্ড প্রভাব। শরীরে ম্যাগনেসিয়মের সামান্য অভাবেই মেজাজ খিটখিটে হয়, শব্দ সহ্য করতে কষ্ট হয় এবং সহজেই অত্যধিক উত্তেজনা হয়। অভাব যদি বেশি হয় কি বেশিদিন চলে তাহলে অনেক কঠিন উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন—পেশীতে টান ধরা, হাত কাঁপা, নাড়ির স্পন্দন অনিয়মিত হয়ে যাওয়া, পায়ে খিঁচুনি ধরা এবং ঘুম না হওয়া। তখন মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও মাংসপেশী সবকিছুরই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরীরে ম্যাগনেসিয়মের খুব বেশি অভাব হলে মস্তিষ্কই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে, চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে যায়, সবকিছু গোলমাল ঠেকে, অবসাদ আসে এবং বিকারের ঘোরে ভয়ঙ্কর সব হ্যালুসিনেশন দেখা যায়। এ সবকিছুরই প্রতিকার হতে পারে ম্যাগনেসিয়মের কল্যাণে। অনেক বয়স্ক লোকও রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলেন; মূত্রথলি ম্যাগনেসিয়মের অভাবে দুর্বল হয়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারায় বলেই সাধারণত এই অঘটন ঘটে। এই রোগও ম্যাগনেসিয়মের সাহায্যে নিরাময় করা যায়।

ম্যাগনেসিয়ম দেহকোষের ভিতরে থাকে বলে তার অভাব সহজে ধরা সম্ভব হয় না। পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাগনেসিয়ম না থাকলে কোষের ভিতর পটাসিয়ম ধরে রাখা যায় না। অনুসন্ধানে জানা গেছে, যাঁদের খাদ্যে ম্যাগনেসিয়ম বেশি তাঁদের সাধারণত হৃদরোগ এবং আর্টারিওসক্লেরোসিস অর্থাৎ ধমনীর কাঠিন্য রোগ হয় না। রক্তের কোলেস্টেরল কমাতেও ম্যাগনেসিয়ম সাহায্য করে। আর্থ্রাইটিস, বার্সাইটিস, স্ক্লেরোডার্মা এবং আরও যেসব রোগে ক্যালসিয়ম জমার দরুন ব্যথা হয় সেইসব রোগের চিকিৎসায় সাধারণত অধিক ক্যালসিয়ম-যুক্ত খাদ্য দেওয়া হয় না। কিন্তু এতে ভুল করা হয়। বিশেষজ্ঞদের কথা, এইসব রোগে পর্যাপ্ত পরিমাণে

ক্যালসিয়ম আর ম্যাগনেসিয়ম না দিলে রোগের উপশম সুদূরপরাহত।

অনেক উদ্ভিজ্জ খাদ্যে ম্যাগনেসিয়ম আছে সত্যি, কিন্তু কতখানি আছে তা নির্ভর করে কী রকম মাটিতে ঐ উদ্ভিদের জন্ম তার উপর। জমিতে যদি রাসায়নিক সার দেওয়া থাকে (বিশেষ করে, চুন দেওয়া জমিতে) তাহলে ঐ সহজে-দ্রবণীয় সারে জমির ভিতরকার জলীয় বাষ্প তাড়াতাড়ি এত সংপৃক্ত হয়ে ওঠে যে, জমির রসে ম্যাগনেসিয়ম পরিশোষিত হয় না, ফলে উদ্ভিদ সেই ম্যাগনেসিয়ম নিতে পারে না। পরিণামে, ফসলে ম্যাগনেসিয়ম পাওয়া যায় না। কিন্তু জমিতে যদি রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা না হয়ে থাকে এবং জমিতে যদি প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়ম সমন্বিত ডোলোমাইট কি অন্য কোনো পদার্থ থাকে তাহলে ফসলে অনেক বেশি ম্যাগনেসিয়ম পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে, সেই ফসল যদি জলে ভিজিয়ে কি জলে সিদ্ধ করে জলটা ফেলে দেওয়া হয় তাহলে জলের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়মও চলে যায়। বেশি ম্যাগনেসিয়ম না খেলে উদরাময়ে, কিডনির অসুখে, বহুমূত্ররোগে, মূত্রবর্ধক ওষুধে কিংবা মদ্যপানে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়ম বেরিয়ে গিয়ে শরীরে ম্যাগনেসিয়মের অভাব ঘটাতে পারে। সুতরাং যাঁরা নিয়মিত অধিক পরিমাণে মদ্যপান করেন এবং ম্যাগনেসিয়ম সমন্বিত খাদ্য খান না তাঁরা হৃদরোগ ডেকে আনেন।

ম্যাগনেসিয়ম শরীরের প্রতিটি কোষের জন্য দরকার, এমন কি মস্তিষ্ককোষের জন্যও। প্রোটিনের সংশ্লেষণে, ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেটের সদ্ব্যবহারে এবং শত শত এনজাইমের, বিশেষ করে শক্তি-উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত এনজাইমের কাজে ম্যাগনেসিয়ম অতিপ্রয়োজনীয়। এইসব এনজাইমের অধিকাংশেই ভিটামিন-বি৬ থাকে, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়ম না পেলে এই ভিটামিন ঠিকমতো পরিশোষিত হতে পারে না। ফলে, শরীরে ম্যাগনেসিয়মেরই ঘাটতি হোক কি ভিটামিন-বি৬য়ের, উপসর্গ একই সৃষ্টি হয়—আক্ষেপ, কাঁপুনি, অনিদ্রা, কিডনিতে পাথর এবং আরও বহুবিধ।

শিশুর খাদ্যে ম্যাগনেসিয়মের অভাব হলে শিশু অনেক সময় সামান্য শব্দেও কেঁপে ওঠে, ঠিকমতো ঘুমোয় না, খুব ছটফট করে, মাংসপেশীতে আক্ষেপের কারণে কাঁদে। অবিরাম শরীর থেকে ক্যালসিয়ম বেরিয়ে যাবার দরুন হাড়েও বড়ো রকমের অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়।

শরীরে ম্যাগনেসিয়মের অভাব হলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়ম প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বলে ম্যাগনেসিয়মের অভাবজনিত উপসর্গ আর ক্যালসিয়মের

অভাবজনিত উপসর্গ প্রায় এক। আবার, ম্যাগনেসিয়ম-ঘাটতির সময় প্রস্রাবের সঙ্গে যে অত্যধিক ক্যালসিয়ম বেরিয়ে যায় তাতে মনে হয়, কিডনিতে পাথর সৃষ্টির পিছনে ক্যালসিয়ম-ঘাটতির একটা ভূমিকা আছে। খাদ্যে ম্যাগনেসিয়ম কিংবা ভিটামিন-বি৬য়ের অভাব থাকলে কিডনিতে পাথর জমতে দেখা গেছে।

ম্যাগনেসিয়ম সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বাদামজাতীয় ফলে, সয়াবীনে আর রান্না-করা সবুজ শাকপাতায়। তবে দেখতে হবে, সেসব যেন রাসায়নিক সার দেওয়া জমিতে না হয়ে থাকে এবং সিদ্ধ করার পর জলটা ফেলে না দিয়ে যেন রান্নায় দেওয়া হয়।

শরীরে ম্যাগনেসিয়মের চাহিদা হয় ক্যালসিয়মের অনুপাতে। সাধারণত, ম্যাগনেসিয়মের দ্বিগুণ ক্যালসিয়ম দরকার হয়। শিশু, গর্ভবতী নারী এবং অসুস্থ লোকদের বেশি ম্যাগনেসিয়ম দরকার। রোগ সারার সময়ও বেশি দরকার। আবার, নারীর চেয়ে পুরুষের দরকার বেশি। ম্যাগনেসিয়ম কার্বোনেট, ম্যাগনেসিয়ম বাই-কার্বোনেট, ম্যাগনেসিয়ম অকসাইড, ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড বা ম্যাগনেসিয়ম সালফেটও খাওয়া যেতে পারে। যাঁদের হজমের গোলমাল আছে তাঁদের ম্যাগনেসিয়ম অকসাইড না খাওয়াই ভালো, কারণ ম্যাগনেসিয়ম অকসাইড পাকস্থলীর ভিতরকার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নষ্ট করে দিয়ে হজমের আরও গোলমাল ঘটাতে পারে।

লোহা, প্রোটিন, আয়োডিন, কোবল্ট, তামা, ভিটামিন-ই অথবা যে কোনো বি-ভিটামিন, বিশেষ করে ফোলিক অ্যাসিড, নায়াসিন কিংবা ভিটামিন-বি৬য়ের অপর্যাপ্ততার কারণে অ্যানিমিয়া অর্থাৎ রক্তাল্পতা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, সুস্থ রক্ত তৈরিতে প্রতিটি পুষ্টিদ্রব্যেরই কিছু-না-কিছু ভূমিকা আছে। অনেক রক্তাল্পতাই লোহার সাহায্যে দূর করা যেতে পারে।

লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে। একজন সুস্থ মানুষের দেহে প্রতি মিনিটে এইরকম প্রায় ১০০ কোটি লোহিত কণিকা তৈরি হয়। এক ঘন-মিলিমিটার রক্তে সাধারণত ৫০ লক্ষ মতো লোহিত কণিকা থাকে এবং একে 'ব্লাড কাউন্ট' বলে। প্রতিটি কণিকার ভিতরই কিছু পরিমাণ লাল রঞ্জক পদার্থ থাকে, তাকে বলে হিমোগ্লোবিন। এই হিমোগ্লোবিনই অকসিজেন বহন করে। হিমোগ্লোবিন অকসিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গোটা শরীরের কোষে

কোষে অকসিজেন পৌঁছে দেয়। লোহিত কণিকায় যদি হিমোগ্লোবিন না থাকে কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে তাহলে সেটা অসুস্থতার লক্ষণ। সাধারণত ১০০ সিসি রক্তে ১৫ গ্র্যাম মতো হিমোগ্লোবিন থাকা দরকার। ব্লাড কাউন্ট যদি ৪০ লক্ষের নিচে নেমে যায় কিংবা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ যদি ১২ গ্র্যামের কম হয় তাহলে রক্তাল্পতা হয়েছে বুঝতে হবে। রক্তাল্পতায় ব্লাড কাউন্ট এবং হিমোগ্লোবিন দুই-ই নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কমে যেতে পারে।

নারী, শিশু এবং যৌবনে-পদার্পণোদ্যত বালকবালিকাদের মধ্যে লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা খুব বেশি দেখা যায়। তার একটা কারণ, নারীর রজঃস্রাব হয়, শিশুদের শরীর বাড়ে। পুরুষের সাধারণত রক্তাল্পতা হবার কথা নয়, অবশ্য যদি কোনো কারণে রক্তপাত ঘটে তাহলে হতে পারে। যাঁরা খাদ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে পরের প্রাণ বাঁচাতে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার রক্ত দেন তাঁরা নিজেদের দেহেই রক্তের অভাব ঘটিয়ে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে তোলেন। অ্যানিমিয়া অর্থাৎ রক্তাল্পতা বলতে সাধারণভাবে বোঝায়, দেহে যথেষ্ট পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা কিংবা হিমোগ্লোবিন তৈরি হতে পারছে না। যদি কেবল লোহার অভাব হয় তাহলে লোহিত রক্তকোষের সংখ্যা মোটামুটি ঠিকই থাকে, কিন্তু রক্তকোষের আকার ছোটো হয়ে যায় এবং হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও কমে যায়। এই ধরনের লোক যথেষ্ট অকসিজেন পায় না, তার দেহে শক্তি-উৎপাদন কমে যায়। ফলে, শরীরে দুর্বলতা আসে, একটু পরিশ্রমেই শ্বাসকষ্ট হয়, হয়তো মাথা ঝিমঝিম করে, বুক ধড়ফড় করে, সব সময় একটা ক্লান্তি বোধ হয়। অনেক সময় হাতের আঙুলের নখ একটুতেই ভেঙে যায়, নখের গায়ে লম্বা লম্বা শিরা গজায়। এই ধরনের লোকদের দেখতে ফ্যাকাশে হয়। তাদের মস্তিষ্কে যথেষ্ট পরিমাণে অকসিজেন পৌঁছতে পারে না বলে তারা তাড়াতাড়ি চিন্তা করতে পারে না, চিন্তা স্পষ্টও হয় না। তারা ভুলেও যায় তাড়াতাড়ি। তবে উপযুক্ত খাদ্যের সাহায্যে লোহিত রক্তকণিকা আর হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।

রক্তের হিমোগ্লোবিনের জন্য যেমন লোহা দরকার তেমনি অসংখ্য এনজাইম আর পেশীর হিমোগ্লোবিনের জন্যও লোহা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রায় প্রতিটি প্রাকৃতিক খাদ্যেই লোহা পাওয়া যায়। মাংস ডিম ফল শাকসবজি দানাশস্য প্রভৃতি লোহায় ভরপুর। কিন্তু তবু আজ আমাদের শরীরে লোহার অভাব এবং তার দরুন রক্তাল্পতা। লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতার সবচেয়ে

বড়ো কারণ, আটা ময়দা চাল চিনি ইত্যাদি আমাদের সব প্রধান খাদ্য অত্যধিক রিফাইন করা।

মিশ্র খাদ্যে যে পরিমাণ লোহা থাকে, একজন সুস্থ লোকও তার শতকরা ৫০ ভাগের বেশি পরিশোষণ করতে পারে না। শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী একজন লোক যতখানি লোহা পরিশোষণ করতে পারে, করে; বাকিটা মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

খাদ্যের ভিতরকার সমস্ত লোহা পরিশোষণ করা যায় না বলেই বেশি লোহা আছে এমন খাদ্যও বেশি রক্ত তৈরি করতে পারে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মেটে ও কিডনি এবং ডিমে প্রচুর পরিমাণে হিমোগ্লোবিন তৈরি হয়। আবার, শাকপাতার ভিতরকার লোহার অনেকটাই অদ্রবণীয় যৌগের মধ্যে থাকায় পরিশোষিত হয় না। সাধারণভাবে বলা যায়, যে খাদ্যের আঁশ যত নরম সেই খাদ্যের লোহা তত বেশি এবং তত ভালো পরিশোষিত হয়।

এখানেও কথা আছে, লোহা সমন্বিত খাদ্য যখন পরিপাক হয় তখন সেই খাদ্য থেকে মুক্ত লোহা সরাসরি অন্ত্রের প্রাচীর ভেদ করে রক্তে গিয়ে মিশতে পারে না, মুক্ত লোহাকে আগে পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হতে হয়। অতএব রক্তাল্পতা সারাতে গেলে লোহা আছে এমন খাদ্য যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে তেমনি সেইসঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডেরও ব্যবস্থা করতে হবে। দই, ঘোল, লেবু, টক ফল প্রভৃতি যেসব খাদ্যে অ্যাসিড আছে সেইসব খাদ্য লোহার পরিশোষণে সাহায্য করে। এমন কি, দুধেও লোহার পরিশোষণ ভালো হয়, কারণ দুধের মধ্যে যে শর্করা আছে, অন্ত্রের ভিতরকার ব্যাকটিরিয়া তাকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করে। সেই ল্যাকটিক অ্যাসিড লোহার পরিশোষণে সাহায্য করে।

কথা আরও আছে, অ্যাসিড যেমন লোহার পরিশোষণে সাহায্য করে তেমনি অ্যালক্যালি বিঘ্ন ঘটায়। রিফাইন-করা কার্বোহাইড্রেট (যেমন—সাদা ময়দা, পালিশ-করা চাল ইত্যাদি) লোহার পরিশোষণ অনেক কমিয়ে দেয়। তার প্রথম কারণ, এই জাতীয় কার্বোহাইড্রেট অ্যালক্যালিধর্মী পাচক-রসের ক্ষরণ বাড়ায়; দ্বিতীয় কারণ, আমাদের অন্ত্রের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় যেসব ব্যাকটিরিয়া আছে, এই জাতীয় কার্বোহাইড্রেট তাদের জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল নয়।

অধিকাংশ অজৈব লোহাই ভালো পরিশোষণ হয়। এমন কি, লোহার মরচেও। তবে খাওয়ার নিয়ম আছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, সারা রাত ভিনিগারের জলে মরচে-পড়া লোহা ডুবিয়ে রেখে পরদিন সেই জল খেলে কাজ

হয়। আবার, টক আপেলের মধ্যে কতকগুলি মরচে-ধরা পেরেক ঢুকিয়ে সারা রাত রেখে দিয়ে পরদিন পেরেকগুলি বার করে আপেলটা খেলে উপকার পাওয়া যায়।

কিন্তু আধুনিক পুষ্টিবিশেষজ্ঞরা বলেন, অ্যানিমিয়া সারাতে মেটে, ডিম প্রভৃতিই যথেষ্ট, বাড়তি কোনো লোহার লবণ দরকার করে না।

শরীরে লোহা সামান্য কিছু বেশি হয়ে গেলে তা যকৃৎ, অস্থিমজ্জা আর প্লীহার মধ্যে সঞ্চিত থাকতে পারে। পরে কখনও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শরীরে লোহার অভাব ঘটলে সেই সঞ্চিত লোহা বেরিয়ে এসে কাজ চালিয়ে দিতে পারে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শরীরে এই সঞ্চয়ের ব্যবস্থা না থাকলেই সাধারণত অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা দেখা দেয়—লোহার অভাবজনিত রক্তাল্পতা।

লোহিত কণিকা সাধারণত তিন থেকে চার মাস বাঁচে, তারপর প্লীহা আর যকৃৎ তাদের রক্তস্রোত থেকে বার করে আনে এবং শেষে এনজাইম তাদের ভেঙে ফেলে। ভাঙার পর যে লোহা পাওয়া যায় তা নতুন কণিকা তৈরির কাজে লাগে। এইভাবে একই লোহা বার বার ব্যবহার হয় বলে অনেকের ধারণা, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ আর রজোনিবৃত্তির পর সুস্থ সবল নারীর খাদ্যে লোহা থাকাটা খুব আবশ্যক নয়।

শিশুরা যখন বড়ো হতে থাকে, যৌবনে পদার্পণ করে তখন তাদের দেহে রক্তের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়, তখন তাদের লোহার দরকার খুব বেশি। আবার, গর্ভস্থ শিশু মাতৃদেহ থেকে তার প্রয়োজনীয় লোহা টেনে নেয় বলে গর্ভবতী নারীরও লোহার প্রয়োজন অধিক। গর্ভবতী নয়, এমন নারীর লোহার প্রয়োজন নির্ভর করে রজঃস্রাবের পরিমাণের উপর।

নারীর যতদিন সন্তান-উৎপাদনক্ষমতা থাকে ততদিন তার দেহ থেকে কিছু বেশি লোহা বেরিয়ে যায়ঃ (১) প্রতিটি রজঃচক্রে ৩০ থেকে ৬০ মিলিলিটার রক্ত বার হয়, তাতে লোহা বার হয় মাসে ১৫ থেকে ৩০ মিলিগ্র্যাম; (২) গর্ভাবস্থায় গর্ভের ভ্রূণ ও গর্ভের ফুলের লোহা দরকার হয়, প্রসবের সময় রক্তপাতেও অনেক লোহা নষ্ট হয়—সব মিলিয়ে ৫০০ মিলিগ্র্যামের উপর লোহা চলে যায়; এবং (৩) স্তন্যদানের সময় প্রতিদিন ১·৫ মিলিগ্র্যাম লোহা বেরিয়ে যায়।

খাদ্যে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন আর সমস্ত প্রাকৃতিক বি-ভিটামিন থাকে তাহলে লোহা ভালোভাবে কাজে লাগতে পারে।

লোহার অভাবের চেয়ে আয়োডিনের অভাব মারাত্মক। লোহার অভাবে যে ক্ষতি হয়, আয়োডিনের অভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হতে পারে। গর্ভাবস্থায় খাদ্যে আয়োডিনের পরিমাণ কম হলে গর্ভস্থ শিশু স্বাভাবিকভাবে বড়ো হতে পারে না। খুব বেশি অভাব হলে শিশু জড়ধী কিংবা স্থূলবুদ্ধি হতে পারে। শিশুর পরবর্তী জীবনে আয়োডিনের প্রচণ্ড অভাব হলে মিকসেডেমা দেখা দিতে পারে।

আমাদের শ্বাসনালীর দুপাশে দুটি গ্রন্থি আছে, নাম থাইরয়েড গ্রন্থি। থাইরয়েড গ্রন্থির পক্ষে আয়োডিন খুব দরকার। এই গ্রন্থি দুটি থাইরকসিন নামে এক জাতীয় হরমোন নিঃসরণ করে, তাতে আয়োডিন থাকে। খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন না থাকলে থাইরয়েড গ্রন্থি স্বাভাবিক মাত্রায় থাইরকসিন তৈরি করতে পারে না। অথচ, দেহের বৃদ্ধি এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশের উপর থাইরকসিনের প্রচণ্ড প্রভাব। সারা জীবন ধরে স্বাস্থ্যরক্ষার উপরও তার প্রভাব অসীম। মানুষের শরীরের সমস্ত অংশেই অতি সামান্য পরিমাণে আয়োডিন পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অ্যাড্রিন্যাল করটেক্স, ডিম্বাশয় এবং থাইরয়েড গ্রন্থিতে। স্পঞ্জ যেমন জল শুষে রাখে, থাইরয়েড গ্রন্থিও তেমনি আয়োডিন ধরে রাখে।

আয়োডিনের খুব বেশি অভাব হলে তো বটেই, আংশিক অভাব হলেও গলগণ্ড হতে পারে। গলগণ্ড আসলে থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি।

আয়োডিন কম হলে থাইরয়েড গ্রন্থির কোষ ভেঙে যায় এবং রক্তক্ষরণ হয়। আয়োডিনের অভাব যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে তাহলে ক্রমশ এইসব কোষের স্থান অধিকার করে প্রচুর পরিমাণে নিষ্ক্রিয় কোষ এবং সেইসব নিষ্ক্রিয় কোষ বিন্দুমাত্রও থাইরয়েড হরমোন তৈরি করতে পারে না।

শরীরের সমস্ত কাজকর্মের দ্রুতি নিয়ন্ত্রণ করে থাইরয়েড গ্রন্থি। সুতরাং থাইরয়েড হরমোন কম হলে শরীরে শ্রান্তি বোধ হয়, শরীর অবসন্ন লাগে, একটা অস্বাভাবিক ঘুম ঘুম ভাব আসে, যৌনকর্মেও উৎসাহ পাওয়া যায় না, নাড়ির গতি কমে যায়, রক্তের চাপ হ্রাস পায় এবং অল্প কয়েক ক্যালরিতেই মেদবাহুল্যের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। আয়োডিনের সামান্য অভাবেই থাইরয়েডে ক্যান্সার হতে দেখা গেছে। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়তে এবং হৃদরোগে মৃত্যু ঘটতেও দেখা গেছে।

শৈশবের গোড়ায়, যৌবনারম্ভে এবং যৌবনে পদার্পণের পরেই আয়োড়িনের

চাহিদা বেড়ে যায়। আবার, গর্ভাবস্থায় এবং সন্তানপ্রসবের পর স্তন্যদানকালেও আয়োডিনের চাহিদা বাড়ে। রজোনিবৃত্তির সময় বাড়ে বিশেষভাবে। কিন্তু কার কখন কতটা আয়োডিনের প্রয়োজন সে বিষয়ে খুব একটা নিশ্চিত করে এখনও পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব হয় নি। তবে দেখা গেছে, শরীরে আয়োডিনের চাহিদা যখন বাড়ে তার আগে কয়েক বছর যদি বাদ না দিয়ে সমানে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া হয়ে থাকে তাহলে প্রয়োজনের সময় অতিরিক্ত আয়োডিনের দরকার হয় না। আর, সারা জীবন আয়োডিনযুক্ত লবণ খেলে আয়োডিনের প্রয়োজন তাতেই মেটে। প্রস্রাব, ঘাম, এমন কি নিশ্বাসের সঙ্গেও অবিরাম আয়োডিন বেরিয়ে যায় বলে শরীরে তার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলেও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না।

পটাসিয়ম, সোডিয়ম আর ক্লোরিন—এই তিনটি পদার্থ আমাদের প্রত্যহ দরকার এবং অধিক পরিমাণে দরকার। আমাদের শরীরে যেসব তরল পদার্থ আছে তা যাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অ্যাসিড কি অ্যালক্যালি হয়ে না যায় অর্থাৎ প্রায় উদাসীন থাকে তার ব্যবস্থা করে এই তিনটি পদার্থ। আবার, দেহের টিস্যুর ভিতর কতখানি জল থাকবে তা-ও নির্ধারণ করে এই তিনটি পদার্থ। অসমোটিক প্রেশার অর্থাৎ আস্রবণ-চাপ রক্ষা করে এই তিনটি পদার্থ অন্ত্রের ভিতর থেকে রক্তে এবং রক্তের ভিতর থেকে কোষে পুষ্টিদ্রব্য আকর্ষণ করে। বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে যে তরল ক্ষরিত হয়, এই তিনটি খনিজ পদার্থ তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের নার্ভতন্ত্রের ভিতর দিয়ে বার্তাপ্রেরণে পটাসিয়মের একটা ভূমিকা আছে। পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরিতে ক্লোরিন লাগে। তিনটি পদার্থই অতি প্রয়োজনীয়—প্রত্যহই চাই এবং প্রত্যহই তা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

রান্নায় এবং পাতে আমরা যে লবণ খাই তাতেই প্রচুর পরিমাণে সোডিয়ম আর ক্লোরিন পাওয়া যায়। এই লবণ আসলে সোডিয়ম ক্লোরাইড। পটাসিয়ম পাওয়া যায় শাকসবজি, ফল, দানাশস্য, বাদামজাতীয় ফল, মাংস ইত্যাদিতে। সোডিয়ম, ক্লোরিন আর পটাসিয়ম সব সময় শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকাটাই যথেষ্ট নয়, সোডিয়ম আর পটাসিয়ম যাতে পরস্পরের সঙ্গে একটা সমতা রক্ষা করে চলে সেটাওদেখা দরকার। কারণ, সোডিয়ম যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে প্রস্রাবের সঙ্গে অকারণ অতি প্রয়োজনীয় পটাসিয়ম বেরিয়ে যাবে। আবার, পটাসিয়ম বেশি হলেও ঐ একইভাবে শরীরে সোডিয়মের দারুণ ঘাটতি দেখা দেবে।

আধুনিক সভ্যতায় শাকসবজি আর ফল খাওয়া কমে গেছে, ফলে শরীর কম পটাসিয়ম পাচ্ছে। আবার, নোনতা খাদ্যের দিকে ঝোঁক বাড়ায় এবং অন্যভাবেও বেশি লবণ খেতে থাকায় শরীরে সোডিয়মের পরিমাণ বাড়ছে। নীট ফল দাঁড়াচ্ছে, শরীর পটাসিয়ম পাচ্ছে খুব কম এবং শরীর থেকে পটাসিয়ম বেরিয়ে যাচ্ছে খুব বেশি। স্থতরাং সোডিয়ম আর পটাসিয়মের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমতা রক্ষা করা সহজ হচ্ছে না। কিন্তু শরীর কোনো যুক্তি শুনতে নারাজ, যেভাবেই হোক, তার প্রয়োজন মেটাতেই হবে নইলে প্রতিফল দেবে। স্থতরাং আমাদের জানতে হবে, কখন সোডিয়মের পরিমাণ বাড়াতে হবে আর কখন কমাতে হবে এবং কীভাবে ও কখন খাদ্যে পটাসিয়মের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সাধারণ অবস্থায় একজন স্বস্থ লোকের সোডিয়ম ও ক্লোরিনের অভাব হবার কথা নয়। কারণ, আগেই বলেছি, আমরা রান্নায় ও পাতে যে পরিমাণ লবণ অর্থাৎ সোডিয়ম ক্লোরাইড খাই তাতেই এই দুটি জিনিসের প্রয়োজন মিটে যায়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ঘামের ভিতর দিয়ে অনেক লবণ বেরিয়ে যায় এবং অত্যধিক গ্রীষ্মে এত লবণ বেরিয়ে যেতে পারে যে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

শরীরে লবণের অভাবে নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অভাবের প্রচণ্ডতার উপর নির্ভর করে শারীরিক দৌর্বল্য, শ্রান্তি, অবসাদ থেকে শুরু করে প্রবল উত্তাপজনিত নানাবিধ পীড়া, এমন কি হিট-স্ট্রোক অর্থাৎ সর্দিগর্মি পর্যন্ত হতে পারে। তখন লবণ ছাড়া যত বেশি জল খাওয়া যাবে, অবস্থা তত বেশি খারাপ হবে। সেই কারণে অতি গ্রীষ্মে জলের মধ্যে সামান্য পরিমাণে লবণ মিশিয়ে খাওয়ার বিধান দেন বিশেষজ্ঞরা।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি সময় আছে যখন কিঞ্চিৎ বেশি পরিমাণে সোডিয়ম অর্থাৎ লবণ খাওয়া দরকার। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি ভালো থাকলে অ্যালডোস্টেরোন নামে এক জাতীয় হরমোন তৈরি করে। এই হরমোন প্রয়োজনের সময় শরীরে সোডিয়ম ধরে রাখে। স্ট্রেস অর্থাৎ অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক চাপের সময় অ্যালডোস্টেরোন তৈরি বেড়ে যায় এবং শরীরে বেশি পরিমাণে সোডিয়ম সঞ্চিত হয়। ফলে, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এই যে সাময়িকভাবে রক্তের চাপ বেড়ে গেল তাতে স্ট্রেসের সময় অধিকতর শক্তির প্রয়োজন মেটাতে টিস্যুর ভিতর বেশি করে পুষ্টিদ্রব্য প্রবেশ করতে পারল। কিন্তু খাদ্য যদি এমন অপর্যাপ্ত হয় যে, অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যালডোস্টেরোন তৈরি হতে পারে না, সোডিয়ম ধরে

রাখা যায় না এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে হ্রাস পেয়ে স্বাভাবিকের নিচে নেমে যায়। তখন চাপের অভাবে টিস্যুর মধ্যে দ্রুত পুষ্টিদ্রব্য যেতে পারে না। ঠিকভাবেও যেতে পারে না। ফলে, একটা স্থায়ী শ্রান্তি আর অবসাদ দেখা দেয়।

রক্তচাপ কম থাকলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, অ্যাড্রিন্যাল ঝিমিয়ে পড়েছে। তখন নোনতা খাবার বেশি করে খাওয়া দরকার, এমন কি জলের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে খেলেও ভালো হয়। কিন্তু রক্তচাপ বেশি হলে বুঝতে হবে, অন্যান্য কারণ ছাড়াও শরীরে সোডিয়ম ধরে রাখা হচ্ছে, সুতরাং তার উপর বাড়তি লবণের চাপ পড়লে ক্ষতির আশঙ্কা।

সব সময়েই যে আমরা ইচ্ছা করে বেশি লবণ খাই তা কিন্তু নয়। অজানিতভাবেও আমাদের বেশি লবণ খাওয়া হয়ে যায়। বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, খাবার জল, খাদ্যসংরক্ষক হিসাবে ব্যবহৃত সোডিয়ম নাইট্রেট ইত্যাদি থেকেও অনেক সোডিয়ম আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। কিডনি যদি ভালো থাকে তাহলে বাড়তি সোডিয়মের অনেকটাই প্রস্রাবের সঙ্গে বার করে দিতে পারে, কিন্তু কিডনি অকেজো কিংবা রোগাক্রান্ত হলে শরীরে অনেক বেশি সোডিয়ম জমে যেতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে অত্যধিক সোডিয়মযুক্ত খাদ্য সর্বথা পরিহার্য এবং সিঙাড়া, নিমকি, নোনতা বিস্কুট, চানাচুর, সল্টেড বাদাম ইত্যাদি যতই মুখরোচক হোক, বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তখন সোডিয়ম ক্লোরাইড ব্যবহার না করে পটাসিয়ম ক্লোরাইড ব্যবহার করলে ভালো হয়।

যেসব দেশে কম লবণ ব্যবহার করা হয় সেইসব দেশে রক্তের অধিক চাপ প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু জাপানে, যেখানে লবণে জারানো শুকনো মাছের খুব চল, সেখানে অকালমৃত্যুর একটা বড়ো কারণ, অত্যধিক সোডিয়ম ক্লোরাইড খাওয়ার ফলে অত্যধিক রক্তচাপজনিত স্ট্রোক।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, সোডিয়মের সঙ্গে অধিক রক্তচাপের একটা সম্পর্ক আছে এবং যত বেশি সোডিয়ম তত তাড়াতাড়ি অধিক রক্তচাপজনিত মৃত্যু—এবং সে মৃত্যুর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

অত্যধিক সোডিয়ম খাওয়ার দরুন শরীর থেকে অত্যধিক পটাসিয়ম বেরিয়ে যায় বলেই বিপদ ঘটে বেশি। পটাসিয়ম বহু এনজাইমকে সক্রিয় করে, তাই পেশী-সঙ্কোচনের কাজে পটাসিয়ম অপরিহার্য। পটাসিয়ম ছাড়া গ্লুকোজকে শক্তিতে কিংবা গ্লাইকোজেনে পরিণত করা যায় না। গ্লাইকোজেন তৈরি হতে না পারলে ভবিষ্যতে যখন শক্তি-উৎপাদনের জন্য গ্লাইকোজেন দরকার হবে তখন তা পাওয়া

যাবে না। তখন সাঙ্ঘাতিক অবস্থা সৃষ্টি হবে। শর্করা কাজে লাগানো যাচ্ছে না, কোষের ভিতর গ্লাইকোজেন সঞ্চিত নেই—ফলে, শক্তি-উৎপাদন বন্ধ, পেশী-সঙ্কোচন স্তব্ধ। পরিণামে, পেশীর দৌর্বল্য। ক্ষতির মাত্রা এখানেই শেষ নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বেশি পটাসিয়ম থাকে কোষের ভিতর অনেক গভীরে আর কোষের বাইরে থাকে বেশি সোডিয়ম। ভিতরের পটাসিয়ম আর বাইরের সোডিয়মের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক। একে-অপরকে ঠেকিয়ে রাখে অর্থাৎ ব্যালান্স করে রাখে। কিন্তু ভিতরে পটাসিয়ম কমে গেলে সোডিয়ম ভিতরে ঢোকার পথ পেয়ে যায় এবং যাবার সময় এত জল নিয়ে যায় যে, বহু কোষ জলের দরুন অধিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ফেটে যায়। ফলে, শোথ রোগের সৃষ্টি হয়, পেশী আর সংযোজক-কলার ক্ষতি হয় এবং আরও অনেক বিপর্যয় ঘটে।

পটাসিয়ম সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ফল আর শাকসবজিতে। কিন্তু আগের তুলনায় আমরা এখন এসব জিনিস কম খাই বলে আমাদের শরীর কম পটাসিয়ম পায়। আবার, তরিতরকারি ধুয়ে কিংবা সিদ্ধ করে জলটা যদি ফেলে দেওয়া হয় তাহলে জলের সঙ্গে পটাসিয়ম চলে যায়। রান্নার দোষে যেমন পটাসিয়মের অভাব ঘটে তেমনি বেশি পরিমাণে রিফাইন-করা খাবার খাওয়ার ফলেও ঘটে। আবার, পেটের অসুখ, বমি, অত্যধিক লবণ এবং কিছু কিছু ওষুধের কারণেও ঘটে। অত্যধিক মদ, এমন কি অত্যধিক জল খেলেও শরীরে পটাসিয়মের অভাব হয়, কারণ প্রস্রাবের ভিতর দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়ম বেরিয়ে যায়।

কোষের ভিতর পটাসিয়মের পরিমাণ কমে গেলে অবসাদ, খিটখিটে মেজাজ, চিন্তার গোলমাল এবং আরও নানা অস্বস্তিকর উপসর্গ দেখা দেয়।

পটাসিয়ম ঘাটতির দরুন সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় সম্ভবত হার্ট অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের। রক্তে পটাসিয়ম কমে যাওয়া এবং কম পটাসিয়ম খাওয়ার সঙ্গে হৃদরোগের একটা সম্পর্ক পাওয়া যায়। পেশীর কোষে পটাসিয়ম ধরে রাখার জন্য ম্যাগনেসিয়ম দরকার, সুতরাং শরীরে ম্যাগনেসিয়মের অভাব হলে কোষ থেকে পটাসিয়ম বেরিয়ে গিয়ে কোষের ভিতর পটাসিয়মের একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। শক্তি উৎপানের জন্য পটাসিয়ম অত্যন্ত প্রয়োজন, শরীরে ক্ষণকালের জন্যও যদি পটাসিয়ম কিংবা ম্যাগনেসিয়মের অভাবে ঘটে তাহলে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়ে মৃত্যু হতে পারে।

পরিমাণ মতো পটাসিয়ম খাচ্ছি কিনা, সাধারণভাবে বোঝা কঠিন। সুতরাং বেশি করে ফল আর তরিতরকারি খাওয়া উচিত, রান্না-করা সবুজ শাকপাতা

খাওয়া উচিত প্রত্যহ। সেইসঙ্গে রিফাইন-করা খাদ্যসামগ্রী পরিহার করে চলা দরকার যতখানি সম্ভব, সোডিয়ম কিংবা লবণ খাওয়াও কমানো দরকার, আর দরকার শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এমনসব কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা।

ভালো মাটিতে উৎপন্ন সমস্ত ফসলেই আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত খনিজ পদার্থই থাকে—কতকগুলি খনিজ পদার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে থাকে, আবার কতকগুলি খনিজ পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে থাকে, বলা যায় নামেমাত্র থাকে। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে থাকে এমনসব খনিজ পদার্থের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে, নামেমাত্র থাকে এমনসব খনিজ পদার্থের মধ্যে আছে কোবল্ট, তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়ম প্রভৃতি।

কোবল্ট ভিটামিন-বি$_{১২}$য়ের একটা অংশ। প্রত্যহ মাত্র তিন মাইক্রোগ্র্যাম ভিটামিন-বি$_{১২}$ পার্নিশাস অ্যানিমিয়া নামক অত্যন্ত মারাত্মক রকমের এক রক্তাল্পতারোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

এনজাইমের অনেক কাজে তামার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তাছাড়া আমাদের প্রতিটি দেহকোষের নিউক্লিয়সের এক বিশেষ অংশ **RNA** অর্থাৎ রিবো-নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরিতে তামা অপরিহার্য। অস্থি, মস্তিষ্ক, নার্ভ ও সংযোজক-কলা গঠনে এবং নার্ভ ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ায় তামার প্রয়োজন সমধিক। শরীরে তামার অভাব ঘটলে লোহার পরিশোষণ কমে যায় এবং লোহিত রক্তকোষের আয়ুষ্কাল হ্রাস পায়। ফলে, অ্যানিমিয়া অর্থাৎ রক্তাল্পতা দেখা দেয়। শরীরে রঞ্জক পদার্থ তৈরিতেও তামার একটা ভূমিকা আছে।

মেটে, কিডনি ও ঘিলুতে প্রচুর তামা পাওয়া যায়। শুকনো শিম, মটর শুঁটি, হাতে-গড়া আটার রুটি, দানাশস্য এবং সবুজ শাকপাতাতেও তামা পাওয়া যায়—তবে মাটি ভালো হওয়া চাই। অন্য বহু পুষ্টিদ্রব্যের মতো তামার চাহিদাও মেটানো যায় কেবল রিফাইন-না-করা খাদ্য খেয়ে।

দস্তার অভাবে দেহকোষের নিউক্লিয়স অর্থাৎ **RNA** এবং **DNA** দুইয়েরই গঠন ব্যাহত হয়। **DNA** হল ডিঅকসি রিবো-নিউক্লিক অ্যাসিড।

দেহের সমস্ত টিস্যুতেই দস্তা পাওয়া যায় এবং বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় চোখে আর শুক্রাণুতে। দেহের প্রোটিন সংশ্লেষণে এবং বহু এনজাইমের ক্রিয়ায় দস্তা একান্ত প্রয়োজন। শরীরে দস্তার অভাব ঘটলে সন্তান-উৎপাদনক্ষমতা

কমে যায়, রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পায়, ক্ষত সারতে দেরি হয় এবং চামড়ায় অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

ভালো মাটিতে জন্মালে বাদামজাতীয় ফল আর সবুজ শাকপাতায় প্রচুর দস্তা পাওয়া যায়। তবে সিদ্ধ করা জল ফেলে দিলে সেইসঙ্গে তার ভিতরকার দস্তাও চলে যায়। আবার, অত্যধিক জল কিংবা মদ খেলেও বেশি প্রস্রাব হয়ে শরীর থেকে দস্তা বেরিয়ে যায়। জমিতে রাসায়নিক সার দিলে উদ্ভিদ মাটির দস্তা বিশেষ নিতে পারে না, ফলে ফসলে দস্তা পাওয়া যায় না।

শরীরের অসংখ্য এনজাইমকে সক্রিয় করে তোলার জন্য ম্যাঙ্গানীজ দরকার। ফ্যাটের সদ্ব্যবহারে ম্যাঙ্গানীজ সরাসরি সাহায্য করে। বাদাম, সবুজ শাকপাতা, আটার রুটি, দানাশস্য প্রভৃতিতে প্রচুর ম্যাঙ্গানীজ থাকে—তবে ঐ এককথা, মাটি ভালো হওয়া চাই। মাটি যদি ভালো না হয় অর্থাৎ মাটিতে যদি লোহা বেশি থাকে কিংবা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে উদ্ভিদ মাটি থেকে ম্যাঙ্গানীজ নিতে পারে না। ফলে, ফসলে ম্যাঙ্গানীজের অভাব থাকে।

দেহ যাতে ঠিকমতো শর্করা কাজে লাগাতে পারে সেজন্য দেহে ক্রোমিয়ম থাকা দরকার। ক্রোমিয়মের অভাবে সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক ডায়াবিটিজ হতে দেখা গেছে। এই জাতীয় অন্যান্য খনিজ পদার্থের মতো ক্রোমিয়মও সব মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না, রাসায়নিক সার দিলে আরও থাকে না।

আমাদের শরীরে যেসব খনিজ পদার্থ নামেমাত্র থাকে সেইসব খনিজ পদার্থ নামেমাত্রই খাওয়া উচিত। বেশি হয়ে গেলে বিষ হয়ে যেতে পারে। এই ধরনের কিছু খনিজ পদার্থ একেবারেই খাওয়ার দরকার করে না। শরীর এমনিতে যেটুকু পায় তাতেই কাজ চলে যায়, যেমন—আর্সেনিক, আর অ্যালিউ-মিনিয়ম। মানুষের দেহকলায় টিন, রুপো, নিকেল আর পারাও পাওয়া যায়। কিন্তু সেসবের কী কাজ তা এখনও জানা যায় নি।

ক্যালসিয়ম আর লোহার মতো নামেমাত্র-থাকা খনিজ পদার্থ পরিশোষণের জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দরকার। পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত না হয়ে এইসব খনিজ পদার্থ পরিশোষিত হতে পারে না। সুতরাং পাকস্থলীতে যাতে উপযুক্ত পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। দেখা দরকার, বি-ভিটামিনের অভাব যেন কখনও না হয়।

আঠার : ব্রেকফাস্টটা জরুরী

কোনো মাটিতে কী কী খনিজ পদার্থ আছে, কেবল তার উপরই সেই মাটিতে উৎপন্ন খাদ্যের পুষ্টিমূল্য নির্ভর করে না। মাটিতে খনিজ পদার্থ না থাকলে ফসলেও থাকতে পারে না, থাকলেও অতি সামান্য পরিমাণে থাকতে পারে। তাই মাটিতে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিশ্চয়ই থাকতে হবে, যদিও অনেক খনিজ পদার্থ ছাড়াই ফসলের চেহারা ও ফলন ভালো হতে পারে। উদ্ভিদের প্রকৃত স্বাস্থ্যের জন্য জমিতে হিউমাসও থাকা দরকার। হিউমাস অর্থ গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ। ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক প্রভৃতি জীব এই গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

তাছাড়া জমিতে খনিজ পদার্থ থাকলেই হয় না, প্রথমে তাকে আয়নিত করা দরকার—এবং তা করে মাটির ভিতরকার ব্যাকটিরিয়া। তারপর সেই আয়নিত খনিজ পদার্থ মাটির রসে দ্রবীভূত হয়। এখন, উদ্ভিদের শিকড়ে যে ছত্রাক সৃষ্টি হয় সেই ছত্রাক ঐ দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ টেনে নিয়ে উদ্ভিদদেহে পৌঁছে দেয়। এইভাবে উদ্ভিদ মাটি থেকে তার পুষ্টি আহরণ করে। মাটিতে যদি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় সব খনিজ পদার্থ থাকে তাহলেই উদ্ভিদ তার শিকড়ের ছত্রাকের সাহায্যে তা গ্রহণ করে পুষ্ট হয় এবং রোগ প্রতিরোধ করে। তার প্রোটিন, খনিজ এবং ভিটামিনের পরিমাণও বেশি হয়। তাতে পশুপাখি ও মানুষের সুস্থ জীবনধারণ সম্ভব হয়।

পৃথিবী যখন নবীন ছিল তখন তার বুকে উৎপন্ন খাদ্যসামগ্রীর পুষ্টিমূল্য অধিক ছিল। বহুযুগ আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা সেইসব পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করতেন।

কিন্তু জনবিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হল। তখন কেবল প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকা সম্ভব হল না। দরকার হল 'ম্যাস প্রোডাকশন' অর্থাৎ 'বিপুল উৎপাদন'। শুরু হল রাসায়নিক সারের ব্যবহার। ঐসব রাসায়নিক সার অতি সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়—ঠিক যেমন জলে লবণ কিংবা চিনি গলে যায়। ফলে, জমির রস তাড়াতাড়ি সংপৃক্ত হয়ে উঠল এবং তার দরুন অপেক্ষাকৃত কম সহজে দ্রবীভূত হয় যেসব খনিজ পদার্থ (যেমন—লোহা

তামা ম্যাগনেসিয়ম দস্তা আর নামেমাত্র থাকা অন্যান্য খনিজ পদার্থ), জমির রসে তাদের স্থান হল না, হলেও অতি সামান্য পরিমাণে।

বার বার রাসায়নিক সার প্রয়োগের দরুন জমিতে গন্ধক জমে গেল অনেক এবং উদ্ভিদদেহে খনিজ পদার্থ যোগায় যে ছত্রাক, এই পুঞ্জীভূত গন্ধক সেই ছত্রাকের কাছে বিষ হয়ে দাঁড়াল। ফসল উৎপাদনে মাটিতে গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থেরও যে একটা ভূমিকা আছে সেকথাটা স্মরণ রইল না। গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ জমিতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, ধীরে ধীরে তা শেষ হয়ে গেল। জমি আর কিছু ফিরে পেল না। কিন্তু গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ ছাড়া ব্যাকটিরিয়া আর ছত্রাক বেঁচে থাকতে পারে না। জমিতে খনিজ পদার্থ থাকতে পারে, প্রচুর পরিমাণেই পারে—কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটিরিয়া আর ছত্রাক না থাকলে সে খনিজ পদার্থ কাজে লাগতে পারে না, ব্যাকটিরিয়া আর ছত্রাক ছাড়া খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হতে পারে না। খাদ্য হিসাবে গলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ না পেলে উদ্ভিদের শিকড়ে ছত্রাক জন্মাতে পারে না। এইভাবে মাটি থেকে খনিজ পদার্থ ক্রমশ কমে গেল। কারণ, উদ্ভিদ মাটি থেকে খনিজ পদার্থ টেনে নিল, মানুষ সেই উদ্ভিজ্জ ফসল খাওয়ার ফলে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করল, তারপর মানুষের শরীর থেকে তা মলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল সমুদ্রে কিংবা নদীতে। মাটির জিনিস মাটিতে ফিরে এল না। মাটি তার ধন হারিয়ে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে লাগল।

তবু এখনও মাটিতে উদ্ভিদ জন্মায়, ফসল হয়; উদ্ভিদের রং সবুজ থাকে, ফসল পুষ্ট দেখায়। কিন্তু তাতে মানুষের স্বাস্থ্যের উপযোগী সব উপাদান থাকে না। রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ও রোগপ্রতিরোধক দিয়ে ফসল চাষ করার দরুন আমাদের খাদ্যে ক্রমশ বেশি করে বিষ ঢুকছে। সে বিষ ধুলেও যায় না, সে বিষ আগুনেও নষ্ট হয় না।

ম্যাকক্যারিসন রাসায়নিক সারে উৎপন্ন গম আর গোবর সারে উৎপন্ন গম পরীক্ষাগারে প্রাণীদের খাইয়ে দেখেছেন, গোবর সারে উৎপন্ন গম শতকরা ১৫ ভাগ বেশি পুষ্টিকর।

আমাদের খাদ্যে এখন প্রোটিনের পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে এবং কমেই চলেছে। খনিজ পদার্থের পরিমাণ আগে যা ছিল তার এক ভগ্নাংশ মাত্র এখন আছে। ভিটামিনের পরিমাণ উদ্ভিদের স্বাস্থ্য অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

টাটকা খাদ্যে যে গুণ থাকা দরকার, এখন আর তা থাকে না। সে স্বাদ না, সে গন্ধ না।

যেসব কারণে আমাদের খাদ্যের মান কমেছে সেইসব কারণের অনেকগুলিই আমাদের আয়ত্তের বাইরে। প্রথম কারণ, আমাদের জমির রকম পালটে গেছে অবিশ্বাস্যভাবে। একই জমিতে বারে বারে একই ফসল চাষ করার দরুন স্বাভাবিকভাবেও পালটেছে, আবার কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ আর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ইত্যাদির সংস্পর্শে অ-স্বাভাবিকভাবেও পালটেছে। ফলে, জমিতে আগে যেসব গুণ ছিল, এখন বহুলাংশে তা নেই। এই ধরনের জমিতে যেসব গাছপালা আর শস্যফসল জন্মায় তাতে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর পদার্থ বিশেষ থাকে না। অনেক সময় অত্যাবশ্যক পুষ্টিকর পদার্থও না। বহুক্ষেত্রে বহু বিষাক্ত পদার্থ এসে বাসা বাঁধে। যেসব পশুপাখি এইসব গাছপালা আর শস্য-ফসল খায় তাদের মাংসে, দুধে কিংবা ডিমে প্রয়োজনীয় খাদ্যরাসায়নিকের পরিমাণে তারতম্য ঘটে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ বিভাগের সাম্প্রতিক একটা হিসাবে দেখা যায়, উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রতি বছর প্রায় ২২,০০০ মানুষ এমনসব কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে মারা যায় যা পশ্চিমী দেশগুলিতে এখন আর তৈরিই হয় না। ঐ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা স্পষ্ট বলেছেন, এটা নিখাদ সত্য যে, বড়ো বড়ো মালটিন্যাশন্যাল কোম্পানির দুরকম স্ট্যাণ্ডার্ড থাকে, অ্যামেরিকায় তারা যে স্ট্যাণ্ডার্ড মেনে চলে, তৃতীয় বিশ্বে সেই স্ট্যাণ্ডার্ড তারা অনুসরণ করে না।

স্বাস্থ্য আর নিরাপত্তার ব্যাপারে এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে মার্কিন সরকারের নিয়মকানুন বড়ো অনমনীয়। কিন্তু অধিকাংশ উন্নতিশীল দেশের সরকার শিল্পায়নে উৎসাহ দেবার জন্য এবং বেশি লোকের কর্মসংস্থানের জন্য বড়ো বড়ো মালটিন্যাশন্যাল কোম্পানির বেলায় নিয়মকানুন শিথিল করে ফেলেন।

আমাদের মতো দেশে সত্যিকারের পুষ্টিকর খাদ্য আজ সত্যিই দুর্লভ। যে খাদ্যে যে যে গুণ থাকা দরকার, এখন আর তা থাকে না।

তাই বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আগের যুগ ফিরিয়ে আনার কল্পনায় রাত কাবার করে দিলেও কিছু হবে না। এর মধ্য থেকেই যতখানি সম্ভব ভালো খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে।

স্বাস্থ্যগঠনের জন্য ৪০টি কি তারও বেশি পুষ্টিকর পদার্থ দরকার। দুধের মতো অপরিশোধিত খাদ্য এই ৪০টি পুষ্টিকর পদার্থই যোগাতে পারে, কিন্তু চিনির

মতো অতিপরিশোধিত খাদ্য যোগায় মাত্র একটি। যার খাদ্য ত্রুটিপূর্ণ তার শরীরে একসঙ্গে অনেকগুলি পুষ্টিকর পদার্থের অভাব দেখা দেয়। মানুষের শরীরে একটিমাত্র পুষ্টির অভাব কখনই হয় না। তবে কখনও কখনও একটিমাত্র পুষ্টিকর পদার্থের অভাব বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য শরীরে যদি শর্করার পরিমাণ কম হয়ে যায় তাহলে সারাটা দিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং সকালের জলখাবার হেলাফেলার ব্যাপার নয়। সকালের জলখাবার দিয়েই দিনের শুরু, সারা দিন আপনি কেমন থাকবেন তার ভিত্তি রচনা হয় এইখানে। আপনি যদি কম খান কি ঠিক খাবার না খান তাহলে আপনার শরীরে কর্মশক্তি আসবে না। আপনার জলখাবারেই ঠিক হয়ে যায়, সেদিন কত সহজে আপনার দেহ শক্তি সৃষ্টি করতে পারবে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আপনার রক্তে কী পরিমাণ শর্করা সৃষ্টি করতে পারবে। শর্করা থেকেই শক্তির সৃষ্টি এবং সেই শক্তিই আপনার চিন্তা, কর্ম আর অনুভবের নিয়ামক। শরীরে এককভাবে শর্করার কিংবা যৌথভাবে শর্করা আর ফ্যাটের দহনের ফলে শক্তি সৃষ্টি হয়। ব্লাড প্লাজমা বা রক্তরসে পর্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা থাকলেই কেবল প্রতিটি দেহকোষ তার প্রয়োজনমতো শর্করা নিতে পারে। রক্তে কী পরিমাণ শর্করা আছে জানতে পারলে তা থেকেই বোঝা যায়, প্রতিটি দেহকোষ কী পরিমাণ শর্করা পেতে পারে।

হাজার হাজার রক্তপরীক্ষায় দেখা গেছে, একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যদি ১২ ঘণ্টা অভুক্ত থাকে তাহলে তার দেহের ১০০ সিসি রক্তে ৮০ থেকে ১২০ মিলিগ্রাম শর্করা পাওয়া যায়। এই পরিমাণকে বলা হয় 'ফাস্টিং ব্লাড শুগার'। এটা নির্ভর করে পূর্ববর্তী আহারের সময় কোন্ কোন্ খাদ্য কী কী পরিমাণে খাওয়া হয়েছে তার উপর। তবে গড় 'ফাস্টিং ব্লাড শুগার' হল ৯০ থেকে ৯৫ মিলিগ্রাম। এতেই পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি হয়। এর পর যতই রক্তের শর্করা ব্যবহৃত হতে থাকে ততই কম শক্তি সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে অবসন্নতা আসে। শর্করার পরিমাণ যখন প্রায় ৭০ মিলিগ্রামে নেমে যায় তখন ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং অবসন্নতা ক্রমশ ক্লান্তিতে পরিণত হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ ৬৫ মিলি-গ্র্যামের কাছাকাছি নেমে গেলে প্রায়ই মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং অন্ত্রে এক ধরনের ব্যথা অনুভূত হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ যদি এইভাবে কমতে থাকে তাহলে একসময় অত্যধিক শ্রান্ত লাগে। তখন মাথা ধরে,

শরীর দুর্বল মনে হয়, দেহ টলতে থাকে। বুক ধড়ফড়ানিও দেখা যায়, হঠাৎ পা ভার রাখতে না পেরে ভেঙে পড়তে চায়, বমনেচ্ছা হয়, কখনও কখনও বমি হয়েও যায়।

স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের কোষ কেবল শর্করা থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি সৃষ্টি করতে পারে, ফ্যাট বা প্রোটিন থেকে নয়। স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের কোষে শর্করার পরিমাণ অতি সামান্য হ্রাস পেলেও মানুষের চিন্তা শ্লথ হয়ে যায়, চিন্তায় গোলমাল দেখা দেয়—এবং স্নায়ুতে টান ধরে। যার রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিকের নিচে নেমে যায় সে ক্রমশ খিটখিটে হয়ে ওঠে, একটুতেই বিরক্ত হয়। খামখেয়ালি-পনা তখন তার একটা স্বভাব, সব সময় তাকে একটা অবসাদ ঘিরে রাখে এবং সে কারও সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। যেহেতু মস্তিষ্ক শুধু শর্করা থেকেই তার প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে সেইহেতু রক্তে শর্করার পরিমাণ সাঙ্ঘাতিকভাবে কমে গেলে মস্তিষ্ক প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, চোখে তখন অন্ধকার দেখা যায় এবং সংজ্ঞা লোপ পায়।

পক্ষান্তরে, খাদ্য যদি পর্যাপ্ত হয়, রক্তে শর্করার পরিমাণ যদি ফাস্টিং ব্লাড শুগার বা তার চেয়ে কিছু বেশি (১২০ মিলিগ্র্যাম থেকে ১৩০ মিলিগ্র্যাম) হয় তাহলে সহজে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সৃষ্টি হয়। তখন সারা দেহমন প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে ওঠে, কর্মশক্তি হয় অঢেল। তখন দ্রুত চিন্তা করা যায় এবং সে চিন্তা হয় স্বচ্ছ। তখন খাদ্যের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা জন্মায় না এবং মিষ্টিজাতীয় খাদ্য বিস্বাদ মনে হয়। তখন মেজাজ হয় সম্রাটের মতো, দৃষ্টিভঙ্গি হয় উদার, মন প্রফুল্ল। তখন সবাইকে ভালো লাগে। তখন জীবন হয় মধুময়।

আমাদের খাদ্যে সাধারণত প্রোটিন থাকে কম, কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণই বেশি থাকে। কার্বোহাইড্রেট থেকেই আমাদের শরীর তার প্রয়োজনীয় শর্করা ও শ্বেতসার আহরণ করে। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে যায়। রক্তে শর্করার পরিমাণ দ্রুত বেড়ে গেলে প্যানক্রিয়াস অর্থাৎ অগ্ন্যাশয় অধিক সক্রিয় হয়ে ইনস্যুলিন ত্যাগ করে। সেই ইনস্যুলিন যকৃৎ আর মাংসপেশীতে শর্করা টেনে নিয়ে তাকে শ্বেতসার অথবা গ্লাইকোজেনের আকারে মজুত করে রাখতে কিংবা ফ্যাটে পরিবর্তিত করতে বাধ্য করে এবং কোষের শর্করা ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে। এইভাবে ইনস্যুলিন রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রন করে। প্রতি ১০০ সিসি রক্তে শর্করার পরিমাণ ১৮০ মিলিগ্র্যামের বেশি হয়ে গেলে বাড়তি শর্করা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় ও সুষম

খাদ্য খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে পারে না। ইনস্যুলিন রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

অত্যধিক কার্বোহাইড্রেট-সমন্বিত খাদ্য খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন অগ্ন্যাশয় থেকে বেশি পরিমাণে ইনস্যুলিন বেরিয়ে বাড়তি শর্করাকে গ্লাইকোজেন ও ফ্যাটে রূপান্তরিত করে এবং কোষে শর্করার ব্যবহার বাড়িয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে চেষ্টা করে। আবার, রক্তশর্করা যখন ফাস্টিং ব্লাড শুগার থেকে কমে যায় তখন অগ্ন্যাশয় থেকে ইনস্যুলিন-নির্গমনও হ্রাস পায়। সুতরাং ইনস্যুলিন-নির্গমন আর রক্তশর্করার মাত্রার মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে—রক্তশর্করা বাড়লে ইনস্যুলিন-নির্গমন বাড়বে আর রক্তশর্করা কমলে ইনস্যুলিন-নির্গমন কমবে। এই কারণেই অত্যধিক কার্বোহাইড্রেট শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রয়োজনাতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় এবং বেশি পরিমাণে ফ্যাট তৈরি করে মেদবাহুল্য ঘটায় ও মেদবাহুল্যজনিত অনেক রোগ সৃষ্টি করে। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে বেশি প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর জল ও খনিজ পদার্থ বেরিয়ে যায়। তাতে টিস্যুতে নিরুদন অর্থাৎ প্রচণ্ড রকম জলাভাব ঘটে—এবং তা মেদবাহুল্যের চেয়ে বহুগুণ মারাত্মক।

দেহকোষ অতি সামান্য পরিমাণেই গ্লাইকোজেন মজুত রাখতে পারে, তাই কিছু শর্করা অবশিষ্ট থাকলে তা ফ্যাটে পরিণত হয়ে যায়। খাদ্যপরিপাক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে শর্করার একমাত্র স্বাভাবিক উৎস তখন ঐ মজুত গ্লাইকোজেন। এই গ্লাইকোজেন তখন ভেঙে আবার শর্করায় পরিণত হয়। এই শর্করা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়, বিশেষ করে পরিশ্রমের মাত্রা যদি বেশি হয়। তখন শক্তি সরবরাহের জন্য অধিকাংশ কোষই ঐ ফ্যাটের দহন ঘটায়। কিন্তু শর্করা ছাড়া ফ্যাটের সঠিক দহন হয় না, কিছু 'ছাই' থেকে যায়—অ্যাসিটোন আর দু'রকম অ্যাসিডের আকারে। এসবই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। শক্তি কমে যায়, অ্যাসিড শরীরের ক্ষতি করে। কিন্তু মস্তিষ্ক আর স্নায়ুমণ্ডলীকে বেঁচে থাকতে হলে শর্করা চাই-ই চাই। অ্যাড্রিন্যাল থেকে তখন কর্টিসোন বার হয় এবং কোষ নষ্ট হতে থাকে যাতে তার প্রোটিন অংশত শর্করায় পরিণত হতে পারে। সুতরাং খাদ্য যদি ঠিক না হয় তাহলে স্নায়ুতন্ত্র পরজীবী হয়ে পড়তে বাধ্য। এই অনিষ্ট দিনের পর দিন চলতে থাকলে অকালে দেহ-ত্বকে কুঞ্চন আর মুখে বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

সুতরাং সকালের জলখাবারে যদি অল্প পরিমাণ শর্করা আর ফ্যাট এবং পরিমিত মাত্রায় প্রোটিন থাকে তাহলে সবদিক থেকেই রক্ষা হয়। তখন পরিপাকক্রিয়া হবে ধীর, শর্করা ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে রক্তে প্রবেশ করবে, ইনস্যুলিন বেশি তৈরি হবে না, গ্লাইকোজেন মজুত হবে স্বাভাবিকভাবে, শরীরে অবাঞ্ছিত মেদ জমবে না। শরীর পর্যাপ্ত শক্তি লাভ করে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে, প্রয়োজনমতো শরীরে তাপ সৃষ্টি হবে, আবহাওয়া যদি শীতল হয় তাহলে শরীরের শীতকযন্ত্র কাজ করবে যথাবিহিতভাবে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, খাদ্যে যত বেশি প্রোটিন থাকবে, কর্মশক্তি তত বেশি হবে। দুপুরের আর রাত্রের খাবারেও বেশি প্রোটিন আর কিছু ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট থাকা দরকার। রক্তে শর্করার পরিমাণ অপ্টিমাম অর্থাৎ সর্বকাম্য অবস্থায় রাখার আর-একটা উপায় দুপুরের খাবার আর রাত্রের খাবারের মাঝে আর-একবার খাওয়া—এবং সে খাবারেও প্রোটিন, ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেট থাকা চাই।

অনেকে সকালে কিছু খান না, খেলেও সে খাবারে খাদ্যগুণ বিশেষ থাকে না। দুপুরে তাঁরা তাড়াহুড়ো করে নাকেমুখে গুঁজে কাজে ছোটেন আর রাত্রে জাঁকিয়ে আকণ্ঠ আহার করেন। এর কোনোটাই হিতকর নয়, বরং সবটাই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন, "Eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper."

ব্রেকফাস্টটা খুবই জরুরী, কারণ "It's the meal that's meant to prepare you for the day." যাঁরা ব্রেকফাস্ট খান তাঁরা কাজে বেশি শক্তি পান। সকালে যে বেশি খেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যাঁরা সকালে খেতে চান না তাঁদের বক্তব্য, ক্ষিধে নেই। অর্থাৎ, রাত্রে তাঁরা বেশি খেয়েছিলেন। রক্তে শর্করার পরিমাণ ৭০ মিলিগ্র্যামের কাছাকাছি না নামলে ক্ষিধে পায় না। রাত্রে আকণ্ঠ খাওয়ার দরুন সকালে শর্করা ঐ মাত্রায় নামতে পারে না। সুতরাং রাত্রে বেশি খাওয়া ঠিক নয়। আসলে রাত্রের খাবার হবে সাদামাটা, তবে পুষ্টিকর। রাত্রে অল্প খাওয়ায় অনেকে রাজী নন। তাঁরা বলেন, দিনে কাজের তাড়ায় খাওয়ার সময় পান না। এটা কোনো কথা নয়। কোনো সময়েই বেশি খাওয়া উচিত নয়—সকাল দুপুর রাত্রি যখনই যে খাবার খান না কেন, তা হবে সাধারণ, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

আমাদের অধিকাংশ অসুখের মূলে ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস। অনুপযুক্ত খাদ্য ও

খাদ্যাভ্যাসের জন্য অনেকে স্থূলদেহী হয়ে পড়েন। তখন মেদ কমানোর জন্য তাঁরা খাওয়া কমিয়ে দেন কি একবেলা খান, সকালের জলখাবার ছেড়ে দেন। এতে বিপরীত ফল হয়, তাঁরা আরও স্থূলকায় হয়ে পড়েন। অনেকে অত্যধিক মিষ্টি খান, তাঁদের রক্তে শর্করার পরিমাণ কম থাকে বলে মিষ্টিজাতীয় খাদ্যের প্রতি তাঁদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। অত্যধিক মিষ্টি খাওয়ার দরুন অন্য অনেক উপসর্গ ছাড়াও তাড়াতাড়ি দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা যদি উপযুক্ত খাদ্য খেতেন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রক্তে শর্করার পরিমাণ প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকত। অনুপযুক্ত খাদ্যের দরুন যেমন অবসাদ, শ্রান্তি, দুর্বলতা আর খিটখিটে ভাব দেখা দেয় তেমনি চিন্তায় ও কর্মে আসে বিশৃঙ্খলা। আজ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত চিন্তায় এত যে বিশৃঙ্খলা বা গোলমাল তার অন্যতম প্রধান কারণ ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস। রক্তে শর্করার পরিমাণ কম হয়ে গেলে চিন্তা গোলমাল হয়ে যায়, কর্মপ্রক্রিয়া হয় মন্থর—আর সেই কারণে নানারকম দুর্ঘটনা ঘটে। মোটর দুর্ঘটনা বা রেল দুর্ঘটনার একটা কারণ এ-ই। অত্যধিক চা কফি সিগারেট আর মদ্যপানেও রক্তে শর্করার পরিমাণে হেরফের হয়। এইসব জিনিসে শরীর উত্তেজিত হয়ে অ্যাড্রিন্যাল হরমোনের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। এই হরমোন রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করে, ফলে দ্রুত ইনস্যুলিন নির্গত হয়—পরিণামে শর্করার মাত্রা আবার কমে যায়। রক্তে শর্করার পরিমাণ বিশেষভাবে কমে গেলে ভাইরাস আক্রমণের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। রক্তে শর্করার পরিমাণ সাঙ্ঘাতিক রকম কমে গেলে যে উত্তেজনা বা খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয়, স্নায়ুমণ্ডলীর উপর চাপ পড়ে এবং মানসিক অবসাদ দেখা দেয় তাতে যে কোনো মানুষ সহজেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তখন কলহ-দ্বন্দ্ব কিছু না। তখন হাতে বন্দুক পিস্তল ছোরা দা বঁটি ব্লেড কিছু থাকলে আত্মহত্যা কি পরহত্যাও অসম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, অনেক নরহত্যার পিছনে এই কারণই কাজ করে থাকে। অ্যামেরিকায় আজ এই সমস্যা মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। অ্যামেরিকানরা আজ বলতে শুরু করেছে, "The American diet has become dangerous in many more ways than one."

সুতরাং আমরা যেন ভুলেও বিলিতি অভ্যাস অনুকরণ করার চেষ্টা না করি। যাদের আমরা 'বেশি সভ্য' মনে করি, অন্তত এ ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে যেন শতহস্ত দূরে থাকি।

উনিশ : আমরা এক মস্ত ফাঁদে

১৯৮৬ সালের ১ জুলাই লণ্ডন থেকে রয়টার একটা ভয়ঙ্কর খবর পাঠিয়েছিল, তাতে পশ্চিমী খাদ্যের অনুকারী লোকদের চোখ খুলে যাওয়া উচিত। খবরটা ছিল, "Britain has one of the worst health records among industrialised countries with the world's highest death rate from heart disease, a report said today." রিপোর্টটা রয়্যাল কলেজ অভ ফিজিশিয়ান্সের ফ্যাকাল্টি অভ কমিউনিটি মেডিসিন কর্তৃক প্রচারিত।

হৃদরোগে মৃত্যুর সবচেয়ে খারাপ রেকর্ড বৃটেনে এবং এই রেকর্ড ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৮৭ সালে বি-বি-সি'র এক রিপোর্টে দেখা যায়, বৃটেনে ৬০ কি ৬৫ বছর বয়সে অবসর নেবার আগে প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের হয় হার্ট অ্যাটাক হবে নয়তো স্ট্রোক হবে। ঐ রিপোর্ট তৈরির আগে লণ্ডনে ডাক্তার, শিক্ষক আর ক্রীড়াবিশেষজ্ঞদের এক সম্মেলনে আলোচনা হয় যে, হৃদরোগ অনেকটাই শিল্পোন্নত দেশের অসুখ, পশ্চিমী খাদ্য আর পাশ্চাত্য দেশের জীবনধারার ফল। কিসে হার্ট অ্যাটাক হয়, অধিকাংশ লোকেরই এখন সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা আছে : ধূমপান, মেদবাহুল্য আর বেঠিক খাদ্য।

প্রি-মেনস্ট্রুয়াল টেনশন বলে ডাক্তারী শাস্ত্রে একটা কথা আছে, সংক্ষেপে বলে পি-এম-টি। সে ঋতুস্রাব-জনিত অসুখ। বৃটেনে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব নারী প্রসেসড জাঙ্ক ফুড অর্থাৎ অতিপরিশোধিত নিঃসার খাদ্য, মদ্যপান আর ধূমপানে আসক্ত, এই অসুখ তাদেরই বেশি হয়। সমীক্ষকরা বলেছেন, বহু আধুনিক খাদ্যে অতিপ্রয়োজনীয় ভিটামিন আর খনিজ দ্রব্যের অভাব থাকে—এবং এই খাদ্যের চল যতই বাড়ছে, গর্ভধারণোপযোগী নারীদের মধ্যে ততই পি-এম-টি'র অ-সুখকর উপসর্গ দেখা যাচ্ছে—উদ্বেগ, স্নায়বিক দৌর্বল্য, খিটখিটে স্বভাব, উদ্যমহীনতা, অনিদ্রা আর স্তনে ব্যথা।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা দু বছর ধরে 'হেলথ অ্যাণ্ড লাইফ-স্টাইল সার্ভে' নামে এক সমীক্ষা চালান। তাতে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড আর ওয়েলসের হাজার হাজার মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বি-বি-সি সেই

জিজ্ঞাসাবাদের খবরাখবর দিয়ে মন্তব্য করেছে, "...millions in Britain might not know the right balance of foods to eat."

কেম্ব্রিজের একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী সার্ জন বাটারফিল্ড বলেছেন, বৃটেনের বহু অল্পবয়সী আর মাঝবয়সী মানুষ বৃদ্ধবয়সের অ-সুখকর অ-কর্মণ্য জীবনের পথে এগোচ্ছে। "If you look with a discerning eye at the public in the market place or on television and watch their health behaviour you will quickly see they could be fitter."

তবে সুখের কথা, বৃটেনে লোকে এখন খাদ্য সম্বন্ধে ক্রমশ সচেতন হচ্ছে; অনেক লোক এখন 'eating for health'. মাছ, তরিতরকারি, ফল, ব্রাউন ব্রেড আর চীজের বিক্রি বাড়ছে। লোকে আগের চেয়ে কম মাখন খাচ্ছে, কম চিনি খাচ্ছে। ১৯৮৫ সালের চেয়ে ১৯৮৬ সালে মাখন খাওয়া প্রায় ১৩ শতাংশ কমেছে, চিনি খাওয়া কমেছে ৭ শতাংশ।

আগেই বলেছি, ব্রেকফাস্টটা খুবই জরুরী; যাঁরা মনে করেন, ব্রেকফাস্টের তেমন দরকার নেই তাঁরা ভুল করেন। বৃটেন সেই ভুল করছিল—বৃটেনে ব্রেকফাস্ট উঠে যেতে বসেছিল। কিন্তু বৃটেনের মানুষ আবার এখন ব্রেকফাস্ট খেতে শুরু করেছে।

ব্রেকফাস্ট বলতে বৃটেনে সাধারণত বোঝায়—প্রথমে এক গেলাস কমলালেবুর রস, তারপর ফ্রায়েড এগ, বেকন, টোম্যাটো, সসেজ আর ব্রেড, সঙ্গে চা অথবা কফি, শেষে পুরু করে মাখন আর মার্মালেড দেওয়া টোস্ট।

দেখাই যাচ্ছে, এই ধরনের ব্রেকফাস্ট স্নেহপদার্থে ভরপুর, এত ফ্যাট শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই শরীরের দিকে যাঁরা তাকান তাঁরা এখন ব্রেকফাস্ট পালটেছেন। তাঁদের ব্রেকফাস্ট এখন ফাইবার-রিচ সিরিয়্যাল আর এক বাটি দুধ এবং সামান্য মার্জারিন আর শুগার-ফ্রি জ্যাম দেওয়া হোল-মীল টোস্ট। ফাইবার-রিচ সিরিয়্যাল মানে বেশি-ছিবড়ে-আছে এমন দানাশস্য দিয়ে তৈরি খাবার, তাতে ভুসিটুসি সবই থাকে, কিছুই ফেলা হয় না। আর হোল-মীল মানেও ভুসিসুদ্ধ গমের আটার তৈরি। ভাঙা ভাঙা গম দেখাও যায় রুটির মধ্যে। শুগার-ফ্রি জ্যাম, বোঝাই যাচ্ছে, যে জ্যামে চিনি থাকে না।

সাদা চিনি যে উপকারী জিনিস নয়, বৃটেন তা বুঝতে পেরেছে—যেমন বুঝতে পেরেছে আমিষ খাদ্যের চেয়ে নিরামিষ খাদ্যই শরীরমনের পক্ষে ভালো।

বৃটেনে নিরামিষাশীদের নিয়ে একসময় প্রচুর ঠাট্টাবিদ্রূপ হত। নিরামিষ আহারের বিরুদ্ধে উপহাস কয়েক শ বছর চলেছিল। এখন স্বর পালটেছে। নিরামিষ ভোজন, বৃটিশরা বলছে ভেজিটেরিয়ানিজম—এখন বেশ বলশালী হয়েছে।

১৯৮৬ সালে বি-বি-সি টেলিভিশনের এক ফুড প্রোগ্র্যামের জন্য একটা সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে, বৃটেনে তখন নিরামিষাশীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। শুধু তাই নয়, আরও প্রায় ১৫ লক্ষ লোক রেড মীট অর্থাৎ গোরু শুওর ভেড়া ছাগল আদি বড়ো জন্তুর মাংস আর ছোঁয় না, কখনও সখনও মাছ অথবা মুর্গির মাংস খায়।

নিরামিষ আহারের প্রতি এই যে আকর্ষণ, এ প্রধানত ১৬ থেকে ২৪ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই বেশি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ঐ বয়সের শতকরা অন্তত ১০ ভাগ ছেলেমেয়ে নিরামিষ খায়।

ভেজিটেরিয়ানিজমের প্রতি আকর্ষণ যে বাড়ছে তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ—স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের কারণেই বেশির ভাগ লোক রেড মীট খাওয়া হয় কমিয়ে দিয়েছে নয়তো একেবারে ছেড়ে দিয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, অত্যধিক মাংস আর চর্বি খেলে হার্টের রোগ আর ক্যান্সার হতে পারে—এবং হার্ট ঠিক রাখার জন্য খাদ্যে সংপৃক্ত ফ্যাটের পরিমাণ কমানো দরকার। সংপৃক্ত ফ্যাট আছে যেসব খাদ্যে তার একটি হল মাংস, বিশেষ করে বড়ো জন্তুর মাংস।

সংরক্ষিত খাদ্যে অনেকরকম অ্যাডিটিভ দেওয়া হয়, মাংসের স্বাদ বাড়াবার জন্য জীবন্ত অবস্থায় অনেক জন্তুকে অধিক মাত্রায় হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়—এতেও অনেকে উদ্বিগ্ন। কারণ, শরীরের পক্ষে এর কোনোটাই ভালো নয়। আবার এমন লোকও আছেন যাঁরা নৈতিক কারণেই হোক অথবা ধর্মীয় কারণে, প্রাণিহত্যার বিরোধী। সুতরাং বৃটেনে মাংস খাওয়া কমছে।

মূল্যবৃদ্ধিও একটা কারণ। বৃটেনে মাংসের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে মাংস অনেকেরই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

আবার, পরিবেশ-সচেতন কিছু লোক, তাঁদের মধ্যে যুবকযুবতীই বেশি—মাংসভোজনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। তাঁদের বক্তব্য, অধিক হারে মাংস খাওয়ার জন্য কৃষি-উৎপাদনে বিকৃতি এসেছে। যত বেশি মাংসের চাহিদা বাড়ছে তত বেশি গবাদি পশু পালন করতে হচ্ছে এবং তাদের খাদ্য

যোগাতে মানুষের খাদ্যে টান পড়ছে। পৃথিবীতে এখন যত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যে পশু পরে মানুষের ভোজ্য হয়।

নিরামিষভোজীদের বক্তব্য, মাংসের জন্য পশুপালন করতে গিয়ে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য তাদের উদরে প্রেরণ করতে হয় তা যদি মানুষই খেত তাহলে মানুষের অনেক উপকার হত।

প্রতি বছর ৭ এপ্রিল পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। ১৯৮৬ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে পশ্চিম জার্মানির বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন হয়ে জানালেন, "Poor eating habits, smoking, drinking and general lack of fitness were contributing to sickness and disease···and a staggering health bill for the country."

তাঁরা বললেন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অর্থাৎ অপুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের দরুন পশ্চিম জার্মানদের বছরে ৪,০০০ কোটি মার্ক দণ্ড দিতে হচ্ছে আর কায়িক পরিশ্রম না করার দরুন দণ্ড দিতে হচ্ছে আরও ২,০০০ কোটি মার্ক। এক মার্ক আমাদের ১০ টাকার উপর।

পশ্চিম জার্মানির অধিকাংশ অসুখই সচ্ছল সমাজের ফসল। হৃদরোগ, রক্তসঞ্চালন-সমস্যা, ক্যান্সার আর বাত অকালে বহু প্রাণ হরণ করছে। অতিভোজন, অধিক পরিমাণে স্নেহযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, ধূমপান, মানসিক চাপ এবং কায়িক পরিশ্রমের অভাবই প্রধানত এইসব রোগের কারণ।

তবে সম্প্রতি জার্মানরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক সচেতন হয়েছে। তারা কায়িক পরিশ্রম হরছে, 'স্বাভাবিক' খাদ্যের প্রতি ঝুঁকছে, ধূমপানের নেশা ছাড়ছে।

ধূমপানের নেশা পশ্চিমের অনেক দেশের মানুষই আজ ছেড়ে দিচ্ছে—এবং হাতে হাতে তার সুফল পাচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ধূমপানের নেশা ক্রমশ বাড়ছে এবং তার ফল হচ্ছে মারাত্মক। ১৯৮৮ সালের ৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজ্যসভায় জানান, ভারতে প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ তামাক-জনিত রোগে মারা যায়।

১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে মার্কিন স্বাস্থ্যসচিব লুই সালিভ্যান সাংবাদিকদের

বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হার্টের অসুখ আর স্ট্রোক যে এখন অনেক কমেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ, লোকে এখন অনেক কম সিগারেট খাচ্ছে, "The percent of adult men who smoke was down to 32 percent ; the percentage of women smokers down to 27 percent in 1987."

মার্কিন জনস্বাস্থ্য বিভাগ ১৯৭০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত এই ১৬ বছরের হিসাব নিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছেন। রিপোর্টটা ১৯৮৯ সালের ১৫ মার্চ প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, "The U.S. population has experienced a dramatic decline in deaths from heart disease and stroke, and life expectancy at birth continues to increase."

রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই ১৬ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হৃদরোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে ৩১ শতাংশ আর স্ট্রোকে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে ৫৩ শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর প্রথম প্রধান কারণ হৃদরোগ আর তৃতীয় প্রধান কারণ স্ট্রোক।

হার্টের অসুখ আর স্ট্রোকের একটা বড়ো কারণ ধূমপান। অন্য কারণও আছে। ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের একটি কমিটি সেই কারণগুলি অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। রিপোর্টটি ১৯৮৯ সালের ১ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, খাদ্যে ফ্যাটের পরিমাণ যদি কমানো যায় আর ফলমূল ও শাকসবজির পরিমাণ যদি বাড়ানো যায় তাহলে হার্টের অসুখ, ক্যান্সার ও অন্য অনেক ক্রনিক রোগব্যাধির সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে দূর করা যেতে পারে।

তিন বছর ধরে গবেষণার পর মার্কিন জনগণকে তাঁরা বলেছেন, রোজ যত ক্যালরি খাদ্য খেয়ে থাকেন তার ৩০ শতাংশ কি তারও কম খাবেন ফ্যাট আর কোলেস্টেরলও যেন রোজ ৩০০ মিলিগ্র্যামের নিচে থাকে ; রোজ নানারকম শাকসবজি আর ফল খাবেন ; খুব বেশি প্রোটিন খাবেন না।

কার্ডিও-ভাসকিউলার রোগের সঙ্গে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আর কোলেস্টেরলের একটা সম্পর্ক আছে বলে তাঁরাও মনে করেন। তাঁরাও দেখেছেন, হাই-ফ্যাট ডায়েটের দরুন অনেকরকম ক্যান্সার হয়, বিশেষ করে মলাশয়, প্রস্টেট আর স্তনের ক্যান্সার।

কমিটি স্পষ্ট করে বলেছেন, "The intake of fat and cholesterol

can be reduced by substituting fish, poultry without skin, lean meats and low- and non-fat dairy products for fatty meats and whole-milk dairy products···and by limiting oils, fats, egg yolks and fried and other fatty foods."

খাদ্যে ফ্যাটের পরিমাণ যে কমানো হল তার পরিবর্তে তাঁরা বেশি করে ফল, তরিতরকারি আর স্টার্চ এবং অন্যান্য কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট খেতে বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, মোট ক্যালরির ৫৫ শতাংশেরও বেশি কার্বোহাইড্রেট খাওয়া যেতে পারে—রুটি আর সিরিয়্যাল।

কমিটি বলেছেন, সবুজ আর হলুদ রঙের তরিতরকারি আর লেবুজাতীয় ফল ফুসফুস, পাকস্থলী ও মলাশয়ের ক্যান্সার অনেকখানি প্রতিরোধ করে।

বেশি প্রোটিন সম্বন্ধে কমিটি বলেছেন, হাই-প্রোটিন খাদ্যে কিছু উপকার আছে বলে জানা যায় না, কিন্তু ক্ষতি যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অত্যধিক প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যান্সার আর করোনারি হার্ট ডিজিজ হতে দেখা গেছে। একজন সাধারণ স্বাস্থ্যবান মানুষের রোজকার খাদ্যে তাঁর দেহের প্রতি কিলোগ্র্যাম ওজনে ১·৬ গ্র্যাম হিসাবে প্রোটিন থাকলেই যথেষ্ট, তার বেশি কখনও নয়।

কিন্তু উপদেশ আর ক'জন শোনে! ধূমপানের ব্যাপারে মার্কিনরা উপদেশ অনেকটা মানলেও এমনি খাবারের বেলায় বড়ো একটা মানতে চাইছে না। ডায়েটিং অবশ্য করছে অনেকেই, কিন্তু সে ডায়েটিং হাস্যকর।

অ্যামেরিকায় ডায়েটিং নিয়ে এক মজার খেলা চলেছে। ডায়েট কনশাস অ্যামেরিকানরা একদিকে লেটুসপাতা খেয়ে ওজন কমাচ্ছে, অন্যদিকে গেটো (ক্রীমের পুর দেওয়া খুব রিচ একরকম কেক) খেয়ে ওজন বাড়াচ্ছে। ন্যাশন্যাল রেস্টর্যাঁ অ্যাসোসিয়েশন ব্যাপারটাকে 'ডায়েটারি স্কিটসোফ্রিনিয়া' আখ্যা দিয়েছে। তারা দেখছে, 'স্বাস্থ্যসচেতন' লোকেরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে স্যালাড আর সোডা কিংবা অন্য কোনো মিনারেল ওয়াটার খেয়ে চকোলেট কেকের অর্ডার দিচ্ছে।

১৯৮০-র দশকে অ্যামেরিকায় 'কটিদর্শী' মহিলাদের মধ্যে 'কৃশ' খাদ্যের প্রতি একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু সমীক্ষায় দেখা যায়, ১০ বছর আগে তাঁরা যত ক্যালরি আত্মসাৎ করতেন, এখনও তা-ই করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগ প্রতি বছর ১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সের

নারীদের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে একটা সমীক্ষা করে। তাদের ১৯৮৬ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, প্রধানত লো-ফ্যাট মিল্ক মানে মাখন-তোলা দুধ আর লীন মীট অর্থাৎ মুর্গির মাংস, মাছ ইত্যাদি খাওয়া বাড়ার ফলে ফ্যাট থেকে ক্যালরি আহরণের পরিমাণ কমেছে ঠিক, কিন্তু পিসা, ক্যাণ্ডি, কেক, আইসক্রীম প্রভৃতি খাওয়ার দরুন কার্বোহাইড্রেট থেকে ক্যালরির পরিমাণ বেড়েছে। হরেদরে শেষকালে এক হয়ে যাচ্ছে, কাজের কাজ হচ্ছে না কিছু।

আসলে লোকে ক্যালরি নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসে, কিন্তু খাওয়ার সময় মুখরোচক খাবারই খেতে চায়।

পশ্চিমী ধাঁচের খাদ্য যে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী নয়, জাপানও তা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করছে। জাপানের মানুষ ক্রমশ ওয়েস্টার্ন-স্টাইলের খাদ্যে আকৃষ্ট হচ্ছে আর হার্টের অসুখে মারা যাচ্ছে। ১৯৮৬ সালে একটি সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগের বছর অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে জাপানে ৭,৫২,০০০ লোক মারা গেছে; তার মধ্যে ক্যান্সারে মারা গেছে ১,৮৮,০০০ জন, হার্টের অসুখে ১,৪১,০০০ জন আর স্ট্রোকে ১,৩৫,০০০ জন।

সেটসুকো কুরোডা নামে একজন জাপানী সমালোচক বলেছেন, আজকের এই প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজে জাপানীরা আর বাঁচার জন্য খায় না, খাওয়ার জন্য বাঁচে। "খাওয়া এক ধরনের ফ্যাশন, নিজের লাইফ-স্টাইল জাহির করা। নইলে ঐ যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ঠাণ্ডার মধ্যে, বরফ-পড়া রাত্রে আইসক্রীমের ফ্যান্সি দোকানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়, সে তো তারা ক্ষুধার্ত বলে নয়, খেতে হবে বলে।"

আইসক্রীম নিয়ে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে। ১৯৮১ সালের ৭ অগাস্ট 'গুয়াংমিং ডেলি' নামে চীনের একটি সংবাদপত্রে খবর ছাপা হয় যে, চীনারাই প্রথম আইসক্রীম আবিষ্কার করে এবং সে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে—তারপর ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো আইসক্রীমের প্রস্তুতপ্রণালী ইয়োরোপ নিয়ে যান।

সংবাদপত্রটি ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত একটি জাপানী মেডিক্যাল ম্যাগাজিনের খবর উদ্ধৃত করে বলে যে, আইসক্রীমের প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন রাজপরিবারের মধ্যেই গোপন রাখা হয়েছিল এবং ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পরেও

কিছুকাল গোপন ছিল। মঙ্গোল সম্রাট কুবলাই খান (১২৬০-১২৯৫) রাজ-প্রাসাদের বাইরে আইসক্রীম তৈরি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু মার্কো পোলো যখন চীন সফরে আসেন তখন তাঁকে আইসক্রীম তৈরির কায়দাকানুন শিখিয়েছিলেন এবং মার্কো পোলোই তা ইতালির রাজপ্রাসাদে জানিয়েছিলেন। ইতালির রাজপ্রাসাদ ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তা গোপন রেখেছিল, তারপর ফরাসী রাজপ্রাসাদের কাছে প্রকাশ করেছিল। ফরাসী রাজপ্রাসাদ থেকেই আইস-ক্রীমের প্রস্তুতপ্রণালী ফাঁস হয়ে যায়।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের একটি সংবাদপত্রে আইসক্রীমের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—এবং তারপর আস্তে আস্তে আইসক্রীম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

আসলে, খাদ্যের ব্যাপারে প্রায় সারা পৃথিবীই আজ এক মস্ত ফাঁদে পড়ে গেছে। সারা পৃথিবীর সভ্য সমাজের কোথাও আজ আগেকার মতো পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায় না। জনবহুল অনুন্নত দেশগুলিতে এক ধরনের সমস্যা, জনবিরল উন্নত দেশগুলিতে আর-এক ধরনের সমস্যা। যে ধরনের সমস্যাই হোক না কেন, পুষ্টির ব্যাপারে সভ্য সমাজ আজ সঙ্কটে।

জনবহুল অনুন্নত দেশগুলিতে খাদ্যাভাবই অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ; জনবিরল উন্নত দেশগুলিতে অপুষ্টির প্রধান কারণ সিন্থেটিক ফুড এবং অত্যধিক প্রসেস-করা আর রিফাইন-করা খাদ্য।

তথাকথিত সভ্যতার আলো পৌঁছয় নি, এমন জায়গা এখনও কিছু আছে —এবং পৃথিবীর নানা অংশেই আছে। তারই কতকগুলি জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, কোনো কোনো জাতির খাদ্য প্রধানত মাছ বা মাংস, আনাজ শস্য মোটেই না; আবার, কোনো কোনো জাতির খাদ্য শুধুই শাকসবজি আর দানাশস্য, মাছমাংস একেবারে না। উভয় জাতির খাদ্যে কোনো মিলই নেই, কিন্তু কোনো জাতিরই খাদ্য অসম্পূর্ণ নয়। তাদের দেহের সমস্ত প্রয়োজনই মেটে শুধুই আমিষ অথবা শুধুই নিরামিষ খাদ্যে—এবং বলা বাহুল্য, সেই খাদ্য পরিশোধিত বা পরিমার্জিত নয়। রিফাইন করা বা প্রসেস করা দূরের কথা, এসবের নাম পর্যন্ত তারা কোনোদিন শোনে নি।

কিন্তু তাদের শরীরস্বাস্থ্য ঈর্ষণীয়। চোখ টান টান করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তাদের দেহ যেমন দীর্ঘ তেমনি সুপুষ্ট সুঠাম। তারা সদাপ্রফুল্ল। রোগব্যাধি কী তা তারা জানেই না বড়ো একটা। ক্যান্সার,

আলসার, হাই ব্লাড প্রেশার, যক্ষা, হার্ট ও কিডনির অসুখ, মাসকিউলার ডিসট্রফি, মালটিপ্‌ল্ স্ক্লেরোসিস ইত্যাদি গালভরা নাম যেসব রোগের সেইসব রোগ তাদের চৌহদ্দি থেকে শত যোজন দূরে। তাদের সমাজে ডাক্তার কবিরাজ হেকিম বলে কেউ নেই। অপরাধ না, কারগার না—সভ্য সমাজের অসভ্য কোনো ব্যাধি না। উজ্জ্বল শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মনোরম মানসিক, নৈতিক ও আনুভূতিক স্বাস্থ্যের অধিকারী তারা।

এইরকম এক 'অন্ধকার' দেশ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে এক 'আলোকময়' দেশে গিয়ে অনুসন্ধানীরা বিস্মিত হয়ে গেছেন। সেখানে সাদা মানুষেরা সাদা চিনি এনেছিল, সাদা ময়দা এনেছিল, এনেছিল তথাকথিত সভ্যতার আলোক। সেখানকার মানুষ দীর্ঘ ঋজুদেহী নয়, তাদের দেহের কাঠামোয় যেমন ত্রুটি তেমনি তাদের দেহে নানা রোগের আশ্রয়। সেখানে ক্যান্সার পাওয়া গেছে, আলসার পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে হাই ব্লাড প্রেশার, হার্ট আর কিডনির অসুখ, যক্ষা, কোলাইটিস প্রভৃতি বড়ো বড়ো রোগ। সেখানে অপরাধ ঘটে, শারীরিক ও মানসিক বিকৃতি ঘটে—এমন কি, চরিত্রবিকৃতিও দেখা যায়।

আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে যন্ত্রদক্ষ প্রাগ্রসর দেশ অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সে দেশের মানুষ ঐ 'অন্ধকার' দেশে আজও যারা 'আদিম' রয়ে গেছে তাদের কাছে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে ঔজ্জ্বল্যে দাঁড়াতে পারে না। সারা পৃথিবীতে আজ হৃদরোগে আর ক্যান্সারে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই মৃত্যু ঘটে সবচেয়ে বেশি। স্ট্রোক, হাই ব্লাড প্রেশার, এমফিসিমা, ডায়াবিটিজ ইত্যাদি রোগ অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নতুন রোগেরও জন্ম হচ্ছে। অপরাধ-সঙ্ঘটন, মদ্যপান বা মাদকসেবন, অসামাজিক যৌনাচার, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি সে দেশে তুঙ্গে।

অথচ, সারা পৃথিবীর লোক জানে এবং অ্যামেরিকানরাও অনেকে বিশ্বাস করে, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরাই সবার চেয়ে ভালো খায়। কিন্তু অ্যামেরিকান বিশেষজ্ঞরাই এখন বলতে শুরু করেছেন, "Being abundantly fed with refined foods does not make a nation best-fed."

তাঁরা বলছেন, "America is the most unfit nation in the world. It has the highest rate of heart disease, of cancer and of degenerative disease. And, the worst of it is that whatever

the U.S. does and however it lives the rest of the world wants to do the same."

এই শেষের কথাটি যে কতখানি সত্যি, বলে বোঝানো শক্ত। এই কথাটি খুব বেশি করে সত্যি প্রাচ্য দেশগুলিতে। প্রাচ্যের বহু দেশে আমি নিজে এটা প্রত্যক্ষ করেছি।

ভারতবর্ষের একটা মস্ত গর্ব, এদেশের একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। এদেশের মানুষ অপর দেশের কিছু সহজে অনুকরণ করে না, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যা প্রয়োজনীয় মনে করে তা আত্তীকরণ করে। কিন্তু আজ আমরাও এক মস্ত ফাঁদে পড়ে গেছি। খাদ্যের ব্যাপারেও আমরা আজ অ্যামেরিকার অনুকারী হয়ে পড়ছি। অত্যাধুনিক হবার বাসনায় অ্যামেরিকার অনুকারী হয়ে আজ আমরা অনেকেই সিন্থেটিক ফুড আর সিন্থেটিক ভিটামিন এবং অত্যধিক রিফাইন-করা আর প্রসেস-করা খাদ্যের দিকে ঝুঁকছি। অ্যামেরিকান বিশেষজ্ঞদের কথাও কানে তুলছি না।

'অ্যামেরিকান অ্যাকাডেমি অভ নিউট্রিশন'-এর ন্যাশন্যাল সেক্রেটারি ডঃ ডাবলিউ ডি কারিয়ার স্পষ্ট লিখেছেন, "We cannot get adequate nutrition even to sustain life from synthetic foods and vitamins. They will only help, and they may lull us into a false sense of security. We must get our real sustenance from our food, from good food."

অ্যামেরিকান খাদ্যবিশেষজ্ঞরা অবশ্য এখন বলেছেন, "The nutritional value of modern processed and preserved foods is now probably greater than it has ever been before, and the major food chemicals (carbohydrates, fats and proteins) are kept in a fresh, palatable and nutritionally satisfactory state. Minerals are, of course, completely unaffected either by heat processing or by chemical preservation. Generally, therefore, any question about the nutritional adequacy of processed foods must be confined to the area of vitamins. Vitamins, with the one exception of vitamin B_1 (thiamine) which is destroyed by sulphur dioxide, are completely unaffected by the presence of

preservatives in foods. They are, however, damaged by heat, and vitamin C (ascorbic acid) is the most sensitive in this respect. Modern processing methods have now advanced to the stage where the loss of this or any other vitamin can be minimized so that vitamin deficiency in processed foods (if any exists) is almost certainly the result of bad domestic handling, e. g. exposure of foods to air and metal containers at room temperature for long periods, or over-roasting, over-boiling or soaking of foods for long periods. If proper attention is paid to home cooking methods, consumers can rest assured that commercially processed and preserved foods are little—if at all—inferior to fresh ones." (Birch, Spencer and Cameron)

কিন্তু এ তো সেই দেশের কথা যে দেশে ব্যবসায়ীদের এখনও কিছু নীতিবোধ আছে—যারা ওষুধে খাদ্যে ভেজাল দেয় না, নকল জিনিস দিয়ে আসল জিনিসের দাম নেয় না, এক জিনিস দেখিয়ে আর-এক জিনিস বেচে না, ওজনে ঠকায় না। কিন্তু আমাদের দেশে ?

কুড়ি : সাতটি নির্দেশ

আমাদের পূর্বপুরুষরা সুখাদ্যের মূল্য বুঝতেন এবং পুষ্টিবিজ্ঞানের জন্মের অনেক আগে থেকেই তাঁরা সুখাদ্য খেতেন। সুখাদ্য নির্বাচন করতে ক্যালরি প্রোটিন ভিটামিন প্রভৃতি ভারী ভারী কথা জানার দরকার হয় না, দরকার হয় কোন্ খাদ্যের কোন্ গুণ আর সেইসব গুণ মিলে কীভাবে সুখাদ্য হয় তা জানার।

আমাদের রোজকার খাদ্যে যতখানি সম্ভব জৈব প্রোটিন আর জৈব ফ্যাট থাকা দরকার। ডাল, টাটকা শাকসবজি, ফলমূল ও কিছুটা দুধও প্রয়োজন। ভাতের পরিবর্তে একবেলা হাতে গড়া আটার রুটি খাওয়া যেতে পারে।

অধিকাংশ শাকসবজিই ভিটামিন-ডি ছাড়া অন্যসব ভিটামিন আর লবণ-জাতীয় পদার্থে সমৃদ্ধ। পালংশাক সকল শাকের সেরা। ভিটামিন ছাড়াও এতে প্রচুর পরিমাণে লৌহঘটিত লবণ আছে। এতে স্যাপোনিন নামে এক-জাতীয় পদার্থ আছে, তাতে পাচক-রস নিঃসরণে এবং পরিপাকযন্ত্রের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণে বিশেষ সুবিধা হয়। এতে ডিমের কুসুম ও মাখনের মতোই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-এ পাওয়া যায়। লেটুসশাকে ভিটামিন-বি ও ই আছে যথেষ্ট। গাজরে আছে ভিটামিন-এ। বেগুনে ভিটামিন-বি$_২$। টাটকা পাকা-লঙ্কায় ভিটামিন-এ ও সি দুই-ই পাওয়া যায়। মটর মুসুর মুগ ছোলা ইত্যাদি ডালে পাওয়া যায় ভিটামিন-বি। পোস্তয় প্রচুর ভিটামিন-বি$_১$ ও বি$_২$ আছে। অঙ্কুরিত মুগ ও ছোলায় আছে ভিটামিন-সি। ডিম আর দুধে ভিটামিন-এ, বি ও ডি আছে যথেষ্ট। আপেল আঙুর কমলা নাসপাতি প্রভৃতি ভিটামিন-সি'তে ভরপুর। এইসব ফল যদি মহার্ঘ মনে হয় তাহলে আম লিচু আনারস পেয়ারা কাগজিলেবু বাতাবিলেবু কলা পেঁপে এবং টোম্যাটো স্বচ্ছন্দে খাওয়া যেতে পারে। ইংরেজীতে বলা হয়, **"An apple a day keeps doctor away."** ডঃ নীলরতন ধর কথাটাকে একটু বদলে বলেছেন, **"A tomato a day keeps doctor away."** আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডঃ ধরের এই কথা সম্পর্কে বলেছেন, "এ কথার মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে।" তিনি বলেছেন, "ভাইটামিন সি ও এ'র মূর্ত্তিমান অবতার আপেল বিনিন্দ্যকান্তি এই লিবেস

আপ্‌ফেল্‌কে (Liebes Apfel—প্রেমফল—জার্মান) বাংলার তুলসীকুঞ্জের ন্যায় প্রত্যেক গৃহ প্রাঙ্গণেই সাদরে স্থান দেওয়া কর্তব্য। সুপক্ব বিলাতী-বেগুনের বর্ণসৌষ্ঠবে স্বতই বলিতে ইচ্ছা করে,—'লোলকান্ত্যা যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি।' "

ডঃ র‍্যাসমাস অ্যালস্থাক্যার তাঁর 'দি মাস্টার কী টু হেল্‌থ্‌' গ্রন্থে বলেছেন, "In general the food intake should be selected from fresh fruits, fresh vegetables, both cooked and raw, grain foods or cereals unspoiled by being too highly refined, natural sweets such as the sweet fruits, honey, and maple sugar, milk, meat, fish and nuts···At least three-fourths of the bulk of the food intake should consist of fresh fruits and vegetables, both cooked and raw. If this rule is observed, healthy people will find it much easier to remain that way and sick people will find it easier to regain health."

হিপোক্রেটিস (খৃষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৫৯) বলেছিলেন, "Growing bodies have the most innate heat ; they require the most food, for otherwise their bodies are wasted. In old people, the heat is feeble and they require little fuel." তিনি আরও একটা কথা বলেছিলেন, "Persons who are naturally very fat are apt to die earlier than those who are slender." অতিভোজন প্রসঙ্গে তাঁর এই কথাটা আজকের বিজ্ঞানীদের মুখেও শোনা যায়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) বলেছিলেন, সব সময়েই পর্যাপ্ত পুষ্টির প্রয়োজন, এবং 'where flame cannot live, no animal can sustain its existence.'

এখানে একটা কথা বলা দরকার, আমারা যা-কিছু খাই, পুষ্টিবিজ্ঞানে তা-ই খাদ্য বলে বিবেচিত হয় না ; চা কফি পান ইত্যাদি খাদ্যের মধ্যে গণ্য হয় না। আমরা যা খাই ও যার দ্বারা আমাদের শরীরে ক্ষয়নিবারণ, পুষ্টিসাধন, তাপজনন ও শক্তিসঞ্চয়ন হয় তা-ই যথার্থ খাদ্য।

কিন্তু নিখুঁত খাদ্যতালিকা কী, বলা শক্ত। তবে শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য শ্বেতসার, শর্করা, প্রোটিন আর ফ্যাট জাতীয় খাদ্য দরকার এবং সেই খাদ্য 'ব্যালান্স' করতে হবে টাটকা শাকসবজি আর ফল দিয়ে। শ্বেতসার, শর্করা,

প্রোটিন আর ফ্যাট শরীরটাকে অ্যাসিডিক করে দিতে চায় অর্থাৎ 'ব্যালান্স' নষ্ট করে দিতে চায়। শাকসবজি আর ফলের চাওয়াটা সম্পূর্ণ বিপরীত। শাকসবজি আর ফলের চেষ্টা, শরীরটাকে অ্যালক্যালাইন করে দেওয়া অর্থাৎ শরীরে অ্যাসিডের পরিমাণ যাতে খুব বেশি হয়ে না যায় তা দেখা। এখন প্রশ্ন, কীকরে শরীরের অ্যালক্যালাইন ব্যালান্স ঠিক রাখা যায়? উত্তরে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, যা খান, আয়তনের দিক দিয়ে তার চারভাগের অন্তত তিনভাগ যেন শাকসবজি আর ফল হয়, বাকি একভাগ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট।

স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করলে, যে খাদ্যে কোনো পুষ্টি নেই কিংবা কোনো-না-কোনোভাবে তার পুষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে সে খাদ্য যতদূর পারা যায়, না খাওয়াই ভালো, যেমন—সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ক, কৃত্রিম অর্থাৎ রাসায়নিক 'ফলের রস' আর 'ফলের গুঁড়ো', জ্যাম জেলি ইত্যাদি অত্যধিক সাদা চিনি দেওয়া জিনিস, পালিশ করা সাদা চাল, সাদা ময়দা বা সাদা ময়দা দিয়ে তৈরি পাঁউরুটি বিস্কুট নুডল ম্যাক্যারনি ইত্যাদি জিনিস, রং দেওয়া খাদ্য, রাসায়নিক দিয়ে নিষ্কাশিত রিফাইন করা তেল, বনস্পতি প্রভৃতির মতো হাইড্রোজেন-সহযোগে জমানো তেল কিংবা তা দিয়ে তৈরি খাদ্য, নারকেল তেল, প্রসেস করা চীজ, অত্যধিক প্রিজার্ভেটিভ অর্থাৎ সংরক্ষক দেওয়া খাদ্য। এইসব খাদ্যসামগ্রীর অনেকগুলি এমনিতে হয়তো ক্ষতিকর নয়, কিন্তু এতে ক্ষুধা নষ্ট হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া যায় না বলে শরীরের ক্ষতি হয়।

পুষ্টির ব্যাপারে সব সময় একটা কথা মনে রাখা দরকার, কোনো পুষ্টিদ্রব্যই এককভাবে কিছু করতে পারে না। সুতরাং কোনো একটি পুষ্টিদ্রব্যের উপর জোর দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সম্পূর্ণ প্রোটিন থেকে প্রাপ্ত ১০টি অ্যামিনো অ্যাসিড, তেল থেকে সংগৃহীত লাইনোলিক অ্যাসিড আর প্রায় ১৫ রকমের ভিটামিন ও ১৫ রকমের খনিজ পদার্থ খাদ্যে থাকতেই হবে—এবং সবগুলি একসময় খেলেই ভালো হয়। মনে রাখতে হবে, কোনো পুষ্টিদ্রব্যই অন্যের ভার বহন করতে পারে না, পুষ্টির বেলায় যার-যার তার-তার। এই পুষ্টিদ্রব্যগুলির মধ্যে কোনোটিই বাদ দেওয়ার মতো নয়। একটিও যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি। মানুষে মানুষে ভেদ থাকলেও এই ৪০টি পুষ্টিদ্রব্যের বেলায় কোনো ভেদ নেই, নারী-পুরুষ সুস্থ-অসুস্থ এবং শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের খাদ্যে এই ৪০টি পুষ্টিদ্রব্য থাকা চাই—এবং যেহেতু

এর অনেকগুলি আমাদের প্রচলিত খাদ্য থেকে সব সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না সেইহেতু কিছু সাপ্লিমেণ্ট অর্থাৎ অভাবপূরণের জন্য ট্যাবলেট ক্যাপসিউল আদি খাওয়ার দরকার হতে পারে কখনও কখনও।

স্বাস্থ্যকর খাদ্য যদি পাওয়া যেত তাহলে একমাত্র ভিটামিন-ডি ছাড়া অন্যকিছুর জন্য ট্যাবলেট ক্যাপসিউল ইত্যাদির বিশেষ দরকার হত না। কিন্তু আজকের দিনে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর খাদ্য দুর্লভ। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর খাদ্য বলতে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সহজ সরল স্বাভাবিক খাদ্য খেতেন সেই খাদ্য—ধোঁয়াশা, রাসায়নিক সার আর বিষাক্ত কীটনাশক ও রোগনাশকের স্পর্শবিহীন স্বাভাবিক উর্বর জমিতে উৎপন্ন শস্যফসল শাকসবজি আর ফলমূল ; সবুজ মাঠে চরা সুপুষ্ট গোরু কিংবা মোষের পাস্তুরাইজ না-করা, হোমোজিনাইজ না-করা দুধ ; রাসায়নিকের স্পর্শবর্জিত মাছ ; মোরগের সঙ্গে থাকা, খোলা জায়গায় ছোটাছুটি করা, সারের গাদায় পোকা খোঁটা মুর্গির ডিম ; খাসি না-করা জন্তুর মাংস ; রিফাইন কিংবা প্রসেস না-করা খাদ্য।

আজ মাথা খুঁড়ে মরলেও এমন খাদ্য অনেকের কপালে জুটবে না, শহরের অধিবাসীদের তো নয়ই। গ্রামের লোকেরাও আজ আধুনিক হওয়ার প্রয়াসে শহরের লোকদের দেখাদেখি 'সুখাদ্য' ছেড়ে 'কুখাদ্য' খেতে শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন লোকেরা যেমন আছেন তেমনি সঙ্গতিহীন লোকেরাও আছেন। গ্রামের অনেক ঘরেই আজ স্বাভাবিক খাদ্যের পরিবর্তে কৌটো কিংবা শিশিতে ভরা, পলিথিন অথবা কাগজে মোড়া 'আধুনিক' খাদ্যের সমাদর। দুধের শিশুও আজ মাতৃস্তন থেকে বঞ্চিত, তার প্রাণ কৌটোয় পোরা।

পুষ্টির ব্যাপারে সর্বদা মনে রাখা দরকার, প্রকৃতি আমাদের দেহে বিভিন্ন পুষ্টিদ্রব্যের মধ্যে একটা সমতা বিধান করে দিয়েছে, আমাদের উপায় নেই তার হেরফের করি। বি-ভিটামিনের কথা আমাদের মনে আছে। তাছাড়া একটি পুষ্টিদ্রব্যের পরিশোষণ, পরিব্যবহার ও পরিরক্ষণ অনেক সময় নির্ভর করে আর-একটি পুষ্টিদ্রব্যের উপস্থিতির উপর। যেমন ধরুন, পর্যাপ্ত পরিমাণ ফ্যাট অথবা ভিটামিন-ডি ছাড়া ক্যালসিয়ম নিরর্থক, কারণ সেই ক্যালসিয়মের পরিশোষণ হবে না, পরিব্যবহার না—এবং সমতার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ফ্যাটের সঙ্গে অর্ধেক পরিমাণ ম্যাগনেসিয়মও চাই। আবার, ভিটামিন-ই ছাড়া ভিটামিন-এ কোনো কাজের নয়। ভিটামিন-এ রক্ষা করতে ভিটামিন-ই চাই। এই রকম আরও আছে। সকলের পক্ষে সব জানা সম্ভব নয়। জানলেও সব সময় মেনে চলা

অসম্ভব। কিন্তু স্বাভাবিক খাদ্যের বেলায় এত অঙ্ক কষার দরকার হয় না। স্বাভাবিক খাদ্য স্বাভাবিকভাবেই অঙ্ক মিলিয়ে সমস্যার অনেকখানি সুরাহা করে দেয়। আমরা ছাড়া পেয়ে যাই।

সত্যিকারের পুষ্টিকর খাদ্য আজ সত্যিই দুর্লভ। যে খাদ্যে যে যে গুণ বা পুষ্টি থাকা দরকার, এখন আর তা থাকে না। কেন থাকে না, আগেই বলেছি।

তাই বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আগের যুগ ফিরিয়ে আনার কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকলেও হবে না। এর মধ্য থেকেই যতখানি সম্ভব ভালো খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং ভালোভাবে রান্না করতে হবে। ভালো, পুষ্টিকর খাদ্যও রান্নার দোষে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নামী দামী 'উপকারী' খাদ্য খেলাম বলে মনের তৃপ্তি সাধন করা গেলেও শরীরের যথেষ্ট পুষ্টি বিধান করা না-ও যেতে পারে। আপনি কতখানি স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন তা নির্ভর করছে আপনার খাদ্যের নির্বাচন ও প্রস্তুতপ্রণালীর উপর। বাজার থেকে কি বাগান থেকে বাছা বাছা টাটকা পুষ্টিকর খাদ্য যদি আপনি আনেনও, রান্নাঘরে রাঁধুনীর অজ্ঞতায় অবহেলায় অনবধানতায় তার কতকগুলি ভিটামিন আর অনেকগুলি খনিজ পদার্থ শতকরা ৬০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সুতরাং কেবল খাদ্যনির্বাচনই যথেষ্ট নয়, তার প্রস্তুতপ্রণালীও লক্ষণীয়। দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই বলে দুইয়ের উপর গুরুত্ব দিলেই যে আপনি সব সময় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন তা না-ও হতে পারে। তবে দুইয়ের কোনো একটাকে যদি খাটো করে দেখেন তাহলে আপনি যে রোগব্যাধির শিকার হতে পারেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বিচক্ষণ মা-বাবারা অভিজ্ঞতা, নীতিকথা আর ধর্মানুশাসনের উপর ভিত্তি করে তাঁদের সন্তানসন্ততিদের একটা জীবনধারা স্থির করে দিয়েছেন। সেই জীবনধারা বংশপরম্পরায় চলে আসছে। তাতে আছে—

১. ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আহার করবে এবং সেই আহারে থাকবে ভাত রুটি আদি শস্যজাতীয় খাদ্য, শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ;
২. প্রতিদিন মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম করবে ;
৩. মদ্যপান ও অন্যান্য মাদকসেবনের ব্যাপারে মিতাচারী হবে ;
৪. প্রত্যহ বিশ্রাম আর চিত্তবিনোদনের জন্য কিছুটা সময় রাখবে—বিশেষ করে, আহারের পর ;

৫. যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমোবে—বিশেষ করে, অল্পবয়সে ; এবং
৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখবে—নিজের পরিচ্ছন্নতা ও গৃহের পরিচ্ছন্নতা।

প্রাচীন গ্রীসে হিপোক্রেটিসের সময় থেকে চিকিৎসকরা বলে এসেছেন, এই বিধিব্যবস্থায় স্বাস্থ্যের যেমন উন্নতি হয় তেমনি রোগব্যাধি প্রতিরোধ করা যায়। তাঁরা চোখে যা দেখেছেন, অভিজ্ঞতায় যা পেয়েছেন তারই ভিত্তিতে প্রথমে একথা বলেছেন ; পরে দেখা গেছে, তাঁরা যা বলেছেন তার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গতি আছে অনেকখানি। তবে অনেক বিষয় এখনও 'অপ্রমাণিত' রয়ে গেছে। আমাদের জানতে হবে, আপাতদৃষ্টিতে যা ঠিক বলে মনে হয় তা কি সত্যিই ঠিক, তার পিছনে কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার সমর্থন আছে—এবং আপাতদৃষ্টিতে যা ঠিক বলে মনে হয় ও যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত তার মধ্যে পার্থক্য কতখানি। পুষ্টিবিজ্ঞানের আজ এত উন্নতি হয়েছে যে, ইংরেজীতে যাকে ডিফিশিয়েন্সি ডিজিজ বলে, বাংলায় যাকে পুষ্টির অভাবজনিত রোগ বলতে পারি, সেইসব রোগের কারণ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। পুষ্টি সম্পর্কে আজ আমরা এত জেনে ফেলেছি যে, এখন পুষ্টি বলতে কেবল পেলেগ্র্যা, বেরিবেরি বা স্কার্ভির মতো ডিফিশিয়েন্সি ডিজিজ প্রতিরোধ করা বোঝায় না, অন্য অনেক রোগব্যাধি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণেও পুষ্টির একটা বড়ো ভূমিকা আছে।

কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর এই শেষপাদেও পুষ্টির অভাবজনিত বিভিন্ন রোগ কী প্রচণ্ড দাপটে পৃথিবী কাঁপাচ্ছে, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। গোটা পৃথিবীতে প্রতি বছর কোটি কোটি শিশু প্রোটিন-এনার্জির অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছে, ভিটামিন-এ'র অভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আয়োডিনের অভাবে হাজার হাজার শিশু জড়বুদ্ধি স্থূলবুদ্ধি মূক ও বধির হয়ে জন্মাচ্ছে। এর প্রত্যেকটাই নিবারণ করা যেতে পারে এবং নিবারণের জন্য যেসব পুষ্টিদ্রব্য দরকার তা আমাদের জানা—এবং সহজলভ্য। আমাদের হাতের কাছেই আছে তা। কেবল অজ্ঞতা আর অবহেলার জন্য অগণিত শিশুর এই দুর্দশা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ বিভাগ খাদ্যনির্বাচন সম্বন্ধে সাতটি নির্দেশ দিয়েছেন, সেই সাতটি নির্দেশ মোটামুটিভাবে সকল দেশেই গ্রহণ করা যেতে পারে। নির্দেশগুলি হল—

১. নানা ধরনের খাদ্য খাবেন ;

২. দেহের একটা উপযুক্ত ওজন বজায় রাখবেন ;
৩. খুব বেশি সংপৃক্ত ফ্যাট ও কোলেস্টেরল খাবেন না ;
৪. যেসব খাদ্যে বেশি স্টার্চ অর্থাৎ শ্বেতসার আর বেশি ফাইবার অর্থাৎ আঁশ আছে সেইসব খাদ্য বেশি করে খাবেন ;
৫. খুব বেশি চিনি খাবেন না ;
৬. খুব বেশি লবণ খাবেন না ; এবং
৭. মদ্যপান যদি করেন, মাত্রা রেখে করবেন।

সারা পৃথিবীর পুষ্টিবিজ্ঞানীরা এই নির্দেশগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে অনেকে মনে করেন, স্বাস্থ্যবান লোকেরা কতখানি কোলেস্টেরল খেলেন তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।

এখানে বলা দরকার, খাদ্য নিয়ে কোনোরকম বাড়াবাড়ি যেমন ছেলেবেলা থেকেই পরিহার করে চলা উচিত তেমনি জানা উচিত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে অনিবার্যভাবে কিছু অপজাতিক পরিবর্তন আসে ও সেইসব পরিবর্তনের দরুন শরীরে কিছু অক্ষমতাও দেখা দেয়, এবং এমন কোনো বিশেষ খাদ্য নেই যা খেলে অথবা না খেলে সেই অক্ষমতাগুলি ঠেকিয়ে বা কমিয়ে দীর্ঘ সোপকর্ম জীবন লাভ করা যেতে পারে।

করোনারি হার্ট ডিজিজের সঙ্গে খাদ্যের একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায়, ঘি, মাখন, ননী না-তোলা দুধ, ডিম, চর্বিযুক্ত মাংস সবই ক্ষতিকর। কিন্তু এসবই সুস্বাদু খাদ্য এবং অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এইসব খাদ্য মাত্রা রেখে খেলে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে। উদ্ভিজ্জ তেল আর চর্বিযুক্ত অর্থাৎ তৈলাক্ত মাছ সম্বন্ধেও নানাকথা শোনা যায়। এসবও সুখাদ্য, কিন্তু খুব বেশি খেলে বিপদ ঘটতে পারে।

খাদ্য সম্পর্কে মার্কিন নির্দেশ সর্বদেশে প্রতিপাল্য হলেও আমাদের মতো দেশে তা প্রতিপালন করা কিছু কঠিন। ভারতের মতো চাষীপ্রধান দরিদ্র দেশে বলা যেতে পারে—

১. মাতৃস্তন্য ত্যাগ করার পর শিশুকে যে খাদ্য দেবেন তার মধ্যে যেন চাল গম প্রভৃতি তণ্ডুলজাতীয় শস্য আর ডাল অবশ্যই থাকে ;
২. বিশুদ্ধ জল পাওয়া না গেলে শিশুকে জল ফুটিয়ে খাওয়াবেন ;
৩. সব সময় মিশ্রখাদ্য খাওয়াবেন, তার মধ্যে চাল গম যেমন থাকবে তেমনি থাকবে ডাল, টাটকা সবুজ শাকসবজি আর মরশুমী ফল ;

৪. যখনই সম্ভব হবে, একটু দুধ ডিম মাছ মাংস খাওয়াবেন ;

৫. রান্নাঘর সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন ; এবং

৬. খাবারে যেন মাছি না বসে, ইঁদুরে-বাঁদরে যেন মুখ না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

মনে রাখবেন, আমাদের সবাইকে মরতে হবে, মৃত্যুর হাত থেকে কারও রেহাই নেই। রোগব্যাধির দরুন অকালে মৃত্যু না হলে পূর্ণবয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি নিত্য ব্যবহারের ফলে ক্ষয় হয়। ক্ষয় হতে হতে বার্ধক্যে এসে ভেঙে পড়তে চায়, যখন ভেঙে পড়ে তখন মৃত্যু। আবার, কোনো কোনো অঙ্গ হঠাৎ কোনো কারণে বিকল হয়ে যায়, তখনও মৃত্যু। অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে ধমনীই বেশি তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়, ফলে হৃৎপিণ্ডে আর মস্তিষ্কে রক্তসরবরাহ ব্যাহত হয়—তখন মৃত্যু ঘটে। বৃদ্ধবয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুর যতগুলি কারণ আছে তার মধ্যে প্রধান কারণ দুটি—হার্ট আর ব্রেন।

আহার নিদ্রা ব্যায়াম ইত্যাদি কয়েকটি জিনিসের প্রতি নজর দিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষয় কিছুটা বিলম্বিত করা যায়, রোধ করা যায় না একেবারে। মানুষ অজর অমর হবে, প্রকৃতি তা চায় না কখনও। তাই মানুষকে জরাজীর্ণ হতেই হবে, মরতেই হবে। কিছু আগে বা কিছু পরে—এই যা!

আগে অর্থাৎ অকালে মৃত্যুর কারণ বলেছি রোগব্যাধি। মানুষের রোগ-ব্যাধির প্রধান কারণ তিনটি—বংশগতি, পরিবেশ আর খাদ্য। বংশগতি বদলানো যায় না, পরিবেশ পরিবর্তন করা কঠিন, কিন্তু খাদ্যাভ্যাসে হেরফের করা যায় অনেক সহজে।

মানুষের খাদ্যাভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই গড়ে ওঠে—এবং ডেভিডসন ও পাসমোরের কথায়, "Food habits are dependent on attitudes, prejudices, general culture and taboos acquired early in life, and from a pattern of behaviour which is characteristic of a group. This is true for prosperous urban communities as well as for poor rural agriculturists."

একুশ : বেশি জ্ঞানের বিপদ আছে

উপনিষদে অন্নের প্রশস্তি করা হয়েছে। অন্ন মানে আহার্যদ্রব্য অর্থাৎ খাদ্য। উপনিষদে অন্নের যেভাবে প্রশস্তি করা হয়েছে তার মধ্যে বিজ্ঞান আছে।

প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে—

"অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতঃ। তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ইতি।" অর্থাৎ, অন্নই প্রজাপতি। এই অন্ন হইতেই শুক্র (নৃবীজ) উৎপন্ন হয় এবং শুক্র হইতেই সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—

"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" অর্থাৎ, অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন হইতেই ভূতগণ জন্মায়, জন্মের পর অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্তিমকালে অন্নে প্রতিগমন করিয়া তাহাতেই বিলীন হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে—

"অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্ যদ্যু হ জীবেদথবাঽদ্রষ্টাঽশ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্তাঽবিজ্ঞাতা ভবত্যথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি।" অর্থাৎ, বল হইতে অন্ন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই যদি কেহ দশ দিন আহার না করে, তবে সে যদিই বা বাঁচিয়া থাকে, তথাপি দৃষ্টিহীন, শ্রবণহীন, মননহীন, বোধহীন, ক্রিয়াহীন ও বিজ্ঞানহীন হয় ; আবার অন্ন গ্রহণ করিলে দ্রষ্টা হয়, শ্রোতা হয়, মন্তা হয়, বোদ্ধা হয়, কর্তা হয় এবং বিজ্ঞাতা হয়। অন্নকে উপাসনা কর।

ঋষিরা বলেছেন, অন্নই ব্রহ্ম, অন্নের জন্যই আমরা বেঁচে আছি। সুতরাং অন্নকে জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে অন্ন অর্থাৎ খাদ্যের যে সম্পর্ক সে তো অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুবিদিত। সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই সুখাদ্য অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বেশির ভাগ পুষ্টিকর খাদ্যই রসনা নিতে চায় না। সেই শিশুকাল থেকেই যত অখাদ্য কুখাদ্যের দিকে আমাদের ঝোঁক। উপকারী জেনেও অনেক খাদ্য আমরা খাই না, আবার অপকারী জেনেও অনেক

খাদ্য আমরা সানন্দে সাগ্রহে উদরস্থ করি। আসলে, ঐ যে বলা হয়, "There is always a gap between knowledge and practice and this is particularly true in nutrition and dietetics", সে বড়ো খাঁটি কথা।

কিন্তু কেন? তার কারণ, খাদ্যে আমরা সবার আগে যা চাই তা হল—'flavour, colour, appearance, palatability and social prestige'.

ফ্লেভার হল খাদ্যের রুচিকর সুগন্ধ। এটা অভিধানের কথা। আসল কথা হল, "Flavour is an attribute which is the sum total of the sensations perceived when a food or beverage is consumed."

অন্যভাবে বলা যায়, "Flavour is the complex sensation of taste, odour, hotness or coldness, pungency or blandness, roughness or smoothness."

আমরা যখন কোনো খাদ্য মুখে দিই তখন তার স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ আর উষ্ণতার অনুভূতি একসঙ্গে জেগে উঠে আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করে যার প্রভাবে আমরা খাদ্যটাকে হয় গ্রহণ করি নয়তো বর্জন করি।

স্বাদের অনুভূতি আর গন্ধের অনুভূতির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। গন্ধের অনুভূতি থেকে স্বাদের অনুভূতিকে আলাদা করে দেখা যায় না—এবং 'পিওর টেস্ট' অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ স্বাদ' বলে সম্ভবত কিছু নেই। কারণ, স্বাদ বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তার মধ্যে ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি, স্পর্শের অনুভূতি এবং বিশেষ করে ঘ্রাণের অনুভূতিও আছে। ঘ্রাণের অভাবে খাদ্যের স্বাদ আশ্চর্যরকমভাবে পালটে যায়। সেই কারণে সর্দিতে আমাদের ঘ্রাণতন্ত্র যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখন খাদ্য বিস্বাদ মনে হয়। কারণ, তখন আমরা প্রধানত জিভের স্বাদের অনুভূতির উপরই নির্ভর করি।

আমরা যত রকম স্বাদের কথাই বলি না কেন, মূল স্বাদ কিন্তু চারটি—মিষ্টি টক তেতো আর নোনতা। এ অনেকটা ঐ রঙের মতো, মূল রং সাতটা—বেগুনী নীল আসমানী সবুজ হলদে কমলা আর লাল। বাকি যত রং দেখি সে ঐ সাতটা থেকে দুটো তিনটে কি তার বেশি রং মিশিয়ে তৈরি। স্বাদের বেলায়ও তা-ই, মূল ঐ চারটি স্বাদ বাদে আর যত স্বাদ পাই, সবই দুই বা ততোধিক মূল স্বাদের মিশ্রণে সৃষ্টি।

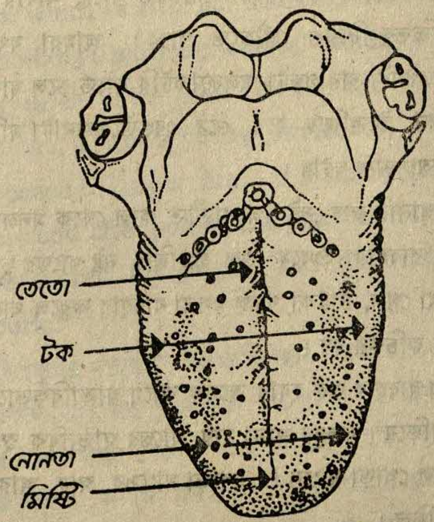
মূল স্বাদ মিষ্টি টক তেতো আর নোনতা। কিন্তু কেউ কেউ আরও দুটি

মূল স্বাদের কথা বলেন, যেমন—মেটালিক আর অ্যালক্যালাইন। মেটালিক অর্থ ধাতুতুল্য আর অ্যালক্যালাইন অর্থ ক্ষারীয়।

মেটালিক আর অ্যালক্যালাইন বলে আরও দুটি স্বাদকে মৌলিক স্বাদ হিসাবে স্বীকার করে নিলেও খাদ্যের সঙ্গে এই দুটি স্বাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। কারণ, আমরা সাধারণত যেসব খাদ্য খাই তার স্বাদ মেটালিকও না, অ্যালক্যালাইনও না। খাদ্যের ব্যাপারে মৌলিক স্বাদ ঐ চারটি—মিষ্টি টক তেতো আর নোনতা।

স্বাদের অনুভূতি সৃষ্টি হয় জিভে, জিভের উপর গুঁড়ি গুঁড়ি যেসব কুঁড়ি দেখা যায় তাতে। ঐ কুঁড়িকে বলা হয় স্বাদকুঁড়ি। মানুষের জিভে প্রায় ১০,০০০ স্বাদকুঁড়ি থাকে। গোরুর জিভে থাকে প্রায় ২৫,০০০ আর ইংরেজীতে যাদের ক্যাটফিশ বলা হয় সেই মাগুর শিঙি ইত্যাদি মাছের জিভে থাকে প্রায় ১,০০,০০০। মুর্গির জিভে মাত্র ২৪টা মতো স্বাদকুঁড়ি।

জিভে তেতো স্বাদের জায়গাটা একেবারে পিছনদিকে। মিষ্টি স্বাদের জায়গা একেবারে সামনে, ডগায়। টক আর নোনতা স্বাদ জিভের দুই ধারে—সামনের



জিভের উপর স্বাদকুঁড়ি

দিকে দুই ধারে নোনতা আর পিছনের দিকে দুই ধারে টক। জিভের মাঝখানটায় কোনো স্বাদ নেই।

মানুষের জিভে স্বাদকুঁড়ি বলেছি প্রায় ১০,০০০ ; বৃদ্ধবয়সে এই সংখ্যা কমে যায়। তাই বৃদ্ধরা অনেক সময় খাদ্যে তেমন স্বাদ পান না। তখন তাঁরা রাঁধুনীর দোষ দেন।

আগেই বলেছি, আমাদের খাদ্যের স্বাদ অনেকখানি নির্ভর করে ঘ্রাণের উপর। গন্ধের অনুভূতি অনেক সময় স্বাদের অনুভূতির চেয়ে অনেক বেশি তীব্র হয়। কোনো জিনিস চিনতে যদি আমরা স্বাদ আর গন্ধ দুই-ই ব্যবহার করি তাহলে গন্ধই বেশি নির্ভুল হয়। স্বাদের চেয়ে গন্ধ ২৫,০০০ গুণ পর্যন্ত বেশি নির্ভুল হতে পারে।

কোনো জিনিসের স্বাদ তখনই পাওয়া যেতে পারে যখন তা জলে অথবা লালায় গলে জিভে স্বাদকুঁড়ির সংস্পর্শে আসে।

আমাদের নাকের মধ্যে উপরদিকে অলফ্যাকটরি নার্ভ এসে শেষ হয়েছে। অলফ্যাকটরি নার্ভ মানে ঘ্রাণসংক্রান্ত নার্ভ, এই নার্ভই আমাদের মস্তিষ্কে ঘ্রাণের অনুভূতি বয়ে নিয়ে যায়। কোনো জিনিসের গন্ধ পেতে হলে নাকের মধ্যে ঐ অলফ্যাকটরি নার্ভে এসে গন্ধটা লাগা চাই। গন্ধটা ঐ নার্ভে নিশ্বাস নেবার সময় সরাসরি নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়েও পৌছতে পারে, আবার অন্যভাবে একটু ঘুরপথে মুখের ভিতর দিয়েও পৌছতে পারে। আমরা যখন কোনো খাদ্য শুঁকি কি গিলি তখনই তার গন্ধটা অলফ্যাকটরি নার্ভে চলে যায় আর তাতে অলফ্যাকটরি নার্ভ উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনাটা মস্তিষ্কে নিয়ে গিয়ে আমাদের গন্ধের অনুভূতি ঘটায়।

খাদ্যে সুগন্ধ আনার জন্য সেই স্মরণাতীত কাল থেকে মসলা ব্যবহার করা হচ্ছে। মসলার ব্যবহার প্রথমে শুরু হয়েছিল নষ্ট খাদ্যের দুর্গন্ধ চাপা দেবার জন্য। পরে দেখা গেল, টাটকা খাদ্যে মসলা ব্যবহার করলে খাদ্যে সুগন্ধ আসে, খাদ্য আরও বেশি রুচিকর হয়।

খাদ্যে মসলার ব্যবহার শুরু হবার অনেক আগে স্বাভাবিকভাবে খাদ্যে সুগন্ধ আনা হত খাদ্য পুড়িয়ে। যতদূর জানা যায়, খাদ্যের স্বাভাবিক সুগন্ধ মানুষ প্রথম আবিষ্কার করেছিল পোড়া মাংসে। পোড়া মাংসের স্বাদ আর গন্ধ মানুষকে পাগল করে দিয়েছিল।

মাংসের মধ্যে যে শর্করা আছে, অধিক তাপমাত্রায় সেই শর্করা ক্যারামেলে পরিণত হয় ; অধিক তাপমাত্রায় মাংসের প্রোটিন অঙ্গারীভূত হয় আর ফ্যাট বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়—ফলে মাংসে একটা রুচিকর সুগন্ধ আসে। কফি কোকো বাদাম

ইত্যাদি রোস্ট করলে ভারি সুগন্ধ বার হয়। কেক কুকি ইত্যাদির উপরটা যে সামান্য পুড়িয়ে দেওয়া হয় সে ঐ ক্যারামেলের সুগন্ধ আনার অন্য।

রান্নায় অনেক খাদ্যে যেমন সুগন্ধ আনে তেমনি খাদ্যের আসল গন্ধও বেরিয়ে আসে। রান্নায় খাদ্যবস্তুর গোটা চেহারাটাই পালটে যায়। রুচিকর সুগন্ধে খাদ্যবস্তু যেমন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তেমনি স্বাদুতায় লোভনীয় হয়। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, রান্না খাদ্য পরিপাক হয় সহজে।

আগুন আবিষ্কারের পরই রান্নার চল। কিন্তু কীকরে প্রথম রান্না শুরু হয় কেউ জানে না। এমন হতে পারে যে, বনে আগুন ধরে গিয়েছিল, সেই আগুনে কিছু জীবজন্তু পুড়ে মরেছিল, সেই পোড়া পশুর সুগন্ধ সুস্বাদু মাংস খেয়ে মানুষ রান্নার কথা ভেবেছিল। আবার, এমনও হতে পারে যে, আকাশ থেকে বাজ পড়ে কিছু গাছ পুড়ে গিয়েছিল, সেই গাছের পাতাটাতা বা ফল কাণ্ড খেয়ে আদিম মানুষের ভালো লেগেছিল। তারপর তাদের রান্না করে খাবার কথা মনে হয়েছিল। শুওরের মাংস আগুনে ঝলসে খাওয়ার চল হয় কীকরে তার একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন চার্লস ল্যাম। "According to Charles Lamb, the origin of roast pork is contained in an ancient Chinese manuscript which relates that mankind lived in a golden age called Cho-fang (meaning cook's holiday) so called because meat was eaten raw. This lasted for 70,000 years until one day the hut of a young swineherd, who lived with his pigs, happened to catch fire. A delicious aroma came from the embers and after poking the pigs' bodies to see if they still lived, he sucked his fingers and discovered the delights of roast : pork."

প্রত্নপ্রস্তরযুগের মানুষ যে আগুন ব্যবহার করত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কেনেথ ওকলি তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। মানুষ আগে কাঁচা মাংস আর কাঁচা উদ্ভিদ খেত। পরে, অংশত হলেও আগুনে পোড়া কি রান্না করা খাদ্য খেতে আরম্ভ করল। তাতে শরীরে পুষ্টির পরিমাণ বেড়ে গেল। কাঁচা খাদ্য আর রান্না করা খাদ্যের চর্বণ আর পরিপাক ক্রিয়া আলাদা, ফলে পুষ্টিকরতাও ভিন্ন। রান্নার ফলে প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উভয় খাদ্যেরই আঁশ ভেঙে যায়, তাতে অধিকতর পরিমাণে প্রোটিন আর কার্বোহাইড্রেট পদার্থ বার হয়।

অনেক শক্ত খাদ্যও নরম হয়ে যায়, ফলে খাদ্যের স্বাদ যেমন বাড়ে তেমনি চর্বণেও সুবিধা হয়—বিশেষ করে, বৃদ্ধদের পক্ষে অর্থাৎ যাঁদের দাঁত নেই কি দাঁতে জোর কম তাঁদের পক্ষে।

আগুনের পর মানুষের হাতে যখন বাসনপত্র এল তখন রান্নার ধরনটাই গেল পালটে। মৃৎপাত্র তৈরি হবার আগে মানুষ কখনও সরাসরি আগুনে ধরে তার খাদ্য পুড়িয়ে নিত, আবার কখনও গরম ছাইয়ের গাদায় কিংবা উনুনের পাথরে রেখে সেঁকে নিত। প্রত্নপ্রস্তরযুগের উত্তরভাগে মানুষ চামড়ার পাত্রে জল ভরে তার মধ্যে তপ্ত পাথরখণ্ড ফেলে জল গরম করত। হয়তো এইভাবে তারা খাদ্য সিদ্ধও করত। রান্না খাদ্য যে কেবল পরিচ্ছন্ন তা-ই নয়, স্বাদেও উন্নত।

পুষ্টিকর খাদ্য নিয়ম মেনে রান্না করলে তার পুষ্টি অনেকখানি বজায় থাকে ঠিক, কিন্তু খাওয়ার দোষে শরীর সেই পুষ্টি না-ও নিতে পারে। খাদ্য যদি অপছন্দের হয়, শরীরে যদি ক্লান্তি থাকে, মনে যদি অবসাদ থাকে, খাওয়ার সময় মন যদি খুঁত খুঁত করে, মনের উপর যদি দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা পাহাড়-চেপে বসে আর সব সময় যদি বদহজমের ভয় থাকে তাহলে যত পুষ্টিকর খাদ্যই হোক আর নিয়ম মেনে রান্না করে তার যত পুষ্টিই বজায় রাখা হোক, শরীর নেবে না। কারণ, তখন পাকস্থলী থেকে পাচক-রস বার হবে কম কিংবা হয়তো মোটেই বার হবে না এবং এনজাইম তৈরি হবে কম। ফলে, উত্তমরূপে প্রস্তুত উত্তম খাদ্যও আংশিক কি সম্পূর্ণ অজীর্ণ থেকে যাবে, অনেক পুষ্টিদ্রব্যই রক্তে পৌঁছতে পারবে না।

সেই কারণে খাওয়ার সময় মনটা প্রফুল্ল থাকা চাই। যা-ই খান, তৃপ্তি করে খাওয়া চাই। গৃহিণীদের উচিত, যা-ই খেতে দিন, যেন হাসিমুখে পরিপাটি করে দেন। খাওয়ার জায়গাটা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। খাবার টেবিলই হোক কি মাটিতে আসনপিঁড়িই হোক, দেখে যেন অভক্তি না আসে ; চীনামাটির বাসনই হোক কি নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের অথবা কাঁসার বাসন হোক, দেখে যেন অশ্রদ্ধা না জাগে।

খাদ্য যতই পুষ্টিকর হোক, পুষ্টিদ্রব্যগুলিকে যদি কাজে লাগাতে হয় তাহলে স্বাদে গন্ধে দর্শনে সেই খাদ্য আকর্ষণীয় হওয়া চাই এবং পরিবেশিতও হওয়া চাই ভালোভাবে। খাদ্য যাতে গায়ে লাগে তার জন্য পরিবেশটাও ভালো হওয়া দরকার। অ্যামেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিন আগে চিকিৎসাশাস্ত্রের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে একটি পরীক্ষা চালিয়েছিল, তাতে দেখা গেছে, পরিবেশ

যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর মনের মতো হয় আর পরিবেশন যদি সুন্দর হয় তাহলে পাকস্থলী থেকে পাচক-রস বার হয় বেশি।

আমাদের একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলি, সিনেমা দেখতে গিয়ে, যত ভালো ছবিই হোক, হলটা যদি ভালো না হয়, বসার জায়গাটা যদি আরাম-দায়ক না হয়, আশপাশের দর্শকরা যদি পছন্দসই না হয় তাহলে সে ছবি ভালো লাগে না। আসলে ভালোলাগাটা একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়। সেইজন্যই বলা হয়, "Our appreciation of any experience depends upon its impact on our senses."

খাদ্যের ব্যাপারেও তা-ই। খাদ্যের ব্যাপারে প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয়গুণ হল—

1. Flavour, which may be broken down into
   [a] taste,
   [b] odour or aroma.
2. Temperature—sensations of heat and cold
3. Appearance.
4. Texture—or "mouth-feel"—affecting the sense of touch.

নারীপুরুষভেদে, বয়স ও দেহের প্রকৃতি অনুসারে খাদ্যের 'কোয়ান্টিটি' ও 'কোয়ালিটি'র তারতম্য হয়। একজন নারী কি পুরুষের সমস্ত রকম বয়সে সমস্ত ধরনের খাদ্য সমান পরিমাণে দরকার হয় না। খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ বয়স ও দেহের ধাত অনুসারে হেরফের হয়, নারীপুরুষ হিসাবেও হয়। একজন নারী অথবা পুরুষের কোন্ বয়সে কী ধরনের খাদ্য ঠিক কী পরিমাণ খাওয়া উচিত বলা শক্ত। ইংরেজী করে বললে যদি সুবিধা হয় তো বলি, It is not easy to ascertain the exact quantity and quality of food proper for every age, sex and constitution.

তাই বলে ভাবনার কিছু নেই। সবচেয়ে ভালো হল, সমস্ত রকম 'আধিক্য' পরিহার করে চলা - সে উপরের দিকেও যেমন, নিচের দিকেও তেমনি, অর্থাৎ 'খুব বেশি' বেশি না, আবার 'খুব বেশি' কমও না। মানুষ ওজন করে, মেপে মেপে, হিসাব করে খাবে—প্রকৃতি সেইভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে নি। প্রকৃতি প্রত্যেক প্রাণীকে তার প্রয়োজনটা বলে দেয়, সামান্য একটু বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করলেই ঠিক জিনিসটা বেছে নেওয়া যায়। মানুষ অজ্ঞানতার কারণে এই

ব্যাপারে খুব কমই ভুল করে। বেশি জ্ঞানের বিপদও আছে। সেইজন্যই বলে "The most knowing are generally the most guilty."

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে খাদ্য নিয়ে এত গবেষণা, এত আলোচনার দরকার কী? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস বলেছেন, "ইহার উত্তর,—স্থান-কাল-পাত্রভেদে খাদ্যের বিভিন্নতা শিক্ষণীয়। তারপর যেখানে কোনও একটি প্রধান খাদ্যোপকরণের অভাব ঘটে সেখানে অপর কোন্ খাদ্য দ্বারা ইহার অভাব যথাযথ পূরণ করা যায়, তাহা শিক্ষা করিতে হয়। খাদ্যোপকরণের প্রাচুর্য্য ঘটিলে কি ভাবে উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন ও গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও বিচার এবং বিবেচনা সাপেক্ষ।"

মানুষ পুষ্টিকর খাদ্যে ও অপুষ্টিকর খাদ্যে প্রভেদ করতে পারে না, কিন্তু নিম্ন-বর্গের প্রাণীরা পারে। একটা ইঁদুর যদি বোঝে তার খাদ্যে কোনো পুষ্টিদ্রব্যের অভাব আছে তাহলে সেই খাদ্য সে খায় না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস তাঁদের 'খাদ্য-বিজ্ঞান' গ্রন্থে খাদ্য সম্বন্ধে শেষকথাও বলে দিয়েছেন, "বৈজ্ঞানিকগণ খাদ্য বিষয়ক গবেষণায় এ যাবৎ যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই—'খাদ্য বিষয়ে বাহাদুরি করিতে যাওয়া ঝক্‌মারি, খোদার উপর খোদগিরি করা আহাম্মকি,—বিজ্ঞানের বলে খাদ্যের সারাংশ নস্যের মত শুঁকিয়া পূর্ণস্বাস্থ্য ভোগ করিবে সে দিন এখনও আসে নাই—বাপ পিতামহের মত শাক-মাছ, আম-দুধ পেট পূরিয়া খাও—তাহা হইলেই নাচিয়া-কুঁদিয়া বেড়াইতে পারিবে।' "

বাইশ : নানাকথা

আমাদের যেমন পঞ্চভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—তেমনি প্রাচীন গ্রীস আর রোমে ছিল চতুর্ভূ'ত—বায়ু অগ্নি জল মাটি। আমাদের এই পাঁচটির মতো তাদের ঐ চারটি মৌলিক পদার্থ বলে বিবেচিত হত। বায়ুর ধর্ম শীতলতা, অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা, জলের ধর্ম আর্দ্রতা আর মাটির ধর্ম শুষ্কতা। প্রাচীন গ্রীক আর রোমকরা মনে করত, এই চারটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়েই পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্য গঠিত এবং যে খাদ্যে যে যে মৌলিক পদার্থ বর্তমান সেই খাদ্যে সেই সেই মৌলিক পদার্থের ধর্ম বিদ্যমান।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদের এই ধারণা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। এখনও অনেককে বলতে শোনা যায়, অমুক খাদ্য রক্ত গরম করে, অমুক খাদ্য রক্ত ঠাণ্ডা করে। আমরাও হামেশা বলি, অমুক খাদ্য গরম, অমুক খাদ্য ঠাণ্ডা। কিন্তু আসলে ঠাণ্ডা গরম বলে কোনো খাদ্য নেই, আছে ভালো খাদ্য আর মন্দ খাদ্য।

শরীরস্বাস্থ্যের উপর খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব যে আছে, এ জ্ঞান মানুষের অনেকদিনের। কিন্তু স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন খাদ্যের প্রভাব সম্পর্কে প্রাচীনকালের মানুষের ধারণা প্রায় সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। তাদের ধারণা যতখানি-না প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত অন্ধবিশ্বাসের উপর। ধর্মীয় বিশ্বাসও এই ধারণাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে—এবং এখনও করছে।

খাদ্যের ব্যাপারে যেমন ধর্মীয় বাধা থাকে তেমনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাও থাকে। সেইসঙ্গে যোগ হয় অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের বাধা। খাদ্য সম্পর্কে বহু অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার দেশের বহু জায়গায় অনেকটা একই রকম। অঞ্চলভেদে কিছু পার্থক্যও দেখা যায়।

অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার থেকে যেসব বাধা তার সবই ক্ষতিকর, একথা বলা যায় না। তবে বেশির ভাগই যে ক্ষতিকর, নিঃসন্দেহে তা বলা যায়। আমাদের দেশের বহু জায়গায় সন্তানসম্ভবাদের আহারবিহারের উপর মা-শাশুড়ীদের প্রভাব-প্রতাপই বেশি। মা-শাশুড়ীরাই ঠিক করে দেন আসন্নপ্রসবাদের খাদ্য কী হবে আর কী না-হবে।

কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানই বেশি কাম্য এদেশে। হরিয়াণায় বহু গর্ভবতী নারী পুত্রলাভের বাসনায় ঘন ঘন উপবাস করেন। একে তাঁদের শরীরে পুষ্টির অভাব, তার উপর উপবাসে আরও অপুষ্টি।

হরিয়াণায়ও অনেক খাদ্য 'গরম', অনেক খাদ্য 'ঠাণ্ডা'; আবার অনেক খাদ্য 'গুরুপাক', অনেক খাদ্য 'লঘুপাক'। এই গরম-ঠাণ্ডা আর গুরু-লঘুর জন্য অনেক খাদ্য বাদ চলে যায়, ফলে অপুষ্ট শরীরে আরও অপুষ্টি এসে বাসা বাঁধে। তাতে গর্ভবতী নারী, স্তন্যদাত্রী মা আর বাড়ন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদেরই ক্ষতি হয় বেশি।

চিনি গুড় কাঠবাদাম চীনাবাদাম নারকেল খেজুর কিসমিস আম বাজরা জোয়ার ভুট্টা ডিম মাংস ভাজা-খাবার, এমন কি চা-ও হরিয়াণায় 'গরম' খাদ্য বলে গণ্য হয় এবং লোকে মনে করে এইসব খাদ্যে গর্ভপাত ঘটে। তাই গর্ভবতী নারীদের এইসব খাদ্য খেতে দেওয়া হয় না। অথচ, এইসব খাদ্য অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য এবং প্রচুর শক্তি পাওয়া যায় এইসব খাদ্যে। গর্ভবতী নারীদের এইসব খাদ্য বেশি করে খাওয়া উচিত। নির্দোষ পেঁপেকেও লোকে গর্ভপাতের কারন বলে মনে করে এবং গর্ভবতী নারীদের কাছে পেঁপে অস্পৃশ্য।

দুধ দই ঘোল মুগডাল শাকপাতা আপেল আর যবের আটা বলা হয় 'ঠাণ্ডা' খাদ্য।

ছোলার ডাল, বীন, হালুয়া, মোষের দুধ আর ঘি 'গুরুপাক'—বদহজম আর পেটের শূলবেদনার সঙ্গে সম্পর্কে আছে মনে করে সামান্য অসুখেও মায়েরা এইসব খাদ্য পরিহার করেন।

ভাত খিচুড়ি ডালিয়া পাঁউরুটি বিস্কুট জল-মেশানো-দুধ দই ঘোল গণ্য হয় হালকা খাদ্য বলে—এবং কেবল গর্ভাবস্থায় নয়, জ্বরে আর পেটের অসুখেও এইসব খাদ্য গ্রহণের বিধি।

পেটের অসুখে দুধ আর ঘোল একেবারে বন্ধ। ভাত আলু আর ফুলকপিতে পেটে বায়ু হয় বলে বেশির ভাগ মানুষের বিশ্বাস। তাঁদের বিশ্বাস, শসা কাঁকড়ি তরমুজও ঠাণ্ডা খাদ্য, কিন্তু এসব খাদ্যেও পেটে গ্যাস হয়; শুধু তা-ই নয়, গাঁটে আর গায়ে ব্যথাও হয়। শসা কাঁকড়ি তরমুজ খাওয়ার পর জল খাওয়া একেবারে নিষেধ।

ঘিয়ের কদর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছে, বিশেষ করে সদ্যপ্রসূতির কাছে। সন্তানপ্রসবের পর মাকে প্রচুর ঘি খেতে দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে সন্তানপ্রসবের পর একমাস ধরে মাকে প্রচুর ঘি খাওয়ানো হয়। প্রসবের পর

প্রথম ১০দিন মাকে দুধ খেতে দেওয়া হয় না, তাতে নাকি বেশি স্রাব হয়, পুঁজ জমে।

মা-শাশুড়ীদের দৃঢ় বিশ্বাস, সন্তান মায়ের দুধ খায়, তাই মা 'গরম' খাদ্য খেলে সন্তানের শরীর 'গরম' হয় আর 'ঠাণ্ডা' খাদ্য খেলে সন্তানের 'ঠাণ্ডা' লাগে। সেই কারণে মায়েদের ডাল বেসন ছোলা বাদাম বীন ঢেঁড়স শাকপাতা বেল পেয়ারা ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয় না। স্তন্যদাত্রী মায়েদের প্রধান খাদ্য খিচুড়ি আর ঘি।

শিশুর জন্মের পর প্রথম মাস চারেক মায়ের দুধেই চলে যায়, তারপর মায়ের দুধের সঙ্গে কিছু বাড়তি খাবার দেবার দরকার হয়। শিশুকে তখন ভাত রুটি ইত্যাদি ভালো করে চটকে নরম করে খেতে দেওয়া উচিত। কিন্তু হরিয়াণার মায়েরা অনেক বয়স পর্যন্ত শিশুদের দানাশস্য খেতে দেন না, কারণ তাতে নাকি পেট মোটা হয়ে যায়। তাদের ঘি-মাখনও খেতে দেওয়া হয় না, কারণ ঘি-মাখনে কাশি হয়, গলার কষ্ট হয়। মায়েরা মনে করেন, বুকের মধ্যে ঘি-মাখন জমে কাশি আর শ্বাসকষ্ট হয়। খাঁটি গোরু কিংবা মোষের দুধ ভারী বলে তা তাঁরা শিশুদের দেন না, একভাগ দুধের সঙ্গে তিনভাগ কি চারভাগ জল মিশিয়ে পাতলা করে দেন।

অনেকের ধারণা, আবহাওয়ার সঙ্গে আহারের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই গরমে তাঁরা অল্প আহার করেন এবং শীতে ভূরিভোজন। কিন্তু আহারের পরিমাণের উপর আবহাওয়ার প্রভাব খুবই কম। ঠাণ্ডা-গরমের দরুন বড়ো জোর দশ-বিশ শতাংশ পার্থক্য হতে পারে, তার বেশি নয়। গরমে দেহ থেকে তাপ বার হয় কম, তার মানে ক্যালরির প্রয়োজন কিছু কম হয়। কিন্তু বাইরের তাপমাত্রা যা-ই হোক না কেন, কাজের জন্য শক্তিক্ষয় হয় সমান। অর্থাৎ, ক্যালরির প্রয়োজনে হেরফের হয় না। এ প্রসঙ্গে ডঃ ডাবলিউ আর অ্যাক্রয়েড বলেছেন, "A cold climate has even less influence in the opposite direction, for the simple reason that man can protect himself more effectively against cold than against heat. It is easier to keep warm in a cold atmosphere than to cool down in a warm atmosphere."

ঠাণ্ডায় শরীরের ভাঙাগড়া বেশি হয় অর্থাৎ বিপাকক্রিয়া অধিক হয়। সেই

কারণে তখন বেশি ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে কি ঠাণ্ডা বাতাসে বেড়ালে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। স্নানের পর ক্ষুধা বৃদ্ধি এই কারণেই হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে, পারিপার্শ্বিক উত্তাপ বেশি হলেও শারীরক্রিয়া বা বিপাকক্রিয়া বেশি হয়, কারণ তখন শরীরের জল বাষ্প হয়ে ঘামে পরিণত হতে কিছু শক্তির অপচয় ঘটে।

অনেকের ধারণা, রান্নায় খাদ্যের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। ধারণাটা ঠিক নয়। রান্নার ফলে খাদ্য যে কেবল স্বাদু হয় তা-ই নয়, তার পুষ্টিমূল্যও বেড়ে যায় অনেক দিক থেকে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—আটা-ময়দার প্রধান উপাদান স্টার্চ বা শ্বেতসার। আলুরও তা-ই। আমরা যখন আলু সিদ্ধ করি কি আটা-ময়দা দিয়ে রুটি-লুচি তৈরি করি তখন স্টার্চকণিকা তাপের প্রভাবে ফেটে যায়। তাতে তার ভিতরকার বস্তুগুলি অনেক সহজে পরিপাক ও পরিশোষণ হতে পারে। আবার, তাপ বেশি হলে, যেমন ধরুন পাঁউরুটি টোস্ট করলে কি আলু ভাজলে স্টার্চ-অণু আংশিকভাবে ভেঙে ডেক্সট্রিনে পরিণত হয় এবং তার ফলে স্বাদ যেমন বাড়ে তেমনি পরিপাকও হয় সহজে।

কাঁচা মাংসের চেয়ে পোড়া বা রান্না করা মাংস যে বেশি সুস্বাদু ও সহজপাচ্য তার কারণও এ-ই। স্টার্চ-অণুরই মতো মাংসের প্রোটিন-অণুও তাপের প্রভাবে বদলে যায়। অধিক তাপে মাংস সঙ্কুচিত হয় এবং স্টার্চ-অণুও অংশত ভেঙে যায়। তার একটা ফল হয় এই যে, দেহ সহজেই খাদ্যবস্তু গ্রহণ করতে পারে। প্রোটিন কিংবা স্টার্চের বৃহদাকার অণুর সাধারণ ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু ঘটনা ঘটে—কিছু জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় এবং তাতে বহু বিভিন্ন যৌগ তৈরি হয়। রান্না-করা খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধের কারণ এইসব যৌগ।

রান্নায় তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথম, খাদ্য সুস্বাদু ও সুগন্ধী হয়; দ্বিতীয়, খাদ্য সহজপাচ্য হয়; এবং তৃতীয়, খাদ্যের ভিতর হানিকর রোগবীজাণু থাকলে তা ধ্বংস হয়।

কাঁচা খাদ্য খেয়েও বেঁচে থাকা সম্ভব। আগুন আবিষ্কারের আগে আদিম মানুষ কাঁচা খাদ্য খেয়েই বেঁচে থাকত। ডিম মাংস মাছ ফলমূল যা-কিছু তারা খেত, কাঁচাই খেত। কিন্তু তারা সুস্থ শরীরে বেশিদিন বাঁচত এমন প্রমাণ নেই।

রান্নায় পরিমিত মাত্রায় মসলা ব্যবহার করলে খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি পায়। হলুদ

জিরে ধনে মেথি পাঁচফোড়ন সরষে এলাচ চারচিনি ইত্যাদি মসলার মস্ত গুণ, এইসব মসলা খাদ্যে সুস্বাদ, সুগন্ধ ও সুবর্ণ আনে। কোনো কোনো মসলা পাকস্থলীতে পাচক-রস ক্ষরণে সাহায্য করে। জিরে ধনে লঙ্কা ইত্যাদিতে কিছু ক্যারটিন পাওয়া যায়। কিন্তু ক্যারটিনের জন্য এইসব মসলা কেউ ব্যবহার করেন না, করার পিছনে যুক্তিও নেই।

অত্যধিক মসলা পাকস্থলী ও অন্ত্রে বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করে ক্ষতি করতে পারে, বিশেষ করে স্টম্যাক আলসারের রোগীদের ক্ষেত্রে। অত্যধিক মসলায় কখনও কখনও বদহজমও হতে পারে।

পেঁয়াজ ঠিক মসলার পর্যায়ে পড়ে না। তবু অনেকে মসলার মতো করেই রান্নায় পেঁয়াজ ব্যবহার করেন। কিন্তু মাত্রারিক্ত পেঁয়াজের ব্যবহারে পেটে বায়ু হতে পারে। সেই কারণে রোগীর খাদ্যে পেঁয়াজ ব্যবহার না করাই ভালো। তবে রোগীর খাদ্যে হলুদ ও জিরে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আগে অনেকের ধারণা ছিল, যে খাদ্যের যে রং বা যে চেহারা সে খাদ্য শরীরে গিয়ে সেইরকম কাজ করে। যেমন, যে খাদ্যের রং লাল সেই খাদ্য শরীরে রক্ত তৈরি করে, হলুদ রঙের খাদ্য জণ্ডিস অর্থাৎ পাণ্ডুরোগ নিরাময় করে, মতান্তরে সৃষ্টি করে। ইয়োরোপে যখন প্রথম আলুর প্রচলন হল তখন তার ফ্যাকাশে রং, আবের মতো আকৃতি আর মাটির তলায় যেমন অদ্ভুতভাবে তার জন্ম তা দেখে অনেকে মনে করল, এ জিনিস খেলে নির্ঘাত কুষ্ঠ হবে। কারণ, কুষ্ঠরোগেও শরীরে এমন রং ধরে।

তারও আগে, অনেকটা আদিম কালে ধারণা ছিল, যে প্রাণীর মাংস খাবে সেই প্রাণীর মতো আচরণ হবে। মানুষ তখন সিংহের মাংস খেত সিংহের মতো শক্তি অর্জন করার জন্য। মুর্গির মাংস এড়িয়ে চলত, পাছে ভীরু স্বভাবের হয়ে যায় সেজন্য। চোখ দুটো শুওরের মতো ছোটো হয়ে যাবে ভেবে শুওরের মাংস খেত না। আবার, অনেকে কুকুরের মতো আনুগত্য লাভের জন্য নির্বিচারে কুকুরের মাংস খেত।

আদিম সমাজে খাদ্য নিয়ে নানা বিধিনিষেধ আর সংস্কার ছিল। খাদ্যাখাদ্য স্থির হত ঐসব বিধিনিষেধ আর সংস্কার দিয়ে। ম্যাগনাস পাইক তাঁর 'ফুড অ্যাণ্ড সোসাইটি' গ্রন্থে বলেছেন, "The Abipones of Paraguay eat jaguars, bulls and stags to make them strong, brave and swift

—and avoid eating hens and tortoises for fear of becoming cowardly and slow ; the Miris of Assam prize tigers' flesh to make themselves fierce—but forbid it to their women ; the Kansas Indians relish dogs' flesh on the grounds that by eating it they become brave and faithful. Caribs abstain from pigs' flesh lest their eyes become small, and the Aino people of Japan, who believe the otter to be a forgetful animal, refuse to eat it lest by doing so they lose their memory !"

মানুষ একসময় স্বগোত্রভোজী ছিল অর্থাৎ নরমাংস ভক্ষণ করত। তখন সে বীর শত্রুর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে খেত তার শৌর্য লাভ করতে পারবে বলে।

কিন্তু মানুষের নরমাংসভোজনের আসল কারণ বোধ হয় অন্য। নরমাংসভুক মানুষের কথায় জানা যায়, মানুষের মাংস খুবই সুস্বাদু। একসময় নরমাংস খাওয়ার যে বেশ চল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাংসের চেয়ে নরমাংস কম পুষ্টিকর হবার কথা নয়। মানুষ যখন নরমাংস খেত তখন উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়াও খেত। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে, বিশেষ করে প্রত্নপ্রস্তরযুগের উত্তরভাগে, মানুষের সংখ্যা সব-সময়েই এত বেশি ছিল যে, কিছু মানুষ বধ করে তার মাংস খেলে জনসংখ্যা-বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা ছিল না।

মানুষ যখন মানুষের মাংস খেত তখন নরমাংসের প্রতি লোভের কারণে খেত না। যতদূর মনে হয়, অপচয় নিবারণের জন্যই খেত। তখন পশুকুলের মতো অরণ্যচারী মানুষেরও এলাকা ছিল সুনির্দিষ্ট। এক এক এলাকায় এক এক জনগোষ্ঠীর অভিবাস ও পশুশিকারের অধিকার। এই অধিকার রক্ষায় অনেকসময় দুই বা ততোধিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধত। তাতে কিছু মানুষ হতাহতও হত। শত্রুমিত্র ভেদাভেদ না করে মানুষ সেই নিহত মানুষের মাংস ভক্ষণ করত। নিত্য শিকারের উপর যাদের জীবন নির্ভরশীল, হাতের মুঠোয় পাওয়া প্রচুর সুস্বাদু মাংস তারা নষ্ট হতে দিতে পারে না। সে মাংস শত্রুর, না মিত্রের—সে বিচারও করতে পারে না।

গত শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে স্বগোত্রভোজন নিয়ে একটা অনুসন্ধান চালানো হয়। তাতে দেখা যায়, কিছু কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে নরমাংসভোজনের বেশ চল আছে। সুতরাং আদিমযুগের মানুষের খাদ্যে নরমাংসেরও যে স্থান

ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আসলে, গোটা হোমিনিড শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধেই স্বগোত্রভোজনের অভিযোগ।

অতি সম্প্রতিকালে স্বগোত্রভোজনের অভিযোগ উঠেছিল সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের প্রাক্তন সম্রাট জঁ-বদেল বোকাশার বিরুদ্ধে। বোকাশা দীর্ঘ ১৩ বছর অত্যন্ত জাঁকজমক, অমিতব্যয় ও কঠোর নিপীড়নের মধ্যে দেশ শাসন করেন। ১৯৭৯ সালে এক অভ্যুত্থানের পর তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। তখন তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল নরমাংসভোজনের। অভ্যুত্থানের নেতা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দাভিড ডাকো বলেন, বোকাশার প্রাসাদে ফ্রিজারের মধ্যে তিনি অনেকগুলি খণ্ডবিখণ্ড মনুষ্যদেহ দেখেছেন। পরে আরও কেউ কেউ নাকি দেখেছেন।

১৯৮৭ সালে বিচারের সময় বোকাশা নরমাংসভোজনের কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর বহুদিনের পুরাতন পাচক ফিলিপ ল্যাংগুইশা বলেন, তিনি নিজের হাতে নরমাংস রান্না করে বোকাশাকে খেতে দিয়েছেন। বোকাশার আদেশে তিনি ক্ষুর দিয়ে নরদেহ চিরে তার মধ্যে ভাত পুরে আবার সেলাই করেছেন, তারপর জিনে ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে নরমাংস পাক করে তিনি বোকাশাকে খেতে দিয়েছেন, বোকাশা মহানন্দে সেই ভাতের পুর দেওয়া নরমাংস খেয়েছেন।

কোনো কোনো খাবারে অল্পেতেই ছাতা পড়ে, বিশেষ করে বর্ষাকালে। অনেকের ধারণা, ছাতায় কোনো ক্ষতি হয় না, তাই ছাতা-পড়া জায়গাটুকু চেঁচে ফেলে দিয়ে বাকি খাবারটা তাঁরা নির্ভাবনায় খান। কিন্তু এটা মারাত্মক হতে পারে। কোনো কোনো ছাতায় ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

পেনিসিলিনও ছাতা, কিন্তু সব ছাতাই পেনিসিলিন নয়। ছাতা দেখলেই যাঁরা পেনিসিলিন ভাবেন তাঁরা ভুল করেন। কখনও কখনও প্রাণ দিয়ে এই ভুলের মাশুল দিতে হতে পারে। ছাতা-পড়া খাবার কখনই মুখে তুলবেন না। ছাতা-পড়া জায়গাটুকুই বিপজ্জনক, যে জায়গায় ছাতা দেখা যাচ্ছে না সেই জায়গায় কোনো দোষ নেই, কখনও এমন কথা ভাববেন না। অনেক জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না, ছাতা পড়া খাবারে কতদূর ছত্রাকের জীবাণু চলে গেছে তা তো দেখতে পাচ্ছেন না—তাই যে খাবারেই ছাতা পড়ুক, পুরো খাবারটাই ফেলে দেবেন।

আধুনিক জীবনের একটা প্রায়-অনিবার্য ব্যাপার হল, সকাল দুপুর রাত্রি এই তিনবেলা আহারের মাঝে খুচখাচ অনেকবার খাওয়া। অল্প অল্প করে খেলেও বারে বারে খাওয়ার দরুন অনেক খাওয়া হয়, ফলে আসল খাবার পরিমাণে কমে যায়। অনেকের ধারণা, তাতে ক্ষতি হয়। কিন্তু এই খুচখাচ খাবার যদি সুখাদ্য অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্য হয়, ইংরেজীতে যাকে 'জাঙ্ক ফুড' বলে তা না হয় তাহলে আপত্তি করার কিছু নেই, কারণ তা থেকেও শরীর অনেক পুষ্টি পায়। সারা দিনরাতের খাবার তিনবারেই খেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

খুব গরম চা-কফি খাওয়া ঠিক নয়। এতে পেটে আলসার হতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার রয়্যাল ইনফার্মারির দুজন সার্জন রবার্ট পিয়ার্সন আর রোরি ম্যাকক্লয় ১৯৮৩ সালে একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, অনেকে যে চা-কফি খান তার তাপমাত্রা থাকে ৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রার জল গায়ে লাগলে গায়ে ছ্যাকা পড়ে যায়।

আলসারের সঙ্গে চা-কফির তাপমাত্রার একটা সম্পর্ক তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, অধিকাংশ আলসারের রোগী খুব গরম চা-কফি খেতে ভালোবাসেন। এতকাল জানা ছিল, খুব বেশি চা-কফি খেলে কারও কারও পাকস্থলীতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, এই প্রথম দেখা গেল খুব গরম চা-কফির সঙ্গে স্টম্যাক আর ডুওডেনাল আলসারের একটা সম্পর্ক আছে।

দুধ দই ঘোল বাঙালীর কালচারের সঙ্গে মিশে আছে। এ তিনটিই অতি উপকারী খাদ্য। এ শুধু আজকের বিজ্ঞানের কথা নয়, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেরও কথা। কিন্তু ঘোলের চল আজ প্রায় উঠেই গেছে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। দুধ দইও আমরা শাস্ত্র-অনুমোদিত সময়ে খাই না। শহরেও না, গ্রামেও না।

দই মন্থন করে মাখন তুলে নিলে ঘোল প্রস্তুত হয়। গ্রীষ্মকালে ঘোল একটি অতি উৎকৃষ্ট পানীয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে—

"দিনান্তে চ পিবেৎ দুগ্ধং নিশান্তে চ পিবেৎ পয়ঃ।
ভোজনান্তে পিবেৎ তক্রং কিং বৈদস্য প্রয়োজনং॥"

অর্থাৎ, দিনান্তে দুধ, প্রত্যূষে জল আর আহারান্তে ঘোল খেলে বৈদ্য ডাকার প্রয়োজন হয় না।

শাস্ত্রের কথা যাঁরা জানেন না তাঁদেরও অনেকের বিশ্বাস, নিয়মিত দই বা ঘোল খেলে আয়ু বৃদ্ধি পায়, আন্ত্রিক গোলযোগ দূর হয়। এই বিশ্বাসের পিছনে কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। দইতে একধরনের জীবাণু জন্মায়, তার নাম ল্যাকটোব্যাসিলাস অ্যাসিডিফেলাস। এই জীবাণু দুধের ভিতরকার শর্করাকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। খাঁটি দইয়ের স্বাদ তাই টক। আমাদের অন্ত্রের মধ্যেও প্রচুর সংখ্যায় এই জীবাণু আছে। নিয়মিত দই বা ঘোল খেলে অন্ত্রে এই জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়—অন্ত্রের ল্যাকটোব্যাসিলাসের সঙ্গে দই বা ঘোলের ল্যাকটোব্যাসিলাস যুক্ত হয়ে তারা একযোগে অন্ত্রের মধ্যে হানিকর জীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধ করে এবং হজম-না-হওয়া খাদ্যের পচন নিবারণ করে। এই কারণেই আহারের পর টক দই বা ঘোল খাওয়ার প্রচলন।

আমাশায়, কোলাইটিস ও বদহজমের রোগীদের যে দই ও ঘোল খেতে বলা হয়, সে-ও এই কারণে। দই ও ঘোল তাঁদের ক্ষেত্রে প্রতিষেধকের কাজ করে।

ল্যাকটোব্যাসিলাস জীবাণুর আর-একটা ক্ষমতা হল, অন্ত্রের মধ্যে তারা বি-ভিটামিন তৈরি করতে পারে, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের বিপাকে যা অতি প্রয়োজনীয়। আন্ত্রিক রোগে তাই দই ও ঘোল আরও উপকারী।

দইতে দুধের প্রোটিন যেমন পাওয়া যায় তেমনি ল্যাকটিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় মাছমাংসের প্রোটিন সরলতর কণায় বিশ্লিষ্ট হয়ে সহজপাচ্য হয়। এই কারণে বেশি মাছমাংস খাওয়ার পর দই খেলে হজমে সুবিধা হয়।

দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয় দুগ্ধশর্করা ভেঙে। ঘোল তৈরি করতে দই থেকে মাখন তুলে নেওয়া হয়, ফলে ঘোলে ক্যালরির পরিমাণ কমে যায়। ঘোলের শরবতে ক্যালরির এই ঘাটতি পূরণ হয় চিনি মিশিয়ে। ঘোলে যে লবণ অর্থাৎ সোডিয়ম ক্লোরাইড মেশানো হয় তাতে ঘোল যেমন সুস্বাদু হয় তেমনি দেহে জলের সমতা রক্ষায় সহায়ক হয়। ঘোলে লেবুর রস মেশালে ঘোল আরও মুখরোচক হয় এবং অতিরিক্ত কিছু ভিটামিন-সি পাওয়া যায়, শারীরিক অসুস্থতায় যার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রবল জ্বরে, সংক্রামক রোগে ও পেটের অসুখে ঘোলের শরবত একটি উৎকৃষ্ট পথ্য। তবে যাঁদের পাকস্থলীতে প্রদাহ আছে তাঁদের পক্ষে ঘোলের শরবত না খাওয়াই ভালো।

অনেকের ধারণা, দুপুরে আহারের পর নিদ্রা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। নিদ্রাবিজ্ঞানীরা কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁরা বলেন, দুপুরে আহারের পর

শ্রান্তিভাব আসতেই পারে, তারপর নিদ্রার আবেশ আসা খুবই স্বাভাবিক। মানুষ সুযোগ পেলেই দিনে অন্তত দুবার ঘুমোবেই।

ঐ যে ইংরেজীতে মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাকে siesta বলা হয়, আসলে ওটা স্প্যানিশ শব্দ, লাতিন sexta থেকে এসেছে: sexta (hora) = sixth (hour)। বার ঘণ্টার দিনের মাঝামাঝিই তো sixth hour, or noon.

সিয়েস্টার প্রয়োজন আমাদের বায়োলজিক্যাল ক্লকের সঙ্গে একেবারে বাঁধা রয়েছে, দুপুরে 'ক্যাটন্যাপ' অর্থাৎ 'মার্জারনিদ্রা' বাদ দেওয়াটা শরীরের পক্ষে খুব একটা মঙ্গলকর নয়।

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতায় দুর্দম কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিবানিদ্রার তেমন সুযোগ নেই। তবু পৃথিবীর অনেক দেশে লম্বা লাঞ্চ-টাইম দেওয়া হয়, লোকে যাতে খেয়েদেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার কাজে আসতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, লাঞ্চের পর একটু ঘুমিয়ে নিলে বিকেলের কাজে শক্তি পাওয়া যায়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর একঘণ্টা দিবানিদ্রা দিতেন বলে শুনেছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে তাঁর অফিসেই শোবার ব্যবস্থা ছিল।

ইংরেজীতে বলা হয়, **'After dinner walk a mile.'** কিন্তু না, কদাপি না। আহারের পর বিশ্রাম। আমাদের শাস্ত্রেই আছে—

"ভুক্তোপবিশতো হেবং ভুক্ত্বা সংবিশতঃ সুখম্
আয়ুশ্চংক্রমমাণস্য মৃত্যুর্ধাবতি ধাবতঃ।"

অর্থাৎ, ভোজনান্তে সুখে উপবেশন করলে আয়ুবৃদ্ধি হয় এবং ভোজনান্তে দ্রুত গমন করলে দ্রুত মৃত্যুর কবলে পড়তে হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন, সুখে উপবেশন নয়, সুখে শয়নই কর্তব্য —এবং বামপার্শ্বে শয়ন।

বিহঙ্গের প্রশ্নের উত্তরে চিকিৎসক-শিরোমণি সুশ্রুতও বলেছেন—

"জীর্ণে হিত মিতাহারী, শতপদগামী, বামপার্শ্ব শায়ীব,
অবিজিত মূত্র পুরীষ খগেন্দ্র, সোঽরুক, সোঽরুক, সোঽরুক।"

অর্থাৎ, যিনি সহজপাচ্য হিতকারী খাদ্য পরিমিত আহার করে শতপদ গমনান্তে বামপার্শ্বে শয়ন করে বিশ্রাম করেন, যিনি মলমূত্রের বেগ ধারণ করেন না, হে খগেন্দ্র, তিনিই নীরোগ, তিনিই নীরোগ, তিনিই নীরোগ।

পরিশিষ্ট—১

এক : মা ও শিশুর খাদ্য

নারীর শ্রোণীচক্র যদি ছোটো আর চেটাল হয় তাহলে সন্তানপ্রসবের ব্যাপারটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কখনও কখনও বিপজ্জনকও হয়। শৈশবে ও যৌবনে পদার্পণের সময় খাদ্যে পুষ্টির অভাব থাকলে শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, তার ফলে শ্রোণীচক্র স্বাভাবিক আকার ধারণ করতে না পেরে ছোটো থেকে যায়। শ্রোণীচক্রের প্রান্তদেশ সাধারণত গোল হয়, কিন্তু বাড়ন্ত বয়সের মেয়ে যদি রিকেটে আক্রান্ত হয় তাহলে তার শ্রোণীচক্র চ্যাপ্টা হয়ে যায় এবং অনেক সময় শিমের বিচির মতো দেখায়। সুপুষ্টি বিধান আর রিকেট নিবারণ করতে পারলে সন্তানপ্রসবের বিপদ অনেকখানি এড়ানো যেতে পারে। বৃটেনে ১৯৩০-এর দশকে প্রতি এক লক্ষ প্রসূতির মধ্যে প্রায় ৪০০ প্রসূতি প্রসবের সময় মারা যেতেন, এখন এই সংখ্যা প্রায় ২৫-এ নেমে এসেছে। তার প্রধান কারণ, আগে বৃটিশ নারীদের বেশির ভাগেরই শ্রোণীচক্র ছিল ছোটো, এখন শৈশব থেকেই পুষ্টির দিকে নজর দেওয়ায় ছোটো শ্রোণীচক্র আর তেমন দেখাই যায় না।

গর্ভাবস্থায় সুখাদ্য অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্য না খেলে গর্ভের সন্তান পুষ্ট হতে পারে না, সন্তান কম ওজন নিয়ে জন্মায়। শিশুর কম ওজন নিয়ে জন্মাবার অনেক কারণ আছে, অন্যতম প্রধান কারণ মায়ের অপুষ্টি।

গর্ভকালে নারীর মেদ-অর্জন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তখন কোনো কোনো ফ্যাশনদুরস্ত মহিলা ওজন বাড়তে না দেবার জন্য খাওয়া কমিয়ে দেন। তার ফল বিপজ্জনক হতে পারে—গর্ভের শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মাতে পারে এবং কখনও কখনও মারাও যেতে পারে।

মায়ের শরীরে যদি পুষ্টির নিদারুণ অভাব ঘটে তাহলে সন্তান গর্ভেই মারা যেতে পারে অথবা জন্মের পর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে। বৃটেনে ১৯৩০-এর দশকে প্রতি ১০০০ মায়ের মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ জন মা এই কারণে সন্তান হারাতেন। ১৯৪৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪০ থেকে ৫০, কারণ যুদ্ধের সময় বৃটিশ খাদ্যনীতির অঙ্গ হিসাবে গর্ভবতী নারীদের অল্পমূল্যে বাড়তি রেশন দেওয়া হত আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হত ভিটামিন।

আমাদের অধিকাংশ খাদ্যেই লোহার ভাগ কম থাকে, যেটুকু থাকে তাতে স্ত্রীলোকদের প্রয়োজন কোনোরকমে মিটে যায়। কিন্তু গর্ভাবস্থায় নারীদেহে ফোলিক অ্যাসিডের চাহিদা বাড়ে বলে তখন প্রায়ই অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতা দেখা দেয়। লৌহঘটিত কোনো ওষুধ দিয়ে এই রক্তাল্পতা নিবারণ করা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়ম থাকা দরকার, কারণ গর্ভস্থ শিশুর হাড় গড়ে ওঠার জন্য প্রচুর ক্যালসিয়ম প্রয়োজন। দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়ম পাওয়া যায় এবং রোজ আধ লিটার করে দুধ খেলেই একজন গর্ভবতী নারীর ক্যালসিয়ামের চাহিদা মেটে। আধ লিটার দুধে ৬০০ মিলিগ্র্যাম ক্যালসিয়ম পাওয়া যায়।

আর, প্রয়োজনমতো সুষম খাদ্য খেলেই সাধারণত তা থেকে প্রোটিনের চাহিদা মিটে যায়।

কোনো মা গর্ভধারণের আগে থেকেই যদি পরিমাণমতো পুষ্টিকর মিশ্রখাদ্য খেতে থাকেন তাহলে গর্ভকালে তাঁর খাদ্য তেমন পালটাবার দরকার হয় না। তখন শুধু দরকার পরিমাণে বেশি খাওয়া এবং তাঁর আহারেচ্ছাই সাধারণত তাঁকে বলে দেয়, কতখানি বেশি খেতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল, গর্ভাবস্থায় আহারেচ্ছা ঠিক থাকে না, তার বেশ হেরফের হয়। তাই মাঝে মাঝে ওজন নিতে হয় এবং যে হারে ওজন বাড়তে থাকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাওয়ার পরিমাণ স্থির করতে হয়।

অনেক শিশু যে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়, ডেভিডসন ও পাসমোর বলেছেন তার একটা কারণ হয়তো মায়ের ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য : "The birth of a baby with a congenital defect in the formation of one or more of its organs is a hazard of pregnancy for which it is possible that factors in maternal diets may be responsible."

সব সময় মনে রাখা দরকার, একটা শিশু কখনই একজন বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ নয়। একজন বয়স্ক মানুষকে কোনোভাবে ক্ষুদ্রাকৃতি করে দিতে পারলেই যেমন একটা শিশু পাওয়া যায় না তেমনি একটা শিশুকে কোনো উপায়ে বড়ো করে দিতে পারলেই বয়স্ক মানুষ হয় না। শিশুর দেহের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একসঙ্গে সমানভাবে বৃদ্ধি পায় না। বিভিন্ন অঙ্গ শৈশবের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে বাড়ে। এই বিভিন্ন রকম বৃদ্ধির হার বয়ঃপ্রাপ্তির আগে পর্যন্ত

বছরের পর বছর ধরে চলে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করে একটা মেটাবলিক ক্লক। বিপাকের এই ঘড়িটা একটা টাইম-টেবিলের সঙ্গে বাঁধা থাকে। টাইম-টেবিলটা ঠিক হয় জিনেটিক দিক থেকে, জিন তার নিয়ন্তা। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে এবং গুরুতর রকমের রোগাক্রমণে এই টাইম-টেবিলে গোলমাল দেখা দিতে পারে। তখন শিশুর বৃদ্ধির হার ব্যাহত হতে পারে।

শিশুর দেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর টিস্যু যদি প্রয়োজনীয় পুষ্টিদ্রব্য পায় কেবল তাহলেই তার দেহের বৃদ্ধি সম্ভব। শিশুর দেহের বৃদ্ধি উপযুক্ত খাদ্যের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু সেই খাদ্য রোগব্যাধির কারণে যদি সে ঠিকভাবে গ্রহণ করতে না পারে তাহলে তা প্রায় বৃথা যায়। যেমন, পৌষ্টিক নালীতে রোগ থাকলে খাদ্যের পুষ্টিদ্রব্য ঠিকমতো পরিশোষিত হতে পারে না, ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। গ্যাস্ট্রো-এন্টেরাইটিস, চলতি বাংলায় যাকে আন্ত্রিক রোগ বলে, বার বার সেই রোগ হলে এমন হতে পারে। বিপাকক্রিয়ায় নানারকম গোলমালের দরুনও খাদ্যের পুষ্টিদ্রব্য ঠিকমতো কাজে লাগতে পারে না, তখনও শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। ক্রনিক অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক রোগও দারুণভাবে বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায়।

সাধারণত মাতৃস্তন্য ছাড়ানোর পরই শিশুর বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। শিশু যতদিন মাতৃগর্ভে থাকে ততদিন মায়ের কাছ থেকেই সে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টিদ্রব্য পায়—তা সে মায়ের খাদ্য যদি যথোপযুক্ত না হয় তাহলেও। তবে যদি মায়ের খাদ্যে নিদারুণভাবে পুষ্টির অভাব থাকে অথবা তাঁর গর্ভের ফুল স্বাভাবিক না হয় তাহলে অন্য কথা। তখন গর্ভের শিশু অপুষ্টির শিকার হয়, তার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আবার, ভূমিষ্ঠ হবার পর যতদিন শিশু মাতৃস্তন্য পান করে ততদিন সাধারণত তার পুষ্টির অভাব হয় না, মাতৃদুগ্ধেই তার সমস্ত পুষ্টি মেলে। তখন তার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

মুশকিল হয় মাতৃস্তন্য ছাড়াবার পর, শিশু যখন অন্য খাদ্য খেতে শুরু করে। তখনই হিসাব দরকার, তখনই চিন্তা প্রয়োজন।

শিশুর জন্মের দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাকে মাতৃস্তন্য দেওয়া উচিত। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি মা ২৪ ঘণ্টার আগে সন্তানকে স্তন্য দান করেন না। বেশির ভাগ মায়েরই ধারণা, স্তনে প্রথমদিকে যে ঘন পীতাভ দুধ আসে, ইংরেজীতে যাকে কোলোস্ট্রাম বলে—সন্তানের পক্ষে তা খারাপ। এই দুধ তাঁরা

ফেলে দেন। কিন্তু আসলে এই দুধই বেশি উপকারী। সন্তানপ্রসবের পর দিনকয়েক স্তনে যে দুধ আসে, সমস্ত দিক থেকেই সন্তানের পক্ষে তা উপকারী। সদ্যোজাত শিশু এই দুধে শক্তি পায়, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা লাভ করে।

জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস মায়ের দুধই শিশুর একমাত্র খাদ্য। প্রায় ৩ মাস থেকে ৬ মাস পর শিশুকে অন্য খাদ্যও দেওয়া দরকার। তারপর ক্রমশ তাকে মিশ্রখাদ্যে অভ্যস্ত করা উচিত। এই প্রক্রিয়ায় দুধ আস্তে আস্তে তার প্রধান ভূমিকা থেকে সরে আসে। তবু জীবনের প্রথম দু বছর শিশুর খাদ্য-হিসাবে দুধের অংশই সবচেয়ে বেশি থাকা বাঞ্ছনীয়।

দু বছর থেকে শুরু করে যতদিন শিশুর বাড় থাকে, শিশু তাড়াতাড়ি বড়ো হয়। এই সময় যদি তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খেতে দেওয়া হয় তাহলে সে তাড়াতাড়ি পূর্ণতা লাভ করে। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা সকলেই স্বীকার করেন, নিয়মিত দুধ খাওয়া বাড়ন্ত শিশুর পক্ষে খুবই দরকার।

যতদিন মায়ের বুকে দুধ থাকে ততদিন শিশুকে মায়ের দুধই খাওয়ানো উচিত। তারপর গোরু মোষ ছাগল প্রভৃতি জীবের দুধ খাওয়ানো যেতে পারে।

কিন্তু আধুনিক কালে পৃথিবীর বহুদেশে বহু শিশু মায়ের দুধ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। একেবারে জন্মকাল থেকেই বঞ্চিত। মাতৃস্তন্য কী তা তারা জানে না। জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই তারা কৌটোর দুধে বড়ো হতে আরম্ভ করে। এ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। পৃথিবীর ইতিহাসে সন্তানের প্রতি মায়ের এমন বৈরিতা আর কখনও দেখা যায় নি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম মা সন্তানের প্রতি বৈরী হয়েছেন। উন্মাদিনী মা নন, প্রকৃতিস্থা মা। একজন-দুজন মা নন, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মা। একটি-দুটি দেশের মা নন, প্রায় সারা পৃথিবীর মা। ধনী দেশের মা, নির্ধন দেশের মা। তাঁদের মধ্যে যেমন উচ্চশিক্ষিত আছেন তেমনি নিরক্ষরও আছেন। তাঁদের মধ্যে যেমন সংস্কারাচ্ছন্ন আছেন তেমনি সংস্কারমুক্তও আছেন।

এই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মা কিন্তু একজোট হয়ে ষড়্‌যন্ত্র করে তাঁদের সন্তানের প্রতি বৈরিতা করছেন না। তাঁদের মধ্যে সমন্বয় নেই, সংযোগ নেই। তাঁরা পরিকল্পনাহীন। তবু সবাই এক লক্ষ্যে ছুটে চলেছেন। বৈপরীত্যের এমন একগামিতা অন্যত্র দুর্লভ।

তাঁরা তাঁদের সন্তানদের স্তন্য দিচ্ছেন না।

পৃথিবীর গোটা ইতিহাসে এই প্রথম মা তাঁর সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করছেন। আধুনিক হবার মোহে, সফিস্টিকেটেড হবার বাসনায়, অন্যের দেখা-দেখি অথবা বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে বহু মা তাঁদের শিশুসন্তানদের স্তন্য না দিয়ে কৌটোর বেবিফুড খাওয়াচ্ছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রোটিন-উপদেষ্টা সংস্থার কথায় 'তাদের মৃত্যুপরোয়ানায় স্বাক্ষর করছেন'।

১৮৬০ সালে সুইজারল্যাণ্ডের এক অখ্যাত ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেনরি নেসলে গোরুর দুধ দিয়ে এক শিশুখাদ্য তৈরি করে জোর গলায় বলেছিলেন, "আমার এই আবিষ্কারের প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ, পৃথিবীতে আর কোনো খাদ্য নেই যার সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে।"

নেসলের কথার প্রথম অংশ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। এক শ বছরও লাগে নি, বেবিফুডে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মা স্তন্যদান ছেড়ে তাঁদের শিশুসন্তানদের সানন্দে সাগ্রহে সোল্লাসে গর্বভরে কৌটোর দুধ খাওয়াচ্ছেন।

১৯৮৩ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায়, চিলিতে স্তন্যদাত্রী মায়ের সংখ্যা তখন শতকরা মাত্র ৬, অথচ তার ২০ বছর আগে এই সংখ্যা ছিল ৯৫। স্তন্য-দাত্রী মায়ের সংখ্যা কমে যাওয়ায় চিলিতে শিশুমৃত্যুর হার বেড়েছে। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুদের চেয়ে যেসব শিশু কৌটোর দুধ খেয়ে বড়ো হয় তাদের মৃত্যুর হার তিনগুণ বেশি।

যাঁরা সন্তানকে স্তন্যদান করেন না তাঁদের বোঝা দরকার, প্রকৃতি তাঁদের বুকে দুধ দিয়েছে সন্তানকে খাওয়াবার জন্য। শিশুসন্তানের একমাত্র খাদ্য তাঁদের বুকের দুধ, আর কিছু না। পৃথিবীতে যত স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, সবাই আপন মাতৃস্তন্য পান করে বড়ো হয়। এক প্রাণীর শিশু সাধারণত অন্য প্রাণীর শিশুর খাদ্য খায় না। প্রকৃতি তার খাদ্য তার প্রয়োজন মেনে তারই মায়ের বুকে দিয়ে দিয়েছে। সেই খাদ্যের জুড়ি হয় না।

গো-শিশু তাড়াতাড়ি বড়ো হয় বলে তার খাদ্যে বেশি প্রোটিন দরকার, তাই গোরুর দুধে বেশি প্রোটিন। তিমি-শাবক উষ্ণ মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েই অমনি সমুদ্রের শীতল জলে পড়ে, শরীর গরম রাখতে তার বেশি স্নেহপদার্থ দরকার, তিমির দুধে তাই ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। এইরকমভাবে প্রতিটি প্রাণীর খাদ্যই বিশ্লেষণ করা যায় এবং বোঝা যায়, মানবশিশুর পক্ষেও তার মায়ের দুধই তার শ্রেষ্ঠ খাদ্য, অন্য কোনো প্রাণীর দুধ নয়। কৌটোর দুধ তো

আসলে গোরুর দুধ। বেশির ভাগ কৌটোর দুধই গোরুর দুধ। সেই দুধ যতই 'টোন' করা হোক, তা কখনও মানবশিশুর সম্পূর্ণ উপযোগী হতে পারে না। মানবশিশুর জন্মের পর প্রথম ৬ মাস এমন কোনো খাদ্য নেই যা তাকে মাতৃ-দুগ্ধের পরিবর্তে দেওয়া যেতে পারে। মাতৃদুগ্ধে শিশুর প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম পুষ্টিকর পদার্থই থাকে। যত নামী আর দামী বেবিফুডই হোক, কখনও মাতৃ-দুগ্ধের বিকল্প হতে পারে না। সেই কারণে স্লোগান উঠেছে, **'Breast milk is the best milk.'**

যতদূর জানা যায়, কৌটোর বেবিফুডের অপকারিতার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডাঃ সিসিলি উইলিয়মস নামে একজন শিশুরোগবিশেষজ্ঞ, 'মিল্ক অ্যাণ্ড মার্ডার' নামে তাঁর এক বক্তৃতায়, ১৯৩০ সালে।

কৌটোর বেবিফুড খাওয়ানো মানেই খারাপ, একথা সম্ভবত কেউই বলবেন না। অবস্থার চাপে কৌটোর দুধ কখনও কখনও খাওয়াতে হতে পারে। যাঁদের ভালো দুধ কেনার সামর্থ্য আছে, বাড়িতে রেফ্রিজারেটর আছে, শিশুস্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে তাঁরা যদি যথাবিহিতভাবে শিশুদের কৌটোর দুধ খাওয়ান তাহলে হয়তো আপত্তির তেমন কিছু নেই। কিন্তু আমাদের দেশে ক'জন বেশি দাম দিয়ে নামী কোম্পানির ভালো দুধ কিনতে পারেন? ক'জনের বাড়িতে রেফ্রিজারেটর আছে? ক'জন মা শিশুস্বাস্থ্যবিধি ভালো জানেন? এবং যাঁরা জানেন তাঁদের ক'জন ঠিকমতো তা মেনে চলেন?

সঙ্গতিহীন পরিবারে যে কৌটোর দুধ আসে তার মান নিচু। সেই দুধও আবার পরিমাণমতো জলে গোলা হয় না, অল্প দুধে বেশি জল মিশিয়ে শিশুকে খাওয়ানো হয়। ফলে শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, শেষে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া বিশুদ্ধ জলও পাওয়া যায় না সব জায়গায়। জল ফুটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও থাকে না সব সময়। বোতল আর নিপ্‌ল্ পরিষ্কারও করা হয় না সর্বক্ষেত্রে। সুতরাং প্রতিপদেই বিপদ থেকে যায়। বেশির ভাগ বিপদ আসে পেটের অসুখে। এই পেটের অসুখই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হয়।

ব্রাজলের একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, সে দেশে পাঁচ মাস বা তার কম বয়সের যেসব শিশুর মৃত্যু ঘটে তার প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে চারটিরই খাদ্য কৌটোর দুধ। পূর্ব আফ্রিকায় এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, অপুষ্টিজনিত রোগের কারণে যেসব শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেইসব শিশুকে কৌটোর

দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করলে তারা তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। ১৯২০ সালে অ্যামেরিকার মিনিয়াপোলিস শহরে মায়েদের বোঝানো হয়, "কৌটোর দুধের চেয়ে বুকের দুধ ভালো, শিশুদের কৌটোর দুধ না খাইয়ে বুকের দুধ খাওয়ান।" তাঁরা তা-ই খাওয়াতে শুরু করলে এক বছরের মধ্যে ঐ শহরে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ১৭২ থেকে কমে ৬৫-তে দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্যের কথা বাদ দিলেও খরচের কথা আছে। একটি শিশু সাধারণত দু বছরে প্রায় ৪০০ লিটার দুধ খায়। ক' কৌটো গুঁড়ো দুধে ৪০০ লিটার দুধ হয়? এবং তার দাম কত?

চিলিতে মায়েরা তাঁদের শিশুসন্তানদের বুকের দুধ না খাইয়ে যে পরিমাণ পুষ্টি হারান তা পূরণ করতে ৩০ হাজার গোরু দরকার। আবার, চীনের মায়েরা স্তন্যদানপ্রথায় ফিরে যাওয়ায় সে দেশে অঙ্কের দিক থেকে ১০ কোটি গোরুর প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, বর্তমানে অভাব-অনটনের সংসারে মায়েরা অনেকেই অপুষ্টির শিকার, তাঁদের বুকে দুধ নেই, তাঁরা খাওয়াবেন কী? এর স্পষ্ট উত্তর, হিসাব করে দেখা গেছে, মায়েদের মোটামুটি ভালো খাইয়ে তাঁদের শরীরে পুষ্টি যুগিয়ে বুকে দুধ আনতে যে খরচ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি খরচ বেবিফুড কিনতে। বেবিফুড কেনার চেয়ে মায়েদের কিছু পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা অনেক দিক থেকেই ভালো। তাতে যে কেবল শিশুরাই ভালো থাকে তা-ই নয়, মায়েরাও ভালো থাকেন। তাঁদের শরীরমন ভালো থাকায় শিশুরা বেশি আদরযত্ন পায়।

আবার, কেউ কেউ বলতে পারেন, বর্তমান সভ্যতায় নারীর স্তন আকারে ছোটো হয়ে যাচ্ছে, ফলে দুধ কম হচ্ছে। এই উক্তির প্রথমভাগ সত্য, দ্বিতীয়-ভাগের পিছনে বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো সত্যতা নেই। অপুষ্টি ও অন্যান্য কারণে আধুনিককালে নারীর স্তন সত্যিই ছোটো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দুগ্ধোৎপাদনের সঙ্গে স্তনের আকারের কোনো সম্পর্ক নেই। বড়ো স্তনেই বেশি দুধ, এমন কথা নেই। বরং ক্ষুদ্র স্তনেই অনেক সময় বেশি দুধ দেখা যায়।

একজন নারীর দুটি স্তনে কতখানি দুধ উৎপন্ন হবে তা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে প্রধান—সামাজিক পরিবেশ আর শরীর ও মনের স্বাস্থ্য। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, সাধারণত একজন নারীর দুটি

স্তনে প্রতিদিন গড়ে এক লিটার মতো দুধ উৎপন্ন হয়। উৎপাদন বাড়াবার জন্য ওষুধ খাওয়ার দরকার করে না। উৎপাদন কমানোর জন্য, এমন কি সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্যও ওষুধ আছে। কেবল মূঢ়রাই অপ্রয়োজনে সেই ওষুধ ব্যবহার করেন। স্তনের ক্রিয়া আর আয়তন প্রধানত পিট্যুইটারি হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কোনো কোনো আধুনিকা হয়তো বলবেন, সন্তানকে স্তন্যদান করলে ফিগার নষ্ট হবে না? উত্তরে বলা যায়, যাতে নষ্ট না হয় তার উপায় আছে। স্তন্যদানকাল শেষ হয়ে গেলে সামান্য কিছু ব্যায়ামের সাহায্যে স্তন দুটিকে অনেকখানি আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। গোড়ায় স্তন যতই কঠিন আর সুগঠিত হোক, অন্তঃসত্ত্বা হলে আয়তনে কিছুটা বাড়বেই এবং দীর্ঘকাল স্তন্যদান করলে কিছুটা নরমও হবে। কিন্তু স্তনের বিকৃতি রোধ করা সম্ভব—স্তনের পেশী 'টোন আপ' করার জন্য কিছু ব্যায়াম করে আর উপযুক্ত কাঁচুলি ব্যবহার করে। সেইসঙ্গে মেদবৃদ্ধিও রোধ করতে হবে।

স্তন্যদানে বাড়তি কিছু উপকারও আছে। স্তন্যদান কিছুটা গর্ভনিরোধকের কাজ করে এবং স্থূলাঙ্গী নারীরা বিনা আয়াসে খানিকটা মেদ কমাতে পারেন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, দীর্ঘকাল স্তন্যদান করলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায়। তবে গর্ভনিরোধের জন্য স্তন্যদানের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। স্তন্যদান গর্ভনিরোধের সহায়ক মাত্র।

ডিম্বাশয় আর স্তনের কার্যকলাপে অনেকটা পরস্পরবিরোধী ভাব আছে। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে স্তন যখন সক্রিয় থাকে তখন ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুনির্গমনও ব্যাহত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, স্তন্যদানে ডিম্বাণুনির্গমন অথবা ঋতুস্রাব বাধা পায়, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বন্ধ হয় না। তবে ডিম্বাণুনির্গমনে যে বিলম্ব ঘটে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

স্তন্যদান যেমন গর্ভরোধের অনেকটা স্বাভাবিক উপায় তেমনি দেখা গেছে, স্বাভাবিকভাবে মেদহ্রাসের ব্যাপারেও স্তন্যদানের ভূমিকা আছে। যাঁরা ভালো খান-দান তাঁদের কথা না-হয় বাদ দেওয়া গেল, অপুষ্টির শিকার যেসব নারী তাঁরাও গর্ভাবস্থায় বেশ খানিকা মোটা হন। তখন তাঁদের দেহের ওজন ৬ থেকে ৭ কিলোগ্র্যাম বেড়ে যায়। এই ৬ থেকে ৭ কিলোগ্র্যাম শুধুই ফ্যাট অর্থাৎ চর্বি। পরে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য শরীরে এই চর্বি জমে। একে বলে 'মিল্ক ব্যাক'।

প্রসবের পর সন্তানকে যদি স্তন্যদান করা না হয় তাহলে এই চর্বি শরীরে

থেকেই যায়। সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, স্বাভাবিকভাবে স্লিম হবার একটা প্রধান উপায় সন্তানকে স্তন্যদান করা। স্থূলাঙ্গী মায়েদের পক্ষে স্তন্যদান তাই বেশি দরকার।

সবশেষে একটা খবর দিই,—ব্যবসার খাতিরে পৃথিবীজুড়ে কৌটোর দুধের সপক্ষে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে যে অ্যামেরিকা সেই অ্যামেরিকাতেই এখন কৌটোর বেবিফুডের কদর কমতে শুরু করেছে। সে দেশের মায়েরা আবার স্তন্যদানে ফিরে যেতে আরম্ভ করেছেন।

দুই : দুধ একটা সম্পূর্ণ খাদ্য

মানুষ সাধারণত গোরু মোষ ছাগল ভেড়া আর উটের দুধই বেশি খায়। ঘোড়া, বল্গাহরিণ, লাল হরিণ, চমরী গাই, কৃষ্ণসার মৃগ ইত্যাদি প্রাণীর দুধও মানুষের খাদ্য। কুকুরের দুধও যে মানুষের খাদ্য হতে পারে, বাঙালীর পক্ষে তা কল্পনা করাও শক্ত। তবু তা সত্য। ১৯৮৮ সালের ৮ জুলাই তারিখের 'আজকাল' পত্রিকার একটি খবর বাঙালী পাঠকদের চমকে দিয়েছে। 'কুকুরের দুধ খেয়েই বড় হল মোহন' শিরোনামে কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত লিখেছেন—

মায়ের স্তন্যপানে বঞ্চিত মোহন বেঁচে থাকার তাগিদেই কুকুরের দুধ খেয়ে বেড়ে উঠেছে। দক্ষিণ শহরতলীর ঢাকুরিয়া রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ওর পাকাপাকি ঠিকানা। বয়স এখন ৯। কাঠি কাঠি দুটো হাত। পেটটা বড়। কালো কুচকুচে চেহারা। চেহারায় স্পষ্ট অপুষ্টির ছাপ। সব সময় দাঁত বের করে হাসছে। স্টেশন চত্বরের একটা বেওয়ারিশ কুকুর পরম স্নেহে মায়ের মত মোহনকে দুধ দিয়েছে। হা-ঘরে ছেলেটা ঐ কুকুরটাকেই এখন মা বলে ডাকে। মোহনের মানুষ-মা পুষ্প। বাবা জগদীশ। পদবি গাঙ্গুলী। জগদীশ ঠেলা চালায়। ট্রেনে তরিতরকারি এলে ঠেলায় করে নিয়ে যায় কালীঘাট অথবা লেক মার্কেটে। এখন বর্ষার সিজন। বাজার মন্দা। জগদীশের কাজ নেই। পুষ্প আগে 'বাবুর বাড়ি' কাজ করত। এখন আর করে না। ওর কোলে আর একটা বাচ্চা। মোহন যখন ছোট, খুব ছোট, ১১ মাস বয়স, তখন থেকে জগদীশ যেত ঠেলা চালাতে। পুষ্প যেত বাবুর বাড়ি কাজে। সকাল থেকে ছেলেটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকত একা। তখন থেকেই ফুলির সঙ্গে ওর ভাব। ফুলি ওর মা। ফুলি সেই কুকুরটা, যে ওকে দুধ দেয়।

ছোট ছোট দুটো হাত বাড়িয়ে ফুলিকে ডাকত মোহন। ফুলি এগিয়ে যেত মোহনের কাছে। এগার মাসের শিশু কচি কচি হাত দুটো দিয়ে ফুলিকে জড়িয়ে ধরে দুধ খেত।

"একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে দেখি মোহনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরিয়েছে। এত দুধ খেয়েছে যে, আর নড়তে পারছে না। কুকুরটা ওর পাশে বসে আছে মুখের দিকে তাকিয়ে। ঠিক যেন ওর মা", বলল পুষ্প। "আমি কাজে যেতাম,

ওর বাবাও থাকত না। ফুলিকে বলে যেতাম, তোর ছেলে রইল, দেখিস। ফুলি মাথা নেড়ে বলত, ঠিক আছে। আমি তখন নিশ্চিন্ত।"

পুষ্পকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কুকুরের দুধ খেয়ে এত বড় হল ছেলেটা, কোনো রোগটোগ হয় নি ?"

অবাক হল পুষ্প। বলল, "রোগ কি বাবু, ও তো আমার দুধ খায়ই নি কখনও। কুকুরের দুধ খেয়েই ও বাঁচতে শিখেছে।"

কুকুরের দুধ খেতে কেমন ? মোহন বলেছিল, "খুব মিষ্টি।"

দুধ একটা সম্পূর্ণ খাদ্য। শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত পুষ্টিদ্রব্যই দুধে আছে। দুধ সহজপাচ্য এবং সহজেই শরীরে পরিশোষিত হয়। তাই শিশু ছাড়াও স্বাস্থ্যহীন দুর্বল রুগ্‌ণ অশক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে দুধ সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। তবে সুস্থ স্বাভাবিক নীরোগ প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে দুধ অপরিহার্য, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে দুধ অপরিহার্য না হলেও প্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নেই। দুধে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন আর খনিজ দ্রব্য থাকে। তাই দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে যে অভাব থাকে, দুধের প্রোটিন তা পূরণ করে দিতে পারে, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের সঙ্গে দুধের প্রোটিন খেলে প্রোটিনের অভাব সম্পূরণ হতে পারে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আর দুধের প্রোটিন একসঙ্গে না খেয়ে যদি আলাদা আলাদাভাবে একদিন অন্তর অন্তর খাওয়া হয় তাহলে এই সম্পূরণ হয় না। এই কারণে দুধভাত দুধরুটি দুধসাগু অথবা চাল গম সাগু সিমাই ইত্যাদির পায়েস খুব পুষ্টিকর। ভাত রুটি সাগু ইত্যাদি আর দুধ একসঙ্গে না খেয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে খেলে এত পুষ্টি পাওয়া যায় না।

সব প্রাণীর দুধে সমান পরিমাণ ভিটামিন থাকে না। আবার, একই প্রাণীর দুধে সব ঋতুতে সমান পরিমাণ ভিটামিন পাওয়া যায় না। দুধে ভিটামিনের পরিমাণ নির্ভর করে কোন্‌ জাতের প্রাণী, তাকে কীরকম খেতে দেওয়া হচ্ছে, আবহাওয়া কেমন, কতখানি সূর্যের আলো পাওয়া যাচ্ছে ইত্যাদির উপর। সবুজ ঘাসপাতা খায় এবং গায়ে রোদ্দুর লাগায় যেসব প্রাণী সেইসব প্রাণীর দুধে ফ্যাটে-দ্রবণীয় ভিটামিন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যেসব গোরু মোষ ছাগল রোদ্দুরে মাঠে চরে খায় তাদের দুধে ভিটামিন-ডি বেশি পাওয়া যায়। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে দুধে বেশি ভিটামিন-ডি থাকে।

দুধ পাস্তুরাইজ করলে তার খাদ্যমূল্য বিশেষ নষ্ট হয় না। ভিটামিন-সি নষ্ট হয় শতকরা ২০ ভাগ আর ভিটামিন-বি$_1$ শতকরা ১০ ভাগ। দুধ ফোটালে ভিটামিন-বি$_1$ এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যায় আর ভিটামিন-সি নষ্ট হয় প্রায় অর্ধেক। দুধের সর আর তলানি ফেলে না দিলে দুধের ক্যালরিমূল্য হ্রাস পায় না।

সাধারণত মোষের দুধের চেয়ে গোরুর দুধে ভিটামিন-সি বেশি থাকে। কিন্তু দুধ পাস্তুরাইজ করলে বা ফোটালে এই ভিটামিন খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এমন কি, রোদ্দুরে রাখলেও নষ্ট হয়। স্বচ্ছ বোতলে ৩০ মিনিট যদি রোদ্দুরে রাখা হয় তাহলে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। তাই বলে দুধ পাস্তুরাইজ না করে বা না ফুটিয়ে কখনই খাওয়া উচিত নয়। কাঁচা দুধে নানা-রকম রোগ হতে পারে।

পাস্তুরাইজ না-করা অথবা না-ফোটানো দুধে সবসময়েই কিছু-না-কিছু রোগ-বীজাণু থাকে। তাই কাঁচা দুধে নানারকম রোগ হতে পারে, বিশেষ করে আমাদের দেশের মতো উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায়। সবচেয়ে বেশি যেসব রোগ হতে পারে তা হল টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি, যক্ষ্মা, ডিফথিরিয়া, ব্রুসেলোসিস, পোলিওমাইয়েলাইটিস, কলেরা, অ্যানথ্র্যাক্স, কিউ-ফিভার, ভ্যাকসিনিয়া এবং স্ট্যাফাইলোকক্যাল এনটেরো-টকসিন।

দুধ পাকস্থলীতে গিয়ে ফেটে যায় অর্থাৎ ছানা হয়ে যায়। পাকস্থলীতে রেনিন নামে একরকম এনজাইম আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় দুধ ছানা হয়। দুধে যত বেশি ক্যালসিয়ম আর কেসিন অর্থাৎ দুগ্ধসার বা ননী থাকে এবং পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড যত বেশি ঘন হয়, পেটের মধ্যে ছানা তত বেশি চাপ বেঁধে শক্ত হয়। ছানার এই শক্ত চাপ বাঁধার দরুনই হজমে দেরি হয়। এই যে ছানা চাপ বেঁধে শক্ত হয়, নানা উপায়ে তা নিবারণ করা যেতে পারে। সবচেয়ে সহজ উপায় হল দুধ ৩ থেকে ৫ মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে খাওয়া।

দুধভাত দুধরুটি দুধসাগু ইত্যাদি খেলে তাতে যেমন দুধের প্রোটিনের জৈবমূল্য বাড়ে তেমনি হজমেও সুবিধা হয়। অন্য খাদ্যের সঙ্গে মেশানো দুধ পাকস্থলীতে গিয়ে যখন ছানায় পরিণত হয় তখন সেই ছানা শক্ত হতে পারে না। দই ঘোল ইত্যাদি পরিপাকক্রিয়ায় ছানা হয় না বলে সহজপাচ্য।

দুধ সাধারণত সুপাচ্য খাদ্য, অন্ত্র থেকে খুব ভালোই পরিশোষিত হয়। তবু

দুধ বা দুধজাত জিনিস অনেকের পেটে সয় না। দুধ বা দুধজাত জিনিস খেলে যাঁদের ডিসপেপসিয়া অর্থাৎ অজীর্ণরোগ হয় তাঁদের প্রথমে ডাক্তার দেখানো উচিত। তাঁদের অন্ত্রে রোগবীজাণু থাকতে পারে। সেই রোগবীজাণু মারার পর তাঁরা অল্প অল্প করে দুধ খাওয়া অভ্যাস করতে পারেন। প্রথমে আধ কাপ দিয়ে আরম্ভ করতে পারেন, তারপর আস্তে আস্তে বাড়াতে পারেন। কিন্তু সেই দুধ আগে ৩ থেকে ৫ মিনিট ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে সর তুলে নিতে হবে। পরে সয়ে গেলে তখন পরিমাণমতো সাধারণ দুধ খেতে পারেন।

আমাদের দেশে দুধের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বহু শিশুর কপালে দুধ একেবারেই জোটে না, বয়স্কদের তো দূরের কথা। সব সময় যে টাটকা গোরুর অথবা মোষের দুধ খেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প থেকে গোরুর দুধ ছাড়াও টোণ্ড মিল্ক এবং ডবল টোণ্ড মিল্ক সরবরাহ করা হয়। আরও অনেক রাজ্য সরকারের দুগ্ধ প্রকল্প থেকেও করা হয়। টোণ্ড মিল্কে ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ টাটকা গোরুর দুধের সমান। টোণ্ড মিল্ক টাটকা গোরুর দুধের সমান পুষ্টিকর, অথচ দামে শস্তা। গোরুর দুধের চেয়ে মোষের দুধে ফ্যাট, ক্যালরি প্রভৃতি অনেক বেশি। মোষের দুধ অনেকের সয় না, অনেকের শরীরের পক্ষে মোষের দুধ ক্ষতিকর হতে পারে। তাঁরা গোরুর দুধ না পেলে স্বচ্ছন্দে টোণ্ড মিল্ক খেতে পারেন। অপুষ্ট শিশু ও গর্ভবতী নারীদের প্রোটিনের চাহিদা টোণ্ড মিল্ক থেকেও মিটতে পারে। টোণ্ড মিল্ক সম্বন্ধে কোনোরকম সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়। ডবল টোণ্ড মিল্কে ফ্যাট অনেক কম। যাঁদের কম ফ্যাট খাওয়া দরকার তাঁরা অনায়াসে ডবল টোণ্ড মিল্ক খেতে পারেন।

দুধের প্রসঙ্গে বলা দরকার, প্রসবের আগে এবং প্রসবের পরে দিন পাঁচেক গোরু মোষ প্রভৃতি প্রাণীর বাঁটে দুধের মত একরকম রস নিঃসরণ হয়। ইংরেজীতে তাকে বলে ফার্স্ট মিল্ক বা কোলোস্ট্রাম। এতে দুধের চেয়ে কম পরিমাণে ল্যাকটোজ আর ফ্যাট থাকে, কিন্তু প্রোটিন থাকে অনেক বেশি— গোরুর কোলোস্ট্রামে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ প্রোটিন থাকে আর মোষের কোলোস্ট্রামে প্রায় ২১ ভাগ। কোলোস্ট্রামে অ্যান্টিবডিও থাকে প্রচুর।

আমাদের দেশে কোলোস্ট্রাম সাধারণত কেউ খায় না, ফেলেই দেয়। কিন্তু কোলোস্ট্রামে প্রচুর প্রোটিন থাকে বলে পুষ্টিবিজ্ঞানীরা এখন কোলোস্ট্রাম ফেলে না দিয়ে খেতে বলছেন।

তিন : যাঁদের পেটে দুধ সহ্য হয় না

অনেকের পেটে দুধ সহ্য হয় না। তাঁরা দুধ বা দুধ দিয়ে তৈরি কোনো জিনিস খেলেই অমনি পেটের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। সাধারণত পনের মিনিট থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই গোলমাল শুরু হয়, যেমন—পেটে ব্যথা, পেটের মধ্যে গুড় গুড় শব্দ, পেট ফোলা, পেটে বায়ু, পেট খারাপ ইত্যাদি। অনেক সময় বমি-বমি ভাবও হয়।

পেটে দুধ সহ্য না হওয়ার প্রধান কারণ দুটি। প্রথম, দুধের প্রোটিনে অ্যালার্জি ; এবং দ্বিতীয়, অন্ত্রে ল্যাকটেজ নামে একরকম এনজাইমের অভাব।

দুধে অ্যালার্জি খুব কমই দেখা যায়। পেটে দুধ সহ্য না হওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ অন্ত্রে ল্যাকটেজের অভাব।

দুধে যে শর্করা থাকে তার নাম ল্যাকটোজ। ল্যাকটোজ সরাসরি হজম হয় না। ল্যাকটোজ প্রথমে ল্যাকটেজ নামক এনজাইমের সাহায্যে ভেঙে গ্লুকোজ আর গ্যাল্যাকটোজে পরিণত হয়, তারপর তা হজম হয়। এখন, অন্ত্রের মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ল্যাকটেজ তৈরি না হয় অর্থাৎ আপনি যতখানি দুধ খেলেন তার মধ্যেকার সমস্ত ল্যাকটোজকে ভেঙে গ্লুকোজ আর গ্যাল্যাকটোজে পরিণত করার মতো ল্যাকটেজ যদি পাওয়া না যায় তাহলে পেটের মধ্যে কিছু অ-জীর্ণ ল্যাকটোজ থেকে যাবে—এবং সেই অ-জীর্ণ ল্যাকটোজই গোলমাল বাধাবে।

যাঁদের ল্যাকটোজ সহ্য হয় না, ডাক্তারী ভাষায় তাঁদের বলা হয় ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্ট। জন্মের সময় যাঁদের অন্ত্রে ল্যাকটেজ কম থাকে অথবা পরে আন্ত্রিক রোগের কারণে যাঁদের অন্ত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে ল্যাকটেজ তৈরি হতে পারে না, সাধারণত তাঁদের ক্ষেত্রেই ল্যাকটোজ ইনটরাল্যান্স দেখা যায়।

শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখনই তার অন্ত্রে ল্যাকটেজের ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মাতৃগর্ভে শিশু যত বড়ো হতে থাকে ততই তার অন্ত্রে ল্যাকটেজের ক্রিয়া বাড়তে থাকে—এবং ভূমিষ্ঠ হবার আগেই ল্যাকটেজের ক্রিয়া স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌছে যায়। এখন, যদি কোনো শিশু অকালে প্রসূত হয় অর্থাৎ তার অন্ত্রে ল্যাকটেজের ক্রিয়া স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌছবার আগেই সে ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে

সে ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্ট হবে। তখন তার পেটে ল্যাকটোজ সহ্য হবে না। ল্যাকটোজ আছে এমন দুধ একটু বেশি খেলেই তার পেটে গোলমাল দেখা দেবে। একে বলে ডেভেলপমেন্টাল ল্যাকটেজ ডেফিশিয়েন্সি। এই ধরনের ল্যাকটেজ ডেফিশিয়েন্সি খুব বেশি দেখা যায় না।

যে ধরনের ল্যাকটেজ ডেফিশিয়েন্সি বেশি দেখা যায় তার নাম লেট-অনসেট ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স অথবা হাইপোল্যাকটেশিয়া। নামেই বোঝা যাচ্ছে, এই ইনটলার‍্যান্স জন্মের সময় থাকে না, পরে কোনো কারণে তা সৃষ্টি হয়। সাধারণত জন্মের পর দু থেকে পনের বছর বয়সের মধ্যে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই রোগ বংশগত—অটোসোমাল রিসেসিভ জিন মারফৎ মা-বাবার কাছ থেকে সন্তানে আসে।

এই লেট-অনসেট ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স পৃথিবীর কতকগুলি বিশেষ জাতির মধ্যেই বেশি দেখা যায়, যেমন—এশিয়ান, আফ্রিকান, অ্যামেরিকান-ইণ্ডিয়ান আর এস্কিমোদের মধ্যে। নর্থ ইয়োরোপীয়ানদের মধ্যে এই রোগ কদাচিৎ দেখা যায়।

একটা হিসাবে জানা যায়, অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় পাঁচ কোটি প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকের পেটে দুধ সহ্য হয় না—এবং তাঁদের অধিকাংশই এশিয়ান আর এস্কিমো।

প্রসঙ্গত, একমাত্র মানুষ ছাড়া আর সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী মাতৃস্তন্যপান ছেড়ে যখন অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত হয় তখন তাদের মধ্যে ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স দেখা দেয়। অর্থাৎ, দুধ আর তখন তাদের খাদ্য নয়। একমাত্র মানুষই সারা জীবন দুধ খেতে পারে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে রোগব্যাধির দরুন সাময়িকভাবে ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স দেখা দিতে পারে। শিশুদের যদি তীব্র আকারে উদরাময় হয় তাহলে এই ধরনের ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স দেখা দেয়। সাধারণত 'রোটা ভাইরাস' নামে এক জাতের ভাইরাসের জন্যই শিশুদের গ্যাস্ট্রো-এণ্টেরাইটিস রোগ বেশি হয়। তখন তারা ল্যাকটোজ আছে এমন দুধ সহ্য করতে পারে না।

আবার, ক্ষুদ্রান্ত্রে যদি অধিক সংখ্যায় ব্যাকটিরিয়া জন্মায় তাহলেও ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স দেখা দিতে পারে। জিয়ার্ডিয়াসিস, গ্লুটেন সেন্সিটিভ এণ্টেরো-প্যাথি, গোরুর দুধের প্রোটিনের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং শৈশবের দীর্ঘস্থায়ী উদরাময়ের কারণেও ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স দেখা দিতে পারে। এ ছাড়াও

আরও অনেক কারণে ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষতির দরুন ল্যাকটেজ উৎপাদন ব্যাহত হলে ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স দেখা দিতে পারে।

বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ল্যাকটেজ ডেফিশিয়েন্সি অর্থাৎ অন্ত্রে যে যথেষ্ট পরিমাণে ল্যাকটেজ তৈরি হতে পারে না এটা বংশগত ব্যাপার। কারণ, কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ল্যাকটেজ ডেফিশিয়েন্সি খুব বেশি দেখা যায়, আবার কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে খুব কম দেখা যায়। একই জাতি-গোষ্ঠীর যারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের ডেফিশিয়েন্সি মূল ভূখণ্ডে তাদের সগোত্রদেরই ডেফিশিয়েন্সির মতো। যেমন, অ্যামেরিকায় যেসব এশিয়ান বসবাস করে তাদের ল্যাকটেজ ডেফিশিয়েন্সি ভারত আর পাকিস্তানের অধিবাসীদের ডেফিশিয়েন্সির মতো।

এখনও পর্যন্ত এমন কোনো উপায় বার হয় নি যাতে অন্ত্রের মধ্যে ল্যাকটেজের উৎপাদন বাড়িয়ে ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্স দূর করা যায়। ল্যাকটোজ যাঁরা সহ্য করতে পারেন না তাঁদের সাধারণত দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য কম খেতে বলা হয়। তাঁরা কতখানি দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য খাবেন তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না, কারণ এক-একজনের এক-এক মাত্রার ল্যাকটেজ ডেফিশিয়েন্সি। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে নিজেই দেখে নিতে পারেন কতখানি তাঁর সহ্য হয় অর্থাৎ **trial and error method** অনুসরণ করে তিনি তাঁর **tolerance**-এর মাত্রা বার করতে পারেন।

কিন্তু শিশুদের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুধ এবং দুধ থেকে তৈরি সমস্ত জিনিস একেবারে বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না—অথচ দেহের পুষ্টির জন্য দুধ আর দুধ থেকে তৈরি জিনিসই তাদের বেশি দরকার।

সুখের কথা, আজকাল বাজারে এমন বেবিফুডও কিনতে পাওয়া যায় যার মধ্যে ল্যাকটোজ থাকে না। যেসব শিশু ল্যাকটোজ ইনটলার‍্যান্ট, দুধের বদলে তাদের সেই ল্যাকটোজ-ফ্রি বেবিফুড খাওয়ানো যেতে পারে।

চার : আতপ চালের চেয়ে সিদ্ধ চাল ভালো

ধানের খোসাকে বলে তুষ। তুষ ছাড়ালে যে চাল পাওয়া যায় তার উপর লাল একটা পর্দা থাকে, সেই পর্দার গুঁড়ো হল কুঁড়ো। ঢেঁকি-ছাঁটা চালে বেশি কুঁড়ো বার হয় না, চালের গায়েই অনেকটা লেগে থাকে। ফলে, ঢেঁকি-ছাঁটা চালে ভিটামিন বেশি পাওয়া যায়।

চালকলে মেশিনে যখন ধান ভানা হয়, চালের উপরকার ঐ লাল পর্দা, তার ঠিক নিচে অ্যালিউরোন নামে প্রোটিনসমৃদ্ধ একটি স্তর আর ভ্রূণ—সবই চলে যায়। তাতে চালের ওজন কমে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ এবং পুষ্টিও কমে প্রচুর। চালের কুঁড়ো, অ্যালিউরোন আর ভ্রূণ খুবই পুষ্টিকর। লাল কুঁড়োয় অনেক রকম পুষ্টিকর পদার্থ ছাড়াও সেল্যুলোজ আছে। অ্যালিউরোনে আছে নানা ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, প্রোটিন আর ফ্যাট। আর, ঐ জার্ম বা ভ্রূণে আছে ভিটামিন-ই আর নানারকম পুষ্টিদ্রব্য।

চালকলে নানা পদ্ধতিতে ধান ভানা হয়, সব পদ্ধতিতেই কিছু-না-কিছু ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ক্যালসিয়ম, লোহা, প্রোটিন আর ফ্যাট নষ্ট হয়। কতখানি নষ্ট হবে তা নির্ভর করে পদ্ধতির উপর। কোনো কোনো পদ্ধতিতে শতকরা ৭৫ ভাগের উপর থায়ামিন নষ্ট হয়। অন্য খাদ্যে থায়ামিন পাওয়া না গেলে কলে-ছাঁটা চালে বেরিবেরি হতে পারে।

সুতরাং ঢেঁকি-ছাঁটা চাল পাওয়া গেলে সব সময় ঢেঁকি-ছাঁটা চালই খাওয়া ভালো।

আবার, আতপ চালের চেয়ে সিদ্ধ চাল ভালো। ধান সিদ্ধ করলে খোসার নিচে লাল পর্দা থেকে বি-ভিটামিন দানার মধ্যে চলে যায়; তারপর যখন কলে ধান ভানা হয় তখন লাল পর্দার সঙ্গে ভিটামিন বেরিয়ে আসতে পারে না, চালের মধ্যে থেকে যায়। তাই সিদ্ধ চাল খুব বেশি সাদা হলেও থায়ামিন অনেকটাই থাকে। নিকোটিনিক অ্যাসিডও থাকে। বেরিবেরি ঠেকানোর সবচেয়ে সহজ উপায় সিদ্ধ চাল খাওয়া।

রান্নার আগে চাল বেশি করে ধুলে আর রান্নার পরে ভাতের মাড় ফেলে দিলে ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হয়। বি-ভিটামিন সবই জলে খুব সহজেই

দ্রবীভূত হয়, তাই জল ফেলে দিলে ভিটামিনও ফেলে দেওয়া হয়। আতপ চাল হলে জলের সঙ্গে বেশি ভিটামিন চলে যায়, সিদ্ধ চাল হলে কম ভিটামিন যায়।

চাল ধোয়ার ব্যাপারে মনে রাখা দরকার, যত বেশি জলে যত বেশি ধোয়া হবে তত বেশি ভিটামিন নষ্ট হবে। ধোয়ার দরুন শতকরা ৩৩ ভাগ পর্যন্ত ভিটামিন নষ্ট হতে পারে। সুতরাং রান্নার আগে অনেক বেশি জলে কচলে কচলে বার বার চাল ধুতে নেই।

ভাতের মাড় ফেলে দিলে কেবল ভাতই কমে না, ভাতের পুষ্টিও অনেক কমে যায়। মাড়ের সঙ্গে শতকরা ৩৩ ভাগ পর্যন্ত থায়ামিন চলে যেতে পারে।

দক্ষিণ ভারতে একটা পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, ধানকলের ছোবল থেকে যতখানি থায়ামিন আর নিকোটিনিক অ্যাসিড বাঁচানো সম্ভব হয় তার অর্ধেকটাই নষ্ট হয় গৃহিণীদের হাতে। কখনও কখনও বেশিও হয়।

বাজারে যদি পরিষ্কার চাল পাওয়া যায় তাহলে ভালো করে বেছে খুঁটে অল্প জলে ধুয়ে নিলেই চলে ; তারপর মাপমতো জল দিয়ে ভাত চাপালে মাড় গালার দরকার করে না। এইভাবে ভাতের পুষ্টি অনেকখানি বাড়ানো যায়। জল যদি বেশি হয়ে যায়, মাড় যদি গালতেই হয় তাহলে মাড়টা ফেলে না দিয়ে নুন চিনি একটা-কিছু মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। এমনি খেতে পারলে তো উত্তম।

চাল সম্বন্ধে শেষে একটা কথা বলি : বাংলায় একটা প্রবচন আছে, 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।' সত্যিই বাড়ে কিনা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, যত ভালো চালই হোক না কেন, বেশিদিন ঘরে রেখে দিলে তার পুষ্টিমূল্য কমে যায়। শুধু চালের বেলায় নয়, যে কোনো দানাশস্যের বেলায় একথা সত্যি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, **"The soundest grain, if kept too long, must become unfit for use."**

পাঁচ: গরিবের মাংস

দানাশস্য, শুঁটিজাতীয় শস্য আর মাংস—এই তিনরকম খাদ্যের প্রোটিনের তুলনা করলে দেখা যাবে, শুঁটিজাতীয় শস্যেই প্রোটিন বেশি। দানাশস্য বলতে চাল গম ভুট্টা ইত্যাদি আর শুঁটিজাতীয় শস্য বলতে ডাল।

ডালের প্রোটিন থেকে মোট যে শক্তি পাওয়া যায় তার শতকরা হার মাংসের চেয়ে বেশি, চাল গম ভুট্টার চেয়ে অনেক বেশি। এইসব প্রোটিনের গুণ বিচার করা যেতে পারে মেথিওনাইন, লাইসিন আর ট্রিপ্টোফেন নামে তিনরকম অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড কী পরিমাণে আছে তা দেখে। ডালের প্রোটিনে মেথিওনাইনের পরিমাণ কম, তাই খাদ্যে নাইট্রোজেনের একমাত্র উৎস হিসাবে ডালের প্রোটিন খুব একটা উপযুক্ত নয়। তবে ডালের প্রোটিনে লাই-সিনের পরিমাণ চাল গম ভুট্টার চেয়ে অনেক বেশি এবং মাংসের কাছাকাছি। ডালে ট্রিপ্টোফেনের পরিমাণ সাধারণভাবে চাল গমের চেয়ে কম তবে ভুট্টার চেয়ে বেশি।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভুট্টা যাদের প্রধান খাদ্য তাদের বীনজাতীয় জিনিসও খাওয়ার দরকার এবং ভাত রুটি আর মাংসে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি প্রোটিন পাওয়া যায় ভাত রুটি আর ডালে—এবং দুরকম খাদ্যের প্রোটিনই গুণের দিক থেকে মোটামুটি সমান।

আজ থেকে ৩০০০ বছর আগে মানুষ অভিজ্ঞতাবলে যা জেনেছিল, পরে রাসায়নিক বিশ্লেষণে তা প্রমাণিত হয়েছে: "Pulses are the poor man's meat, and they promote good health." ওল্ড টেস্টামেণ্টের একটা গল্পে এর সুন্দর উদাহরণ আছে।

বেবিলনের রাজা নেবুকাডনেজার জেরুজালেম অধিকার করে নেবার পর স্থির করলেন, ড্যানিয়েল আর অন্য তিনজন তরুণ ইহুদীকে তিনি তাঁর প্রাসাদে নিয়ে যাবেন। নেবুকাডনেজার 'appointed them a daily provision of the King's meat, and of the wine which he drank'. ড্যানিয়েল এই দান প্রত্যাখ্যান করলেন এবং রাজপরিবারের একজন কর্মচারী মেলজারের কাছে আবেদন জানালেন: "Prove thy servants, I beseech thee, ten days;

and let them give us pulse to eat and water to drink. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenances of the children that eat of the portion of the King's meat: and as thou seest, deal with thy servants." এই প্রস্তাব গৃহীত হল এবং "at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the King's meat."

মানুষের পুষ্টি সম্পর্কে এই হয়তো সীমাবদ্ধ আকারে প্রথম পরীক্ষা। পরীক্ষায় দেখা গেল, মাংসের বদলে ডাল খেয়ে ১০ দিনের মধ্যেই ড্যানিয়েল আর তার সঙ্গীদের চেহারা ফিরে গেছে, যারা মাংস খেয়ে ছিল তাদের চেয়ে বেশি সুন্দর আর বেশি মাংসল হয়েছে।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে অসবোর্ন আর মেণ্ডেল খাদ্যের প্রোটিনের গুণাগুণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা আরম্ভ করেন। তার পরেই প্রাণিজ প্রোটিনকে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন আর উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন বলা হতে থাকে। বহু বছর ধরে ছাত্রদেরও একথা শেখানো হতে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে একটা ভুল থেকে যায়: উদ্ভিজ্জ প্রোটিন তখনই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন যখন নাইট্রোজেনের একমাত্র উৎস হিসাবে একটিমাত্র উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাওয়া হয়, কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেলে দ্বিতীয় শ্রেণী বলে কিছু থাকে না।

সুতরাং ডাল সত্যিই 'গরিবের মাংস'। নিরামিষাশীদের অবশ্যই ডাল খাওয়া উচিত।

ডালের একটা বদনাম আছে যে, ডাল সকলের পেটে সয় না; ডাল গুরুপাক, সহজে হজম হতে চায় না। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। স্বাস্থ্যের বিচারে ডাল প্রায় সম্পূর্ণই পরিপাক হয় এবং ডালের প্রধান প্রধান পুষ্টিদ্রব্যের পরিশোষণও হয় প্রায় সম্পূর্ণ, আর চাল গম ইত্যাদির আত্তীকরণের মতোই প্রায় তার আত্তীকরণ হয়। তবে অতি সামান্য আন্ত্রিক গোলযোগ থাকলেও ডালের পরিপাক অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। তখনই পেটে বায়ুর প্রকোপ বাড়তে পারে।

সয়াবীন ডালজাতীয় শস্য, কিন্তু আমাদের দেশে সয়াবীন ডাল হিসাবে বড়ো একটা ব্যবহার হয় না। সয়াবীনের ব্যবহারও আমাদের দেশে খুব একটা নেই। এই সবে আমাদের দেশের মানুষ সয়াবীন খেতে শুরু করেছে।

কিন্তু চীনে সয়াবীনের চল কয়েক হাজার বছর থেকে। শুকনো দানা-সয়াবীনে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ প্রোটিন থাকে, অধিকাংশ ডালের প্রোটিনের প্রায় দ্বিগুণ।

চীনাবাদাম আসলে বাদাম নয়, ডাল। শুঁটিজাতীয় গাছের বীজ বলে চীনাবাদামকে বাদাম না বলে ডাল বলাই সঙ্গত। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও আজ চীনাবাদামকে কেউ ডাল বলতে রাজী হবে না। পুষ্টিমূল্যের দিক থেকে চীনাবাদাম অন্য অনেক ডালেরই মতো, তবে চীনাবাদামে ফ্যাট অনেক বেশি। গোটা দানার চীনাবাদামে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ ফ্যাট, সয়াবীনের দ্বিগুণ।

শেষে একটা কথা বলি, একনাগাড়ে কয়েক সপ্তাহ দেশী ছোলা খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে যায় দেখা গেছে। খুব সম্ভব রক্তের কোলেস্টেরল পৈত্তিক অম্ল অর্থাৎ পিত্ত-অ্যাসিডে পরিণত হয়ে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

এ সম্বন্ধে অ্যান্টিয়া পরিষ্কার বলেছেন, "Bengal gram consumed over a period of several weeks may reduce serum cholesterol by increasing faecal excretion of total bile acids."

ছোলা ভিজিয়ে খাওয়াই ভালো এবং অঙ্কুরিত হলে আরও ভালো।

ছয় : খাবারে রং

খাবারে রং অনেক সময়েই খারাপ ; শুধু রং নয়, অ্যাডিটিভও খারাপ। কারণ, রং বা অ্যাডিটিভ হিসাবে খাবারে সাধারণত যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাতে কখনও কখনও শরীরে মারাত্মক বিষক্রিয়া হতে পারে। বিষক্রিয়া বলতে প্রথমে শরীরে কোনো কেমিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল বা বায়ো-ফিজিক্যাল রি-অ্যাকশন এবং পরে ইংরেজীতে যাকে ভাইট্যাল অর্গ্যান বলে, শরীরের অতি প্রয়োজনীয় সেইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি। সাধারণত হৃৎপিণ্ড ফুসফুস কিডনি চোখ জননযন্ত্র ইত্যাদির ক্ষতি হয়, শরীরের ওজন কমে, অ্যালার্জি হয়, রোগপ্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস পায় এবং আরও বিভিন্ন রকমের অসুখ দেখা দেয়।

তবে আমাদের শরীরের মধ্যে অনেক বিষকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার একটা ব্যবস্থা আছে, তাকে বলে ডিটকসিফিকেশন মেকানিজম। এই মেকানিজমের সাহায্যে শরীরের মধ্যে অনেক বিষই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়িয়ে গেলেই বিপদ ঘটে।

এক-একটা রাসায়নিকের এক-একটা পরিমাণ বাঁধা আছে যা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে গিয়ে ডিটকসিফিকেশন মেকানিজমের সাহায্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং সারা জীবন প্রতিদিন ঐ পরিমাণ রাসায়নিক খেলেও শরীরের তেমন ক্ষতি হয় না। একটা রাসায়নিকের এই যে সর্বোচ্চ পরিমাণ যা সারা জীবন ধরে প্রতিদিন খেলেও শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয় না তাকে ঐ রাসায়নিকের 'acceptable daily intake' বলে, সংক্ষেপে ADI. এই ADI পর্যন্ত কিছু রং অনেকটা নির্ভাবনায় খাওয়া যেতে পারে।

তবে খাবারে রং না দিতে পারলেই ভালো। কিন্তু অনেক সময় খাবার সুদৃশ্য ও লোভনীয় করার জন্য রং দেবার দরকার হয়। সাদা টফি-লজেন্সের চেয়ে রঙিন টফি-লজেন্সই বেশির ভাগ লোকের পছন্দ ; বিয়ে বা অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অনেকেই রঙিন মিষ্টি পছন্দ করেন ; কেক-পেষ্ট্রি সাদা হবে ভাবতেই পারেন না অনেকে ; পিঠে-পায়েসেও একটু রঙের ছোঁয়া অনেকের ভালোলাগে ; মাঝে মাঝে রঙিন আইসক্রীম পেলে অনেকেই খুশি হন ; খাঁটি ফলের রসও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে দেখতে একরকম হয় না, একই

কোম্পানির একই ফলের রস বা স্কোয়াশের রং ঠিক রাখতে অনেক সময় বাইরে থেকে রং মেশাবার দরকার হয়।

সুতরাং খাবারে রঙের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা যাবে না। ব্যবসায়ীরা যেমন তাদের ভোজ্য পণ্য ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য খাবারে রং মেশাবে, ক্রেতারাও তেমনি ভালোলাগে বলে রঙিন খাবার কিনবে।

খাদ্যবিজ্ঞানে এই ভালোলাগারও একটা মূল্য আছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ভালোলাগে বলে যে খাবার খাওয়া যায় সেই খাবার সহজে হজম হয় এবং তার পুষ্টি সহজে গায়ে লাগে। একবার কথা উঠেছিল, রঙিন খাবার খেলে শিশুরা চঞ্চল হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে হাইপার-কাইনেসিস বা সাইকো-কাইনেসিস নামে একরকম অস্বাভাবিক ভাব দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সেকথার সত্যতা প্রমাণ হয় নি।

সুতরাং বলা যেতে পারে, রঙিন খাদ্য একদিক দিয়ে ভালো। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবসায়ীদের সততার বালাই বড়ো একটা নেই বলেই মুশকিল। আমাদের দেশে বেশির ভাগ ব্যবসায়ীই অসৎ এবং অসাধু। তারা দামে সস্তা বলে খাবারে বিষাক্ত রং মেশায় এবং খাবারের রং বলে বিষাক্ত রং বিক্রি করে।

বিষক্রিয়া কম এবং খাবারে ব্যবহারের উপযুক্ত ১০টি কৃত্রিম রং আমাদের দেশে আইনে অনুমোদিত হয়েছে। আইন অনুযায়ী কেবল এই ১০টি রংই খাবারে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার বাইরে কোনো রং খাবারে ব্যবহার করলে আইনত তা দণ্ডনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে ক'জন ব্যবসায়ী আইনের তোয়াক্কা করে এবং দণ্ডকে ভয় পায়?

আমাদের দেশে আইন-অনুমোদিত রং হচ্ছে: লাল—Ponceau 4R, Carmoisine, Amaranth, Erythrosine; হলুদ—Tartrazine, Sunset Yellow; নীল—Indigo Carmine, Brilliant Blue FCF; সবুজ—Green-S, Fast Green FCF. এই রংগুলি সবই জলে দ্রবণীয় অ্যাসিড রং। তেলে দ্রবণীয় কৃত্রিম কোনো রং বা বেসিক রং অনুমোদিত হয় নি।

আমাদের দেশে যে যে খাবারে রং দেওয়া অনুমোদন করা হয়েছে তা হল: আইসক্রীম, কিছু কিছু দুগ্ধজাত দ্রব্য, বিস্কুট, পেস্ট্রি ও কনফেকশনারি, কিছু কিছু ফলজাত দ্রব্য, কিছু কিছু অ্যালকোহলিক ও নন-অ্যালকোহলিক পানীয়, কাস্টার্ড পাউডার, জেলি ক্রিস্ট্যাল, সুপ পাউডার, প্রসেস-করা ও প্রিজার্ভ-করা শাকসবজি, ফ্লেভারিং এজেন্ট, আইস-ক্যাণ্ডি ইত্যাদি।

আইনে আছে, এক কিলোগ্রাম খাবারে ২০০ মিলিগ্রামের বেশি রং দেওয়া যাবে না। আইন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে কোনো রং-ই যেন ADI ছাড়িয়ে যেতে না পারে।

কৃত্রিম রং ছাড়া কিছু প্রাকৃতিক রংও আইনে অনুমোদন করা হয়েছে যা খাবারে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন—Carotene ও কয়েকটি Carotenoid, Chlorophyll, Caramel, Riboflavin (Lactoflavin), Annatto, Saffron এবং Carcumin. চিনি পোড়ালে ক্যারামেল তৈরি হয় এবং অনেক খাদ্য ও পানীয়ে ক্যারামেলের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। কোলা জাতীয় পানীয় তো ক্যারামেল ছাড়া হয়ই না। টেবিল বাটার অর্থাৎ কাঁচা খাওয়ার জন্য বাজারে যে মাখন কিনতে পাওয়া যায় তাতে অ্যানাটো থাকে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, গাছগাছড়া ইত্যাদি থেকে পাওয়া প্রাকৃতিক রং নিরাপদ আর রাসায়নিক উপায়ে তৈরি কৃত্রিম রং বিষাক্ত এমন ধারণা ঠিক নয়। প্রাকৃতিক রংও বিপজ্জনক হতে পারে। প্রাকৃতিক রং আর কৃত্রিম রং পৃথক পৃথকভাবে বিচার করে তাদের নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক রং রতনজোট প্রথমে অনুমোদিত হয়েছিল, পরে তাতে বিষক্রিয়া হয় দেখতে পেয়ে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আগেই বলেছি, আমাদের দেশের বেশির ভাগ ব্যবসায়ীই অসৎ এবং অসাধু। বেশি লাভের জন্য খরিদ্দার ঠকাতে তাদের বিবেকে বাধে না। এমন কি, প্রাণে মারতেও না। নইলে ভেজাল খাবার, জাল ওষুধ বাজারে চলে কীকরে? আইনের ফাঁকফোকর তারা ভালো করেই জানে। আবার, আইনের জালে ধরা পড়লে কীকরে জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারা যায় তা-ও তাদের ভালোরকম জানা আছে।

সুতরাং খাবারে তারা আইন-অনুমোদিত রং মেশাবে তার গ্যারান্টি কোথায়? বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলি তাদের সুনাম বজায় রাখার জন্য খাবারে আইনসম্মত রং মেশাতে পারে, কিন্তু বড়ো বড়ো কোম্পানির জিনিসের দাম সাধারণত একটু বেশিই হয়। লোকে সস্তা খোঁজে—এবং ছোটো কোম্পানিগুলিই কিছু সস্তা দিতে পারে। বিপদ সেখানেই।

ছোটো কোম্পানি হলেই যে সব সময় বেশি লাভের জন্য খাবারে সস্তা দামের বিষাক্ত রং মেশাবে তা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না। অনেক সময় হাতের

কাছে খাবারের রং পাওয়া যায় না বলেও মেশাতে পারে। আবার, কখনও কখনও অজ্ঞতার কারণেও মেশাতে পারে। যে কারণেই মেশাক, ফল কিন্তু একই—শারীরিক ক্ষতি, মারাত্মক রোগব্যাধি।

আইনে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও এখনও মেটানিল ইয়োলো বাজারে কিশোরী রং বা পোলাওয়ের রং হিসাবে বিক্রি হয় এবং অবাধে তা নানারকম খাবারে ব্যবহার করা হয়। খাবারের রং হিসাবেই ময়রার দোকানে এই বিষাক্ত রং কেনে এবং বোঁদে জিলিপি মিহিদানা ইত্যাদিতে ব্যবহার করে। কাটা ফলেও মেটানিল ইয়োলো ব্যবহার করা হয়।

শহরের বাজারে আজকাল দোকানীরা অনেক সময় প্রকাশ্যেই পাকা উচ্ছে পটল ঝিঙে ইত্যাদিতে ডায়মণ্ড গ্রীনের মতো বিষাক্ত সবুজ রং মিশিয়ে 'কাঁচা' করে। রাঙা আলুতে ম্যাজেণ্টা রং মিশিয়ে রাঙা আলুর জৌলুস বাড়ায়। পচা মাছ 'টাটকা' করতে মাছের কানকোয় লাল রং মেশায়, বাসি মাছ 'তাজা' দেখাতেও মেশায়। এইরকম এক লাল রঙের নাম খুনী রং। মানুষ খুন করতে পারে বলে খুনী রং এমন মনে করার কারণ নেই, খুন অর্থাৎ রক্তের মতো লাল বলেই হয়তো খুনী রং।

ডালে হলুদ বা কমলা রং, চায়ে কমলা বা লাল রং, গুঁড়ো হলুদে হলুদ রং—এইরকম কত জিনিসে কত বিষাক্ত রং মেশানো হয় তার কিছু কিছু অনেকেরই জানা আছে। বেশির ভাগ লোকেরই যা জানা নেই তা হল, গোরুর দুধে একটা পাতলা হলুদ রং থাকে, মোষের দুধ একেবারে সাদা—তাই কখনও কখনও মোষের দুধে জল মিশিয়ে তাতে একটুখানি হলুদ রং দিয়ে গোরুর দুধ বলে চালানো হয়। আবার, খুব পাতলা চিঁড়েয় কাপড়ে-নীল-দেওয়ার-মতো আলট্রামেরিন রং দিয়ে তার বাহার বাড়ানো হয়।

এইসব রং অনেক সময় খালি চোখে দেখে বোঝা যায় না, ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করালেই ধরা পড়ে। এইসব খাদ্যে অননুমোদিত রং তো বটেই, অনুমোদিত রং মেশানোও আইনে নিষেধ। কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি, আমাদের দেশে আইনের নিষেধ আর ক'জন শুনছে!

এই পরিস্থিতিতে বিষাক্ত রং মেশানো খাবার সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা কঠিন। খালি চোখে দেখে বোঝা দুষ্কর, কোন্ খাবারে অনুমোদিত রং মেশানো হয়েছে আর কোন্ খাবারে অননুমোদিত রং মেশানো হয়েছে। তাই যদি নিয়ম করে নেওয়া হয়, পারতে-সাধতে রং মেশানো খাবার ছোঁব না তাহলে মনে হয় বিপদ

অনেকটা এড়ানো যায়। বোঁদে জিলিপি মিহিদানা সাদা হলে ক্ষতি কী? লাল নীল সবুজ রঙেরই মিষ্টি খেতে হবে তার কী মানে আছে? অনেক মিষ্টির গায়ে পেস্তা বলে যে সবুজ রঙে রাঙানো চীনাবাদামের কুচি ছড়ানো থাকে সেগুলো ফেলে দিয়ে খেতে আপত্তি কিসের? যে মটরশুঁটি পটল ঝিঙে করলা বেশি সবুজ সেগুলো না-হয় না-ই কিনলাম! তাজা মাছ চিনতে শেখা তো কঠিন কিছু না, তবে কেন 'লাল রক্তে' ভুলতে যাব?

আসলে একটু সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, অনেক রং, অনেক ফুড অ্যাডিটিভ আর সমস্ত জেনোবায়োটিক কেমিক্যাল শরীরের পক্ষে সাধারণভাবে ক্ষতিকর।

সাত : লবণ খাবেন কতখানি

লবণের রাসায়নিক নাম সোডিয়ম ক্লোরাইড। মানুষের ইতিহাসে লবণের ব্যবহার খুব কম দিনের নয়। ঠিক কবে কোথায় কীভাবে মানুষের খাদ্যে লবণের ব্যবহার শুরু হয়, স্পষ্ট করে জানা যায় না। তবে মোটামুটি জানা গেছে, আজ থেকে অন্তত ৫,০০০ বছর আগে মানুষ তার খাদ্যে লবণ ব্যবহার করেছে। তখন লবণ মানুষের খাদ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল। সমাজে লবণের মর্যাদা ছিল অনেক উঁচুতে।

সংস্কৃতে ও তদ্ভব শব্দে লবণের ব্যুৎপত্তি এক নয়। এ থেকে মনে হয়, ইন্দো-ইয়োরেশীয়রা তাদের প্রথম দেশত্যাগের সময় লবণের ব্যবহার জানত না। যা-ই হোক, মানুষের প্রথম সভ্যতায় লবণ যে লভ্য ছিল তা মনে করার কারণ আছে। হোমার লবণকে 'divine' বলেছেন।

উচ্চবর্গের প্রাণী আর মানুষের ক্রমবিকাশে লবণের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। প্রাণের সূচনা সমুদ্রের লবণসমৃদ্ধ পরিবেশে। আদিম কোষের ভিতরকার তরলে পটাসিয়ম ছিল অনেক বেশি, সোডিয়ম অনেক কম। সমুদ্রের সোডিয়ম-সমৃদ্ধ পরিবেশ থেকে কোষের তরলকে পৃথক করে রেখেছিল কোষপ্রাচীর। ঝিল্লিময় কোষপ্রাচীরের একদিক থেকে আর-একদিকে আয়নের বিচলন প্রাণের একটা মৌলিক প্রক্রিয়া এবং কোষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির একটা অপরিহার্য অংশ, বিশেষ করে নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ নার্ভতন্ত্রের কোষের মধ্যে।

সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের প্রতিটি স্নায়ুকোষের মধ্যে নিউরো-ট্রান্সমিশন অর্থাৎ স্নায়বিক বার্তা প্রেরণের জন্য সোডিয়ম দরকার। মানবসভ্যতার পিছনে মানুষের মস্তিষ্কেরই ভূমিকা। আদিম মানুষের মধ্যে যে উদ্যমের অভাব ছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ মনে করা হয় তাদের খাদ্যে সোডিয়মের অভাব।

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের শরীরে সোডিয়ম দরকার। প্রতিদিন ঠিক কতখানি সোডিয়ম দরকার বলা শক্ত। তবে দেখা গেছে, মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যে যে পরিমাণ সোডিয়ম থাকে তাতেই তার দেহের প্রয়োজন মিটে যায় অর্থাৎ লবণ না খেয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, পলিনেশিয়া আর

আমাজন বেসিনে বিক্ষিপ্তভাবে এমন কিছু সমাজের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যেখানে মানুষ লবণের ব্যবহার জানত না। ঐসব সমাজের কতকগুলিতে আজও হয়তো লবণ প্রবেশ করে নি, কিন্তু অধিকাংশেই করেছে—তবে অল্প পরিমাণে এবং তারা লবণকে অতি মূল্যবান সামগ্রী মনে করে।

আদিম মানুষ লবণ খেত, এমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে এই সেদিন, সম্ভবত প্রথম কৃষিভিত্তিক সভ্য সমাজের সূচনা হবার পর। সে ১২,০০০ বছরও হয় নি। হোমো স্যাপিয়েন্সের যে ক্রমবিকাশ হয়েছে তার বৃহত্তর অংশই হয়েছে লবণহীন খাদ্যের উপর ভিত্তি করে। যতদূর জানা যায়, লবণের খনি প্রথম আবিষ্কৃত হয় অস্ট্রিয়ার টাইরোলে, ব্রোঞ্জযুগের শেষভাগে, খৃষ্টপূর্ব প্রায় ১০০০ অব্দ নাগাদ।

আজও পর্যন্ত এমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি যাতে বলা যেতে পারে, পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষ অথবা মধ্য প্রস্তরযুগের মানুষ লবণ তৈরি করেছে কিংবা লবণের খনি সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল। যতদূর মনে হয়, লবণের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে নব প্রস্তরযুগে, যখন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে খাদ্য পাওয়া গেছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য সংরক্ষণের তাগিদেই লবণের ব্যবহার শুরু।

অন্তত ৩,০০০ বছর ধরে লবণ মানুষের জীবনে একটা আশ্চর্য স্থান অধিকার করে আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গোটা পৃথিবীতে এত লবণের বাণিজ্য হয়েছে যা আর কোনো পণ্যে হয় নি।

প্রাচীনকালে যখন পণ্য বিনিময় করে বাণিজ্য হত তখন লোকে লবণের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনত। অর্থাৎ, আজ যেমন আমরা পয়সা দিয়ে জিনিস কিনি তেমনি তখন লোকে লবণ দিয়ে জিনিস কিনত। মানুষের বেতনও তখন দেওয়া হত লবণে। লবণের খনি অধিকার করার জন্য অথবা রক্ষা করার জন্য মানুষের ইতিহাসে কম যুদ্ধবিগ্রহ হয় নি। প্রাচীন গ্রীকদের কাছে একজন ভালো ক্রীতদাস ছিল **'worth his weight in salt'**. ইংরেজী **salary** কথাটা এসেছে লাতিন **sal** থেকে, লাতিনে **sal** অর্থ **salt.**

এমন যে লবণ, স্বাস্থ্যমহলে আজ তার অনেক দুর্নাম। ডাক্তাররা তাকে **persona non-grata** বলে ঘোষণা করেছেন। লবণ এখন তাঁদের কাছে **new villain.**

ডাক্তারদের এই মনোভাব মোটেই অসঙ্গত নয়, কারণ আজ পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ এই লবণের দরুন হাই ব্লাড প্রেশারের শিকার হচ্ছে। একবার এই অসুখের কবলে পড়লে আর তা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। হাই ব্লাড প্রেশারের অযুত কুফল। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক কিডনি ফেলিয়োর, স্ট্রোক আর হার্টের রোগ। এই অসুখগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে অনেকখানি ক্ষতি হয়ে যাবার পর এবং সে ক্ষতি প্রায়শই অপূরণীয় ক্ষতি।

আদিম মানুষ এবং তাদের পূর্বপুরুষ প্রাইমেটরা লবণ খেত না, তাদের খাদ্যে স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ সোডিয়ম থাকত তাতেই তাদের দেহের প্রয়োজন মিটে যেত। আজও পৃথিবীর যেসব জায়গায় মানুষ লবণ খায় না কিংবা খুব কম খায় তাদের মধ্যে হাই ব্লাড প্রেশার দেখা যায় না।

অল্প কিছুদিন আগে হার্ভার্ডের আর বি লী এবং আই ডি ভোর উত্তর-পশ্চিম বৎসোয়ানায় কুং বুশম্যান অর্থাৎ অরণ্যবাসীদের মধ্যে একটা সমীক্ষা করেছিলেন। এই অরণ্যবাসীরা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জগৎ তারা কখনও চোখে দেখে নি, সেই জগতের আলো কখনও তাদের উপর প্রতিফলিত হয় নি। আশি মাইল চওড়া এক জলহীন বলয় সভ্যজগৎ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

হার্ভার্ডের বিজ্ঞানীরা এই অরণ্যবাসীদের কাছে একটা শিবির স্থাপন করে একসঙ্গে এক বছরেরও অধিক কাল সেখানে বাস করেছেন। তাদের সাঙ্কেতিক ভাষা শিখেছেন, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন এবং তাদের জীবনযাত্রায় যতখানি সম্ভব কম বাধা সৃষ্টি করে খুব কাছে থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, এই অরণ্যবাসীরা সাধারণত মোটা হয় না, অসুখবিসুখ না হলে তাদের শরীরে অপুষ্টি দেখা দেয় না, তাদের মধ্যে হাই ব্লাড প্রেশার নেই, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের সিস্টোলিক আর ডায়াস্টোলিক দুরকম রক্তচাপই কমতে থাকে—সভ্যজগতের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার ; সভ্য প্রাচুর্যপূর্ণ জগতে পুরুষ ও নারী সকলেরই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড় সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। অরণ্যবাসীদের রক্তচাপ বৃদ্ধি না পাবার কারণ হয়তো এই যে, তাঁরা লবণ খায় না।

মানুষের সভ্যতা যত এগোচ্ছে, চিনি আর মাখনের সঙ্গে সঙ্গে লবণের ব্যবহারও তত বাড়ছে। সভ্যতার মাপকাঠিই যেন চিনি, মাখন আর লবণ।

এই তিনটি জিনিসের অত্যধিক ব্যবহারে মানুষের শরীরের অত্যধিক ক্ষতি হচ্ছে।

অত্যধিক লবণের দরুন হাই ব্লাড প্রেশার ছাড়াও কিছু অসুখ হতে পারে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইডিমা অর্থাৎ জলসঞ্চারহেতু দেহের ফোলা রোগ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যাকে বলা হয় শোথ। এতে দেহের টিস্যু ফুলে যায়।

অত্যধিক লবণ খাবার ফলে অনেক সময় প্রি-মেনস্ট্রুয়াল টেনশনের গুরুতর সব উপসর্গও দেখা দিতে পারে—শরীর ফুলে যাওয়া, মাথা ধরা, খিটখিটে ভাব, রাগ, ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরা ইত্যাদি। প্রধানত শরীরে বেশি পরিমাণে লবণ আর জল জমে যাওয়ার দরুনই মাসিক রক্তস্রাবের আগে এইসব উপসর্গ দেখা দেয় এবং মাসিকের দিন অনুমান করে তার দিন পাঁচেক আগে থেকে লবণ খাওয়া কমিয়ে দিলে এইসব উপসর্গের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

খেলোয়াড় আর যাঁরা অত্যধিক কায়িক পরিশ্রম করেন, গরমকালে তাঁদের দেহ থেকে ঘামের সঙ্গে যখন অনেক লবণ বেরিয়ে যায় তখন তাঁরা যদি সেই লবণের অভাব পূরণের জন্য হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে লবণ খান তাহলে তাতে প্রচণ্ড ক্ষতি হতে পারে, কখনও কখনও তার পরিণাম মারাত্মক হতে পারে। কারণ, অত্যধিক সোডিয়ম খাওয়ার দরুন শরীর থেকে অত্যধিক পরিমাণে পটাসিয়ম বেরিয়ে যায় বলে শরীরে পটাসিয়মের দারুণ অভাব ঘটে। তাতে শরীরের পেশীসঙ্কোচন ব্যাহত হয়, হৃৎপিণ্ডের পেশীসঙ্কোচনও বিঘ্নিত হয় এবং রক্ত গাঢ় হয়ে যায়।

ডাক্তাররা বলেন, "Salt tablets are unnecessary, never necessary and dangerous." তাঁরা বলেন, পরীক্ষায় দেখা গেছে, খেলোয়াড়রা লবণ খাওয়া কমিয়ে দিলেই বরং উপকার পাওয়া যায়; কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেহ লবণ ধরে রাখতে শিখে ফেলে, তখন ঘামের সঙ্গে বেশি লবণ বেরিয়ে যেতে পারে না।

আমাদের এই দেহযন্ত্রটা বড়ো অদ্ভুত। তার মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যাতে দেহের অভ্যন্তরীণ জলসরবরাহ আপনা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, আবার সোডিয়ম আর পটাসিয়মের মধ্যে যে সমতা থাকা অতি প্রয়োজন সেই সমতাও আপনা থেকেই থাকে। এখন, আমরা যদি বাইরে থেকে কোনোভাবে এই ব্যবস্থাটা নষ্ট করে দিই তাহলেই বিপদ ঘটে।

কি শিশু, কি যুবক, কি বৃদ্ধ—শরীরে সোডিয়মের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলেই

শরীর থেকে পটাসিয়ম বেরিয়ে যায়। অত্যধিক সোডিয়ম খাওয়ার দরুন শরীরের মধ্যে সোডিয়ম-পটাসিয়ম ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গিয়ে শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় পটাসিয়ম বেরিয়ে যায় আর তাতেই বিপদ ঘটে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য শরীরে পটাসিয়ম একান্ত দরকার। শরীরে স্বাভাবিক রক্তচাপ বজায় রাখতে পটাসিয়মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

আদিম মানুষ যা খেত তার মধ্যে যে পরিমাণ সোডিয়ম থাকত তাতেই তার প্রয়োজন মিটে যেত ; পটাসিয়ম অনেক সময় বেশি হয়ে যেত, কারণ ফলপাকড় আর শাকসবজিতে প্রচুর পটাসিয়ম আছে। এখন, শরীরে সোডিয়ম আর পটাসিয়মের মধ্যে সমতা রাখতে হলে যেটুকু সোডিয়ম পাওয়া গেছে তা ধরে রাখতে হবে আর বাড়তি পটাসিয়ম বার করে দিতে হবে। দেহের মধ্যে আপনা থেকে সেই ব্যবস্থাই হল—দেহের মধ্যেকার দুটি কিডনি আর সেই কিডনি দুটিকে চালায় যেসব রাসায়নিক তারা সোডিয়ম ধরে রাখতে আর বাড়তি পটাসিয়ম বার করে দিতে শিখল। তার পরে আর সমস্যা রইল না।

কিন্তু আজ আমরা যা খাই, মনুষ্যদেহ তার জন্য তৈরি হয় নি। আদিম মানুষের খাদ্য যা ছিল তার জন্য তার দেহযন্ত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আদিম মানুষের দেহযন্ত্রই আমাদের শরীরে বহাল আছে অথচ খাদ্যের ধারা পালটে গেছে। সুতরাং দেহযন্ত্রে যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে।

মানুষের দেহযন্ত্র যে খাদ্যের জন্য তৈরি, আজ আমরা ঠিক তার বিপরীত খাদ্য খাই। আজ আমরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সোডিয়ম খাই, পটাসিয়ম খাই অনেক কম। তার ফল দাঁড়ায়, বডি ফ্লুইড অর্থাৎ দেহের তরল পদার্থের মধ্যে বাড়তি সোডিয়ম সঞ্চিত হয়—এবং তা হয় দেহের অনেকখানি জল টেনে নিয়ে। ফলে ধমনীতে রক্তের পরিমাণ বেড়ে যায়, তাতে রক্তের চাপ আর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হার বাড়ে।

এখন, এই অতিরিক্ত সোডিয়ম শরীরে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা অনেকখানি নির্ভর করে হেরেডিটি বা বংশগতির উপর। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, গোটা পৃথিবীর শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ মতো মানুষের দেহে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটা জিনেটিক সাসেপটিবিলিটি থাকে অর্থাৎ অতিরিক্ত সোডিয়মের দরুন শরীরে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তারা তাদের জিনের মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়ার বীজ নিয়েই জন্মায়। পরে যখন অধিক লবণযুক্ত খাদ্য

খায় তখন হাই ব্লাড প্রেশারের কবলে পড়ে। কে সহজে অতিরিক্ত সোডিয়মের কুফলের কবলে পড়বে আর কে পড়বে না, আগে থেকে বলার উপায় নেই।

আসলে, লবণের প্রতি আমাদের যে রুচি, সে জন্মগত বা স্বভাবগত নয়, স্বোপার্জিত। অর্থাৎ, এই রুচি আমরা আমাদেরই ইচ্ছানুসারে তৈরি করি। সাধারণত শিশুবয়সেই লবণের প্রতি আমাদের রুচি তৈরি হয়ে যায়, কতখানি লবণে কীরকম স্বাদ তা আমরা শিশুবয়সেই ঠিক করে ফেলি। কারও জিভে কম লবণ ভালো লাগে, কারও জিভে বেশি লবণ ভালো লাগে—এবং ভালো লাগলেই ভালো লাগাই। শিশুবয়সে যদি কম লবণ খাওয়া অভ্যাস করা যায় তাহলে সেটাই তার সারা জীবন ভালো লাগবে।

আমাদের দেহের চাহিদা মেটাবার জন্য প্রতিদিন মাত্র ২২০ মিলিগ্র্যাম সোডিয়ম হলেই হয়ে যায় অর্থাৎ এক গ্র্যামের ১,০০০ ভাগের ২২০ ভাগ। এই পরিমাণ সোডিয়মের জন্য খাদ্যে লবণ মেশাবার দরকার করে না, আমরা সাধারণত যে খাদ্য খেয়ে থাকি তাতেই স্বাভাবিকভাবে এই পরিমাণ সোডিয়ম পাওয়া যায়। খাদ্যে আমরা যে লবণ মেশাই সে স্বাদের জন্য।

এই স্বাদের ব্যাপারটাও অনেক সময় চোখের স্বাদ। চোখের খিদে বলে যেমন একটা কথা আছে তেমনি চোখের স্বাদও হতে পারে। অনেকে রান্না খাবারও মুখে তোলার আগে আরও লবণ মাখেন। অস্ট্রেলিয়ায় একটা সমীক্ষা হয়েছিল, তাতে দেখা গেছে, দশজনের মধ্যে ছজনই খাবার জিভে না ঠেকিয়েই লবণ মেশায়। আমাদের দেশে এইরকম কোনো সমীক্ষা না হলেও আকছার এমন দেখা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক-একজন মানুষ রোজ ১০ থেকে ২৪ গ্র্যাম লবণ খায়, পৃথিবীর বহু দেশেই ৬ থেকে ১৮ গ্র্যাম খায়—যেখানে শরীরের ক্ষতি না করে খুব বেশি হলে পাঁচ গ্র্যাম খাওয়া যেতে পারে। চা-চামচের সমান সমান এক চামচ হলে প্রায় পাঁচ গ্র্যাম হয়। পাঁচ গ্র্যাম লবণ থেকে ২,০০০ মিলিগ্র্যাম সোডিয়ম পাওয়া যায়, আমাদের যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যাদের হাই ব্লাড প্রেশার হবার সম্ভাবনা আছে, তাদের দু গ্র্যামেরও কম খাওয়া উচিত।

আমাদের অজান্তেই আজ আমরা অনেক বেশি লবণ খেয়ে ফেলি। এখন রেফ্রিজারেশন হয়েছে, খাদ্যসংরক্ষণের নানা ব্যবস্থা হয়েছে—সুতরাং লবণ দিয়ে খাদ্যসংরক্ষণ প্রায় উঠেই গেছে। আজ আর কেউ বড়ো একটা নুনে জারিয়ে খাদ্য

রেখে দেয় না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে প্রসেস্‌ড্ ফুড নিয়ে। অধিকাংশ প্রসেস্‌ড্ ফুডেই লবণ থাকে।

পাশ্চাত্য জগতের অনেক দেশেই এখন প্রসেস্‌ড্ ফুডের চল। নিদারুণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমাদের মতো রান্নার অবসর বা সুযোগ তাদের খুবই কম, সুতরাং প্রসেস-করা প্রিজার্ভ-করা দোকান-থেকে-কেনা খাবার তাদের খেতেই হবে। তাদের তরিতরকারি মাছ মাংস মাখন চীজ সস কেচাপ সবেতেই প্রচুর পরিমাণে লবণ। পাশ্চাত্য দেশে অত্যধিক লবণের কবল থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন। সেখানে একজন সাধারণ মানুষের রোজ চা-চামচের চার থেকে পাঁচ চামচ লবণ খাওয়া হয়ে যায়। হিসাব করলে দেখা যাবে, বছরে গড়ে আট কিলোর উপর লবণ খাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

এ তো সাদা লবণের কথা বলা হল, এর সঙ্গে আছে সোডিয়মযুক্ত ফুড অ্যাডিটিভ, আসল খাবারের সঙ্গে যা মেশানো হয়। তার মধ্যে বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার ইত্যাদিও আছে। সুতরাং ব্রেড বিস্কিট পুডিং প্যানকেক প্রভৃতি খেলেই সোডিয়ম খাওয়া হয়—এবং না খেয়ে উপায় নেই।

আমাদের দেশে এখনও অনেক বাঁচোয়া, প্রসেস্‌ড্ ফুডের তেমন চল হয় নি। নিমকি সিঙ্গাড়া চানাচুর পাঁপর পাঁউরুটি বিস্কুট প্যানকেক জোর কদমে এগিয়ে চললেও এখনও বাড়িতে টাটকা মাছমাংস তরিতরকারি রান্না হয় এবং সাদা ভাত রাঁধতে লবণ বা বেকিং পাউডার লাগে না।

তবে একটা কথা খুব করে মনে রাখা দরকার, জন্মের পর অন্তত দুবছর শিশুদের লবণ খেতে দিতে নেই। লবণে শিশুদের কিডনির ক্ষতি হয় এবং পরে হাই ব্লাড প্রেশার হতে পারে।

পাশ্চাত্য জগতে জোর জনমত আর বিশেষজ্ঞদের প্রতিবাদের চাপে পড়ে অনেক বেবিফুড কোম্পানি কৌটোর দুধে লবণের পরিমাণ অনেকখানি কমাতে অথবা একেবারেই বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশে এমন জনমত আর বিশেষজ্ঞদের প্রতিবাদ এখনও সুদূরপরাহত।

কতকগুলি খাবার আমরা মুখে দিয়েই বুঝতে পারি, তার মধ্যে লবণ অর্থাৎ সোডিয়ম আছে; কিন্তু এমন অনেক খাবার আছে যা জিভে লবণাক্ত ঠেকে না অথচ তার মধ্যে প্রচুর সোডিয়ম আছে, যেমন—চাল গম ইত্যাদি দানাশস্য, পাঁউরুটি দুধ চীজ মাখন পুডিং প্যানকেক মাছ মাংস প্রভৃতি। জিভে লবণাক্ত

ঠেকে না এমন বেশকিছু খাবারে নোনতা খাবারের চেয়ে বেশি সোডিয়ম আছে। নিচের তালিকাটা দেখলেই বোঝা যাবে।

মিলিগ্রাম হিসাবে সোডিয়ম আছে—

একটা আপেলে	২
একটা ভুট্টায়	১
এক কাপ কর্নফ্লেকে	২৫৬
দশটা আঙুরে	১
একটা লেবুতে	১
একটা টোম্যাটোয়	১৪
এক কাপ টোম্যাটো সসে	১,৪৯৮
সাত চাকা শসায়	২
একটা আলুতে	৫
দশ টুকরো পোট্যাটো চিপে	২০০
এক স্লাইস পাঁউরুটিতে	১১৪
এক কাপ দুধে	১২২
আধ কাপ গুঁড়ো দুধে	৩২২
চা-চামচের বড়ো এক চামচ আনসল্টেড মাখনে	২
চা-চামচের বড়ো এক চামচ সল্টেড মাখনে	১১৬
চা-চামচের বড়ো এক চামচ মার্জারিনে	১৪০
আধখানা মুর্গির বুকে	৬৯

মনে রাখা দরকার, টাটকা খাবারের চেয়ে প্রসেস-করা খাবারে বেশি সোডিয়ম থাকে। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যাবে প্রসেস-করা খাবারে কত বেশি সোডিয়ম থাকে : সাড়ে তিন আউন্স টাটকা মটরশুঁটিতে যেখানে মাত্র ২ মিলিগ্রাম সোডিয়ম থাকে সেখানে টিনে ভর্তি ঐ পরিমাণ প্রসেস-করা মটরশুঁটিতে সোডিয়ম থাকে ২৩৬ মিলিগ্রাম।

অনেক কারণে প্রসেস-করা খাদ্যে লবণ দেওয়া হয় : (১) খাদ্যে নোনতা স্বাদ আনার জন্য ; (২) অন্য স্বাদ বাড়াবার জন্য, যেমন চিনির সঙ্গে একটু লবণ দিলে মিষ্টত্ব বেড়ে যায় ; (৩) অবাঞ্ছিত স্বাদ চাপা দেবার জন্য ; (৪) প্রসেসিংয়ের ফলে যে স্বাদ নষ্ট হয় তা পূরণ করার জন্য ; এবং (৫) খাদ্য নষ্ট হয় যেসব জীবাণুর কারণে সেইসব জীবাণু ধ্বংস করার জন্য।

পাশ্চাত্ত্যের যেসব দেশে প্রসেস-করা খাদ্যের চল বেশি সেইসব দেশের খাদ্যব্যবসায়ীরা কিছুতেই তাদের তৈরি খাদ্যে লবণের পরিমাণ কমাতে চাইছে না, লবণ বাদ দেওয়া তো দূরের কথা। তাদের বক্তব্য, খাদ্যে লবণ বাদ দিলে বা লবণের পরিমাণ কমালে তা 'কমার্শিয়াল সুইসাইড' হবে।

তবে জনগণের দাবির কাছে তারা যে কিছুটা নতি স্বীকার করতে আরম্ভ করে নি এমন কথা বলা যায় না। জনসাধারণ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠছে, লবণের বিরুদ্ধে কিছু লোক জেহাদ ঘোষণা করতে শুরু করেছে। আর, তার ফলে কোনো কোনো রুটি প্রস্তুতকারক আস্তে আস্তে রুটিতে সোডিয়মের পরিমাণ কমিয়ে আনছে।

আরও একটা সুলক্ষণ দেখা দিচ্ছে। স্বাস্থ্যসচেতন লোকেরা অনেকে এখন লবণ অর্থাৎ সোডিয়ম ক্লোরাইডের পরিবর্তে পটাসিয়ম ক্লোরাইড খেতে শুরু করেছেন। অনেক দোকানে পটাসিয়ম ক্লোরাইড রাখাই যাচ্ছে না, আনার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অ্যামেরিকার অনেক সুপার মার্কেটে 'নো সল্ট' নামে পটাসিয়ম ক্লোরাইড বিক্রি হয়। আমাদের দেশেও এখন অনেকে পটাসিয়ম ক্লোরাইড ব্যবহার করছেন, বিশেষ করে হাই ব্লাড প্রেশারের রোগীরা। আমাদের দেশে পটাসিয়ম ক্লোরাইড এখন অনেক দোকানেই পাওয়া যায়।

সবশেষে একটা কথা বলি, আমিষ খাদ্যের চেয়ে নিরামিষ খাদ্যে সোডিয়ম অপেক্ষাকৃত কম।

আট : চিনি খাবেন চিন্তা করে

চিনির ব্যবহার আজ সারা পৃথিবীতেই দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। গত ১০০ বছরে পৃথিবীর বহু অগ্রসর দেশে চিনির ব্যবহার অন্তত পাঁচগুণ বেড়েছে। ১৮৫৫ সালে বৃটেনে মাথাপিছু চিনির ব্যবহার ছিল দৈনিক ৩৫ গ্রাম, ১৯৫৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৮ গ্র্যামে। মাঝখানে অবশ্য তুই বিশ্বযুদ্ধের সময় রেশনিংয়ের দরুন পরিমাণটা কমেছিল। ১৯৫৮ সালের পর থেকে পরিমাণ আবার কমতে শুরু করে। ১৯৭০ সালে দেখা যায়, পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২০ গ্র্যামে।

মানুষের ইতিহাসে চিনি এসেছে অতি সাম্প্রতিক কালে। বাইবেলে চিনির উল্লেখ নেই। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মধুর উল্লেখই দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে পাশ্চাত্ত্য দেশেও মধুর ব্যবহার ছিল। মধুর শর্করাকে বলা হয় ফলশর্করা বা ফ্রুকটোজ।

চিনি প্রধানত আখ থেকেই তৈরি হয়। আখের আদিস্থান ভারতবর্ষ। একসময় প্রাচীন বাংলায় প্রচুর আখ উৎপন্ন হত। কিন্তু সেই আখের মান খুব একটা ভালো ছিল না। তবু সেই আখ থেকে গুড় তৈরি হত, চিনি তৈরি হত।

১৯৮৯ সালের ২ অকটোবর তারিখে কলকাতার 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার একটি খবরে দেখা যায়, "Palm sugar (jaggery) and honey were our sweeteners in the old days and they still flavour many delicate sweets. Cane grew in ancient Bengal but it was of a poor quality. Between 627 and 650 A.D. China sent a man to our country (probably to Chittagong) to learn the art of refining sugar into a block that could be crumbled for use into powder. The Chinese improved on what he learnt and, by the 18th century, the word 'chini' was in our vocabulary as crystallized sugar."

চিনি ঘোর বাংলা শব্দ বলে মনে হলেও আসলে মোটেই বাংলা শব্দ নয়—চীনা শব্দ। চীনা চি-নি থেকে বাংলায় চিনি। কিন্তু চিনিকে এখন অ-বাংলা শব্দ বলে কার সাধ্য!

আগেই বলেছি, আখের আদিস্থান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ থেকে আখ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গেছে। গত ৩০০ বছরে সারা পৃথিবীতে আখের চাষ বিস্তার লাভ করেছে।

বীট থেকে চিনি তৈরির পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে খুব বেশিদিন নয়। এই পদ্ধতি আবিষ্কারের পিছনে নেপোলিয়নের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাদের ভূমিকা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নারগ্রাফ নামে একজন জার্মান রসায়নবিদ বীটের মধ্যে চিনি আবিষ্কার করেন। তারপর নেপোলিয়নের যুদ্ধের সময় চিনির ব্যাপারে যাতে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হতে না হয় সেজন্য ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে বীটের চাষ শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানি আর ফ্রান্সে এবং অতি আধুনিক কালে বৃটেনে বীটচাষ ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপে চিনি ছিল একটা দুর্লভ বিলাস-সামগ্রী। তখনকার দিনের বিস্বাদ ওষুধে স্বাদুতা আনার জন্যই প্রধানত চিনির ব্যবহার ছিল। কখনও কখনও প্রার্থনীয় উপহারসামগ্রী হিসাবেও ছিল। ইংল্যাণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথকে এক ধনী সওদাগর কয়েক পাউণ্ড চিনি উপহার দিয়েছিলেন। আজ রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে এমন উপহার দেবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। একটি দরিদ্র শিশুর হাতে কেউ আজ একটা লজেন্সের পরিবর্তে এক কাঁচ্চা চিনি দেয় না।

কয়েক শ বছর আগেও পৃথিবীতে চিনির নামগন্ধ ছিল না। তিন শ বছর আগে 'ভার্জিন কুইন' যখন ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করতেন তখন চিনি একটা দামী ওষুধ হিসাবে গণ্য ছিল এবং চিনিকে লোকে সর্বরোগহর ওষুধ বলে মনে করত। চিনি তখন 'ইণ্ডিয়ান সল্ট' নামে পরিচিত ছিল। তখন ভারতবর্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে চিনি যেত। এবং চিনি তখন মহার্ঘ ছিল, দুর্লভ ছিল—সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে ছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে এক পাউণ্ড চিনির দাম ছিল এক থেকে দু শিলিং—একজন গৃহভৃত্যের এক সপ্তাহেরও বেশি মজুরি।

বাজার-চলতি যে সাদা চিনি আমরা খাই সেই চিনিকে বলা হয়, 'one of the purest chemicals produced in large quantities by modern industry.' পুষ্টির দিক থেকে এই চিনির বিশেষ মূল্য নেই। এতে ক্যালরি পাওয়া যায় সত্যি এবং এতে আমাদের খাদ্য ও পানীয় সুস্বাদু হয় তা-ও ঠিক, কিন্তু এই চিনি সম্পূর্ণই কার্বোহাইড্রেট। এতে প্রোটিন নেই, ফ্যাট নেই, খনিজ

পদার্থ নেই এবং ভিটামিনও নেই। বেশি চিনি খেলে অধিকতর প্রয়োজনীয় খাদ্যের ক্ষুধা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং বেশি চিনি খাওয়া মানে শরীরে পুষ্টির পথ বন্ধ করে দেওয়া।

চিনি দিয়ে তৈরি মিষ্টি একটা পরিতৃপ্তির ভাব আনে। তাই এই ধরনের মিষ্টি সব সময়েই খাবার শেষে খাওয়া উচিত। খাবার আগে খেলে মুখ মেরে দেয়, ক্ষুধা নষ্ট হয়, ফলে আসল খাবারটা মার খায়।

প্রসঙ্গত, অ্যালকোহলের কথা বলা যেতে পারে। পুষ্টির দিক দিয়ে চিনির সঙ্গে অ্যালকোহলের তুলনা চলতে পারে। অ্যালকোহলও ক্যালরির একটা ভালো উৎস। এক গ্র্যাম অ্যালকোহলে সাত ক্যালরি শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেবল এই গুণটুকু ছাড়া তার আর সবই অপগুণ—চিনিরই মতো। অর্থাৎ, চিনির মতো অ্যালকোহলও শরীরে ক্যালরি ছাড়া আর-কিছু দিতে পারে না। দীর্ঘকাল ধরে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান করলে তাই ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয় এবং যেসব খাদ্যে শরীরের অত্যাবশ্যক পুষ্টি পাওয়া যায় সেইসব খাদ্যের ক্ষুধা নষ্ট হয়। অত্যধিক মদ্যপানে অভ্যস্ত লোকদের অনেক সময় ভিটামিনের অভাবজনিত রোগব্যাধিও হয়। অ্যালকোহলিক পলিনিউরোপ্যাথি আসলে অ্যালকোহলের অধিবিষের জন্য হয় না, হয় থায়ামিনের অভাবের ফলে।

খুব বেশি সুক্রোজ বা ইক্ষুশর্করা খেলে পাকস্থলী ও অন্ত্র থেকে তার অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় রক্তস্রোতে গিয়ে মেশে এবং শরীরের কাজে লাগতে না পেরে কিডনি দিয়ে বার হয়ে যায়। সুক্রোজ বেশি খেলে পাকস্থলীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং বমির উদ্রেক হয়। তাছাড়া পাকস্থলীর ভিতর তা গেঁজে উঠে অ্যাসিড উৎপন্ন করে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাতে পাকস্থলীতে আলসার সৃষ্টির কিংবা আলসার থাকলে তার প্রকোপ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

অত্যধিক চিনি অর্থাৎ সুক্রোজ খেলে ডায়াবিটিজ বা মধুমেহ রোগ হয় এমন কথা বলা যায় না। ডেভিডসন ও পাসমোর বলেছেন, "It is unlikely that sucrose has a specific diabetogenic effect, though the very high intake in some Indian communities in South Africa may contribute to the high prevalence of diabetes among them."

ডায়াবিটিজ সম্বন্ধে ডেভিডসন ও পাসমোরের আর-একটি কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য, "In many African countries the fibre content of the diet

is high and prevalence of diabetes low. In prosperous communities this relationship tends to be reversed."

অর্থাৎ, খাদ্যে যদি আঁশ মানে ছিবড়ে জাতীয় পদার্থ বেশি থাকে তাহলে ডায়াবিটিজ হবার সম্ভাবনা কমে। ডায়াবিটিজের জন্য চিনিকে দায়ী করা বোধ হয় ঠিক নয়।

তবে শিশুদের ক্ষেত্রে চিনি বিশেষ করে খারাপ। কারণ, তাদের কেবল শরীরের পোষণই নয়, বৃদ্ধিও দরকার। অত্যধিক রিফাইন-করা খাদ্যের চেয়ে স্বাভাবিক খাদ্যই তাদের পক্ষে ভালো। চিনির চেয়ে গুড় কিংবা মধুই তাদের পক্ষে উপকারী। চিনি তাদের বৃদ্ধির পথে অন্তরায়, নানা রোগব্যাধির আকর—বিশেষ করে দাঁতের রোগ, গলার রোগ আর পেটের রোগের। অত্যধিক চিনি দিয়ে তৈরি জ্যাম জেলি প্রভৃতি সম্পর্কেও এই একই কথা।

অত্যধিক মিষ্টি খাবার ফলে দাঁত নষ্ট হয়। টফি-চকোলেট আজ দাঁতের পক্ষে একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যে শর্করা লেগে থাকে তা গেঁজে গিয়ে অ্যাসিডে পরিণত হয়, সেই অ্যাসিডে দাঁতের ক্ষয় হয়। শুকনো ফলে শর্করার পরিমাণ বেশি, টফি-চকোলেট ইত্যাদির চিনি যতটা-না দাঁতে লেগে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি লেগে থাকে শুকনো ফলের শর্করা। সুতরাং যে মিষ্টিই হোক না কেন, খাবার পর ভালো করে দাঁত পরিষ্কার করা দরকার।

আমাদের দেশে এখনও একটা ভালো অভ্যাস আছে—বহুলোকে কিছু খাওয়ার পরেই অমনি মুখ ধুয়ে ফেলেন। কিন্তু অভ্যাসটা কমে যেতে বসেছে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে খুচখাচ নানারকম জিনিস খাওয়ার দরুনই প্রধানত এই অভ্যাস কমছে।

তবু সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজেন না এমন লোক বোধ হয় একজনও মিলবে না। কাদামাটি, ঘুঁটের ছাই, কাঠকয়লার গুঁড়ো, তামাকের গুণ্ডি, গুড়াকু, তেল-নুন, হরতকী-ফটকিরি-খয়ের বা এই ধরনের কিছু জিনিস গুঁড়ো করে মিলিয়ে মিশিয়ে বাড়িতে তৈরি মাজন কিংবা দোকান থেকে কেনা মাজন অথবা টুথপাউডার কিংবা টুথপেস্ট দিয়ে আঙুলে ঘষে দাঁত মাজেন এমন লোকের সংখ্যাই বেশি। দাঁতন ব্যবহার করেন এমন লোকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ব্রাশের ব্যবহারও ক্রমশ বাড়ছে।

আঙুল দাঁতন ব্রাশ এর মধ্যে ব্রাশই সবচেয়ে ভালো। আঙুল দিয়ে

মাজলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লেগে থাকা ময়লা বা খাদ্যের অংশ বার হতে পারে না, কেবল দাঁতের উপরটাই পরিষ্কার হয়। দাঁতন চিবোনোর ফলে দাঁতের ব্যায়াম হয় এবং তাতে মাড়িতে রক্তচলাচল বাড়ে একথা সত্যি, কিন্তু দাঁতনের আঁশ অত্যধিক নরম বলে দাঁতের ফাঁকের ময়লা বা খাদ্যের কুচি সব সময় বার করে আনতে পারে না। কাজেই ব্রাশ ব্যবহার করা উচিত। তাই বলে হার্ড ব্রাশ নয়, সফ্‌ট্‌ কিংবা মিডিয়ম ব্রাশ। হার্ড ব্রাশে মাড়ি ছড়ে যেতে পারে।

ব্রাশের ব্যাপারে একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে, ব্যবহার করতে করতে কিছুদিন পরে ব্রাশের আঁশগুলো বেঁকে যায়। তখন আর সেই ব্রাশ ব্যবহার করা উচিত নয়। যতদিন আঁশগুলো সোজা খাড়া থাকবে ততদিনই ঐ ব্রাশ ব্যবহার করবেন, যে-ই আঁশগুলো বেঁকে যাবে অমনি ঐ ব্রাশটা ফেলে দিয়ে নতুন ব্রাশ ধরবেন। কিন্তু বহু লোককে দেখা যায়, ব্রাশের সবগুলো আঁশ বেঁকে সমান হয়ে গেছে, তবু তাঁরা ঐ ব্রাশ দিয়েই দাঁত মেজে চলেছেন। এতে দাঁত যেমন ভালো পরিষ্কার হতে পারে না তেমনি মাড়িরও ক্ষতি হতে পারে।

ব্রাশে সহজেই জীবাণু এসে বাসা বাঁধে এবং জীবাণুপূর্ণ ব্রাশ মুখে দিলে মুখের মধ্যে নানারকম রোগ হতে পারে। কাজেই ব্যবহারের পর ব্রাশ কোনো জীবাণুনাশক সল্যুশনে ডুবিয়ে রেখে জীবাণুমুক্ত করা দরকার। নুনজলেও ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে।

যাঁরা ব্রাশ ব্যবহার করেন তাঁদের অনেককেই দেখা যায়, নামী দামী টুথপেস্ট খোঁজেন। তার কোনো দরকার নেই। দাঁত মাজার ব্যাপারে টুথপেস্টটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা টুথব্রাশ আর কীভাবে দাঁত ব্রাশ করেন সেই ব্যাপারটা। বেশির ভাগ লোককেই দেখা যায়, অনেকক্ষণ ধরে ঘষঘষ করে এলোপাথাড়ি দাঁতে ব্রাশ ঘষেন। সিনেমা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে অনেক সময় ব্রাশ অনেকটা গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাঁত মাজতে দেখা যায়। এর কোনোটাই ঠিক নয়। দাঁত মাজার ব্যাপারে সঠিক নিয়ম হল, ব্রাশটা আলতো করে ধরে নিচের পাটি হলে মাড়ি থেকে সোজা উপরদিকে আঁচড়ানোর মতো করে টানবেন—প্রথমে বাইরের দিকে, তারপর ভিতরের দিকে ; উপরের পাটি হলে মাড়ি থেকে সোজা নিচের দিকে ঐ আঁচড়ানোর মতো করে টানবেন—প্রথমে বাইরের দিকে, তারপর ভিতরের দিকে। উপরের পাটি, নিচের পাটি এবং ভিতর-বার সব মিলিয়ে গোটা দশ-বার টান দিলেই যথেষ্ট। বেশিক্ষণ ধরে দাঁত মাজলে দাঁতের ও মাড়ির ক্ষতি হয়।

দাঁত মাজার ব্যাপারে আবার বলি, টুথপেস্টটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা দাঁত ব্রাশ করার কায়দাটা। যে কোনো টুথপেস্টই ব্যবহার করতে পারেন। টুথপাউডার, এমন কি মাজনও ব্যবহার করতে পারেন—কিন্তু তামাক-ঘটিত কিছু ব্যবহার করবেন না। ব্রাশে পেস্ট, পাউডার বা মাজন লাগিয়ে এলো-পাথাড়ি দাঁতে ঘষবেন না, ঘুরিয়ে ঘুরিয়েও মাজবেন না। উপর-নিচ করে টানবেন, যেমন আগে বলেছি।

আর-একটা কথা, সকালে দাঁত মাজার চেয়ে রাত্রে শোবার আগে দাঁত মাজাই বেশি জরুরী। রাত্রে মুখ বিশ্রামে থাকে, তখনই মুখের মধ্যে জীবাণুগুলো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাবারের কণা পচে গলে গেঁজে মুখের ও দাঁতের ক্ষতি করে। স্বতরাং প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে দাঁত ব্রাশ করা দরকার। সকালে ঘুম থেকে উঠেও দাঁত মাজা উচিত, তাতে রাত্রে মুখের মধ্যে যেসব জীবাণু বাসা বেঁধেছে তারা দূর হয়ে যাবে এবং মুখের মধ্যে যে অ্যাসিড ইত্যাদি তৈরি হয়েছে তা-ও চলে যাবে।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দাঁতের আর মাড়ির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ রোগ নিবারণ করা যায় ঠিকমতো দাঁত মাজলে। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যেসব খাদ্যকণা জমে থাকে তার দরুনই বেশি রোগ হয়।

দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্যকণা বার করার জন্য অনেকে আলপিন, সেফটিপিন, দেশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি হাতের কাছে যা পান তা-ই দিয়ে দাঁত খোঁচান। এই অভ্যাসের ফল কখনও কখনও মারাত্মক হতে পারে। টেট্যান্যাস অর্থাৎ ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। স্বতরাং হাতের কাছে যা পেলেন তা-ই দিয়ে দাঁত খোঁচাবেন না। এমন কি, টুথপিক বা খড়কেও ব্যবহার করবেন না। বিশেষ কায়দায় তৈরি টুথপিক বিশেষ কায়দায় ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ বিশেষ টুথপিক সব জায়গায় পাওয়া যায় না, তাছাড়া ঐ বিশেষ কায়দাটাও অনেকে জানেন না। স্বতরাং টুথপিকও ব্যবহার করা উচিত নয়।

দাঁতের ফাঁকের খাদ্যকণা বার করার জন্য ডেণ্টাল ফ্লস যদি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। ডেণ্টাল ফ্লস বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি একরকম স্বতো। বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে দাঁতের সরঞ্জাম বিক্রি হয় যেসব দোকানে।

ডেণ্টাল ফ্লস যদি না পান তাহলে একটু মোটা স্বতোও ব্যবহার করতে পারেন। দু আঙুলের মাথায় খানিকটা ফ্লস বা মোটা স্বতো জড়িয়ে টান টান

করে ধরে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আস্তে করে টানবেন। প্রথমে দাঁত ব্রাশ করে তারপর ফ্লস ব্যবহার করবেন। ফ্লস ব্যবহার করার পর ভালো করে কয়েকবার কুলকুচি করবেন।

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, দাঁতে কেয়ারিজ অর্থাৎ ক্ষয় সৃষ্টি হয় প্রধানত রিফাইন-করা কার্বোহাইড্রেট, বিশেষ করে সুক্রোজের দরুন। আমাদের মুখের মধ্যে অসংখ্য ব্যাকটিরিয়া আছে, সেই ব্যাকটিরিয়া কার্বোহাইড্রেটকে গাঁজিয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করে, সেই অ্যাসিডে দাঁত ক্ষয়ে যায়। দাঁতে কেয়ারিজের প্রধান কারণ চিনি। বৃটেনে দাঁত আছে এমন লোকদের শতকরা ৯৫ ভাগেরও বেশি এই কেয়ারিজে আক্রান্ত হয়। বৃটেনে প্রায় ২০ হাজার ডেন্টিস্ট প্রতি বছর তিন কোটির উপর দাঁত 'ফিল' অর্থাৎ ভরাট করেন এবং ৫০ লক্ষের উপর দাঁত তুলে ফেলেন। তার জন্য খরচ পড়ে ৪০ কোটি পাউণ্ডের উপর। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে চিনির ব্যবহার যত বাড়ছে, দাঁতের ক্ষয়ও তত বেশি দেখা যাচ্ছে।

জলে মেশানো চিনিতে বিশেষ ক্ষতি হয় না। চা কফি শরবৎ ঘোল প্রভৃতি পানীয় অনেকখানিই নির্দোষ; আমরা যে চাটনি মোরব্বা ইত্যাদি খাই তাতেও তেমন দোষ নেই। কারণ, খাবার পর মুখ ধুয়ে ফেললেই চিনি চলে যায়। কিন্তু যখন-তখন চকোলেট টফি আইসক্রীম কেক বিস্কুট সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি খেয়ে মুখ না ধুলে দাঁতের সর্বনাশ।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ঘন ঘন খুব বেশি ট'কো জিনিস খেলে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যেতে পারে।

পরিমাণ মতো চিনি খেলে অবশ্য ক্ষতি নেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কেউই পরিমাণ মতো খায় না। যারা খায় তারা বেশিই খায় এবং খাওয়াটা বাড়িয়েই যায়। তাতে আসল খাদ্যের ক্ষুধা নষ্ট হয় এবং শরীরের উপর তার কোপ এসে পড়ে।

ডঃ র‍্যাসমাস অ্যালস্থাকার নামে একজন প্রাচীন বৃটিশ বিজ্ঞানী সাদা চিনির ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই চিনি তিনি তুলে দিতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "The poorest food offered to the public is highly refined white sugar. Yes, it is very nourishing. It digests easily and within the body it creates a plentiful amount of heat and energy. If we go no further, we have to admit that white

sugar is a most excellent food because it does nourish. But a food should do more than nourish, and that is where white sugar falls down completely. All good foods should do two things : they should nourish the body and they should help to maintain and build health. White sugar does the first, but it has nothing to do with maintaining and building health. White sugar is as completely dead as any food can be. It is devitalized. It is merely carbon, as pure as it can be obtained in that form, mixed with a little water. It contains no natural mineral salts and it has no vitamins and not one of the elements that we think of in health building. Furthermore, white sugar and all products containing it tend to pervert the taste so that the individual will not eat enough of the foods containing the mineral salts, the cleansing juices and the vitamins. One very bad habit is to add white sugar to almost every dish containing starch and to almost every drink. This should be discontinued. The bowl containing white sugar should be left off the table It is a very poor food and the less we use of it, the better off we are. The problem is to get vital foods into the body so as to counteract hyperacidity and the growing tendency for the body to become more and more acid with advancing years. Sugar helps to make the acidity worse and hence should be banned."

কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোনো দেশেই না। ডঃ অ্যালস্তাকারের নিজের দেশ বৃটেনেও না। বৃটেনে চিনি নিষিদ্ধ করা দূরের কথা, চিনির ব্যবহার কমানোও আর সম্ভব নয়। ১৯৮৭ সালের ১৩ মার্চ বৃটেনের 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় দেখা যায়, বৃটিশ সরকার চিনি ব্যবসায়ীদের চাপে চিনির ব্যবহার কমানো সম্বন্ধে একটা হুঁশিয়ারি পর্যন্ত জারি করতে পারেন নি। 'দি গার্ডিয়ান' লিখেছিল—

A government warning to cut sugar consumption by half

has been dropped from the Health Education Council's new healthy eating guide after complaints from the Ministry of Agriculture.

The last-minute decision by Mrs. Edwina Currie, junior minister in charge of health education, is being seen by senior HEC sources as a victory for the sugar lobby and a severe setback to efforts to tackle obesity. The new guide is to be published next month to tie in with Mrs. Currie's £1.5 million campaign against heart disease : coronary heart disease killed 32,000 people in Britain last year, and obesity is recognized as a mazor factor.

According to the HEC's current Guide to Healthy E ating, the average person buys almost 1 lb of packet sugar a week and eats twice as much in processed foods. The warning cut from the new edition is its central recommendation.

পাশ্চাত্য দেশে এখন সাদা চিনির পাশাপাশি লাল চিনি দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও কিছুকাল আগে লাল চিনি পাওয়া যেত, তাকে বলত দেশী চিনি। দেশী চিনি এখন আর দেখা যায় না।

লাল চিনি দেখতে কিন্তু লাল নয়, ঈষৎ কটা। ইংরেজীতে বলে 'ব্রাউন শুগার'। ব্রাউন শুগার খুব বেশি রিফাইন করা শুক্রোজ নয়, এতে অতি সামান্য পরিমাণে অন্যান্য শর্করা আর খনিজ দ্রব্যও থাকে—আর কিছু রঞ্জক পদার্থ। পাশ্চাত্য দেশে এই চিনির চাহিদা বাড়তে থাকায় নকল-কারবারীদের সুবিধা হয়েছে, তারা সাদা চিনিতে রাসায়নিক বাদামী রং মিশিয়ে 'ব্রাউন শুগার' তৈরি করছে। বাজারে আসল ব্রাউন শুগারের সঙ্গে অনেক সময় নকল ব্রাউন শুগারও চলছে।

চিনির বিকল্প যে খোঁজা হচ্ছে না তা নয়। একটি রিপোর্টে দেখা যায়—

Researchers at The Hebrew University in Jerusalem have identified a natural sweetener that actually prevents the formation of dental cavities. The substance is glycyrrhizin, a natural sweetener 50 times sweeter than sucrose. Although it

is derived from the licorice plant, it does not have the taste of licorice. The reseachers say it could lead to more effective toothpaste and to a new sugar substitute.

[F.O. Licht's International Sugar Report, No. 9, March 1987.]

পরিশেষে, হঠাৎ কিছু অতিরিক্ত শক্তিলাভের জন্য গ্লুকোজের কথা বলা দরকার। সাধারণত গ্লুকোজ থেকেই আমাদের দেহ তাড়াতাড়ি তার প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করে বলে অনেকের ধারণা—গ্লুকোজ 'মহান শক্তিদাতা', পেশীর কাজকর্মের উপর তার একটা উত্তেজক প্রভাব আছে। তাই যাঁরা খেলাধুলা করেন তাঁরা খেলার আগে বা মাঝে প্রায়শই গ্লুকোজ খান। বাজারে নানা নামে গ্লুকোজ কিনতে পাওয়া যায় এবং 'অমূল্য শক্তিবর্ধক' হিসাবে তার বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হয়। কিন্তু হঠাৎ কিছু ক্যালরি আর শক্তি লাভের জন্য বেশি দাম দিয়ে বাজার-চলতি ঐসব গ্লুকোজ খাবার দরকার করে না, খানিকটা চিনি খেলেই সমান ফল পাওয়া যায়। কারণ, সুক্রোজ দেহের ভিতর খুব তাড়াতাড়ি গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়।

নয় : ডিমে ভয় পাবেন না

ডিম সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অহেতুক ভয় আছে। ডাক্তাররাই সাধারণত এই ভয় বাড়িয়েছেন। অনেক ডাক্তার বলেন, বেশি ডিম খেলে গাঁটে বাত হয়, হার্টের অসুখ হয়—এমনি আরও কত কী। তাঁরা অস্থিরোগবিশেষজ্ঞ, হৃদরোগবিশেষজ্ঞ অথবা অন্য কোনো রোগবিদ্যাবিশারদ কিংবা জেনারেল প্র্যাকটিশনার।

কিছুদিন আগে দূরদর্শনে বাত নিয়ে এক প্রোগ্র্যামে কলকাতার একটি নাম-করা মেডিক্যাল কলেজের একজন নাম-করা অধ্যাপিকা বলেছিলেন, বেশি ডিম খাবেন না, তাতে বাত হতে পারে। কলকাতার আর-একটি নাম-করা মেডিক্যাল কলেজের আর-একজন নাম-করা অধ্যাপক বাত সম্পর্কে একটি বইতে লিখেছেন, বাতের একটা বড়ো কারণ ডিম, বেশি ডিম খেলে বাত হবার আশঙ্কা থাকে।

কিন্তু বেশি ডিম খেলে গাঁটে গাঁটে বাত হয়, এই ধারণা ঠিক নয়। পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয় নি। ডঃ এফ পি অ্যান্টিয়া তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'ক্লিনিক্যাল ডায়েটেটিক্স অ্যাণ্ড নিউট্রিশন' গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেছেন, কম ডিম খেলেই বরং বাত হবার আশঙ্কা থাকে ; ডিমে এমন কিছু পদার্থ আছে যা বাতজনিত রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

ডঃ অ্যান্টিয়া লিখেছেন, **"A low consumption of eggs is related to a high incidence of rheumatic disease. Egg consumption, particularly egg yolk, diminishes susceptibility to rheumatic fever."**

১৯৬০ সালে সুপ্রসিদ্ধ 'ল্যানসেট' পত্রিকায় এ এফ কোবার্নের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল—**'The concept of egg-yolk as a dietary inhibitor to rheumatic susceptibility'**, এবং তাতেও এই ধরনের কথা বলা হয়েছে।

ডিম সম্বন্ধে ডাক্তারদের একটা বড়ো ভয়, ডিমের কুসুমে প্রচুর কোলেস্টেরল থাকে, তাতে হার্টের অসুখ হতে পারে। অল্প কিছুদিন আগে দূরদর্শনেই

করোনারি-হার্ট ডিজিজ নিয়ে এক অনুষ্ঠানে কলকাতার একটি বিখ্যাত হাসপাতালের একজন বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট বললেন, একটু বয়স হয়ে গেলে সপ্তাহে তিনটির বেশি ডিম খাওয়া উচিত নয়, কারণ ডিমে প্রচুর কোলেস্টেরল আছে।

তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হল, একটা ডিমে কতটা কোলেস্টেরল আছে, তিনি জবাব দিলেন, "২৫০ মিলিগ্র্যাম। এত বেশি কোলেস্টেরল থাকার জন্য অ্যামেরিকানরা সপ্তাহে দুটির বেশি ডিম খেতে নিষেধ করেন, আমি তো তবু তিনটি বললাম।"

স্পষ্ট বোঝা গেল, ভদ্রলোক অ্যামেরিকার আস্ত চার্টটাই ভারতে এনে বসাতে চান। ভারতের অবস্থা কেমন, বিচার করে দেখার চিন্তা তাঁর নেই।

ডেভিডসন অ্যাণ্ড পাসমোরের 'হিউম্যান নিউট্রিশন অ্যাণ্ড ডায়েটেটিক্স' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ এবং প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃত। ডেভিডসন এবং পাসমোর অ্যামেরিকান নন, বৃটিশ। তাঁরা লিখেছেন, একটা ডিমে ২ ০ মিলিগ্র্যাম মতো কোলেস্টেরল থাকে এবং খুব বেশি ডিম খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়তে পারে: "An egg contains about 250 mg of cholesterol and when eaten in large numbers may raise plasma cholesterol."

এখানে দুটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো—large numbers এবং may raise. রোজ একটি কি দুটি কখনও লার্জ নাম্বার হতে পারে না। আর, বেশি ডিম খেলে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ে, এমন কথাও জোর দিয়ে বলা হয় নি, বলা হয়েছে বাড়তে পারে।

আরও বিচার্য বিষয় আছে। এই হিসাব বিলেতী ডিমের। একটা বৃটিশ কি অ্যামেরিকান ডিমের ওজন সাধারণত ৬০ গ্র্যাম। তাতে ৬ গ্র্যাম ফ্যাট আর প্রায় ২৫০ মিলিগ্র্যাম কোলেস্টেরল থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের ডিমের ওজন অনেক কম। আমাদের দেশে একটা মুর্গির ডিমের ওজন সাধারণত ৩০ থেকে ৩৭ গ্র্যাম। তাতে ফ্যাট থাকে ৩ গ্র্যাম আর কোলেস্টেরল খুব বেশি হলে ১০০ মিলিগ্র্যাম।

সুতরাং অ্যামেরিকার হিসাব আমাদের দেশে চলে না। চলে না আরও একটা কারণে—শুধু অ্যামেরিকা নয়, পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশের খাদ্যেই আজ এমনিতে ফ্যাট ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি, তার উপর আরও বাড়ালে

বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষেরই খাদ্য সাদামাটা, তাতে ফ্যাট ও কোলেস্টেরল বেশি থাকে না। দুধ ঘি মাখন চীজ পনির মাছ মাংস ডিম আর ক'জনের কপালে জোটে!

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অভ মেডিক্যাল রিসার্চের এক্সপার্ট গ্রুপের যেখানে সুপারিশ হল, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৩০ থেকে ৩৫ গ্রাম 'ফ্যাট আর অয়েল' খাওয়া দরকার সেখানে ভারতের গ্রামাঞ্চলে অনেকের কপালে ১০ গ্রামও জোটে না। একটা রিপোর্টে দেখা যায়: "The average consumption of fats and oils in rural areas is ten grams a day per adult, as against 30 to 35 grams recommended by the expert group of the Indian Council of Medical Research (ICMR)".

১৯৮৮ সালের ৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সরোজ খাপার্ডে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে শহরাঞ্চলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক ফ্যাট আর তেল খাওয়ার যে হিসাব দেন তা হল—বস্তিবাসী ১৩ গ্রাম, শিল্প-শ্রমিক ২৩ গ্রাম, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ২২ গ্রাম, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ৩৫ গ্রাম আর উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ৪৬ গ্রাম।

সম্প্রতি হৃদরোগের সঙ্গে ব্লাড কোলেস্টেরলকে জড়িয়ে এত বেশি প্রচার হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের মনে কোলেস্টেরল সম্বন্ধে একটা ভয় ধরে গেছে। অনেকের মনে ধারণা জন্মেছে, কোলেস্টেরল একটা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, হৃদরোগ এড়াতে হলে কোলেস্টেরল এড়িয়ে চলতে হবে। ধারণাটা অমূলক এবং অহেতুক। কোলেস্টেরল এড়ানো যায় না। মানুষ কোলেস্টেরল ছাড়া বাঁচতে পারে না। কারণ, স্টেরয়েড হরমোন আর পিত্তলবণ তৈরির একটা অতিপ্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এই কোলেস্টেরল।

আমাদের শরীরের মধ্যে যেমন কোলেস্টেরল তৈরি হয় (যকৃৎ আর অন্ত্র, বিশেষ করে নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র অ্যাসিটেট থেকে কোলেস্টেরল তৈরি করে) তেমনি খাদ্য থেকেও কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। ডিমের কুসুম, ঘিলু, কিডনি, লিভার, হার্ট, চর্বি, গোরু শুওর ভেড়া পাঁঠা খাসি মুর্গি প্রভৃতির মাংস, গলদা চিংড়ি, বাগদা বা শলা চিংড়ি, কাঁকড়া, চীজ, মাখন, মার্জারিন, দুধ, আইসক্রীম ইত্যাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে কোলেস্টেরল থাকে। মাথার ঘিলু আর ডিমের কুসুমে থাকে সবচেয়ে বেশি।

এইসব খাদ্যের প্রতি ১০০ গ্রামে মিলিগ্র্যাম হিসাবে কোলেস্টরল থাকে—

ডিমের কুসুম, শুকনো	২,৯৫০
ডিমের কুসুম, টাটকা	১,৫০০
ডিমের কুসুম, ঠাণ্ডায় জমানো	১,২৮০
ডিমের সাদা অংশ	০
ডিম, গোটা	৫৫০
ঘিলু, কাঁচা	২,০০০
কিডনি, কাঁচা	৩৭৫
লিভার, কাঁচা	৩০০
হার্ট, কাঁচা	১৫০
চর্বি	৯৫
গোরুর মাংস, কাঁচা	৭০
শুওরের মাংস	৭০
ভেড়ার মাংস, কাঁচা	৭০
পাঁঠা বা খাসির মাংস	৬৫
মুর্গির মাংস, কাঁচা	৬০
গলদা চিংড়ি	২০০
বাগদা বা শলা চিংড়ি	১২৫
কাঁকড়া	১২৫
চীজ, ক্রীম	১২০
চীজ, চেডার	১০০
চীজ, ২৫-৩০% ফ্যাট	৮৫
চীজ, স্প্রেড	৬৫
কটেজ চীজ, ক্রীম	১৫
মাখন	২৫০
মার্জারিন (½ জান্তব ও ½ উদ্ভিজ্জ ফ্যাট)	৬৫
দুধ, গুঁড়ো (হোল ক্রীম)	৮৫
দুধ, তরল (হোল ক্রীম)	১১
দুধ, তরল (ননী-তোলা)	৩
আইসক্রীম	৪৫

আগেই বলেছি, স্টেরয়েড হরমোন এবং পিত্তলবণ তৈরির জন্য কোলেস্টেরল দরকার। প্রোজেস্টেরোন (এবং সম্ভবত ইস্ট্রোজেনও) আর অ্যাড্রিন্যাল কর্টিকয়েড পাওয়া যায় কোলেস্টেরল থেকেই। আরও অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস কোলেস্টরল থেকে পাওয়া যায়। শরীরে ফ্যাটি অ্যাসিড পরিবহণে রক্তের কোলেস্টেরলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সুতরাং কোলেস্টেরল আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। কোলেস্টেরল আমাদের শরীরে কেবল যে খাদ্যের সঙ্গে বাইরে থেকে আসে তা-ই নয়, শরীরের ভিতরেও কিছু তৈরি হয়। সাধারণভাবে রক্তের কোলেস্টরলের সঙ্গে খাদ্যের কোলেস্টেরলের সম্পর্ক এখনও চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হয় নি। অর্থাৎ, খাদ্যে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কিছু বেশি হয়ে গেলেই যে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়বে, এমন কথা বলা যায় না। কারণ, শরীর যদি খাদ্য থেকে বেশি কোলেস্টেরল পায় তাহলে শরীরের মধ্যে কোলেস্টেরল তৈরি কমে যায়। তবে খাদ্যে কোলেস্টেরলের পরিমাণ খুব বেশি থাকলে অবশ্য অন্য কথা।

ডেভিডসন ও পাসমোর বলেছেন, রোজ দুটি কি তার বেশি ডিম খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়তে পারে। তবে ঐ যে আগে বলেছি, এই হিসাবও আমাদের দেশে চলে না।

ডেভিডসন ও পাসমোর জোর দিয়ে একটা কথা বলেছেন, রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ যতখানি-না খাদ্যের কোলেস্টেরলের উপর নির্ভর করে তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে খাদ্যের ফ্যাটের উপর। রক্তের কোলেস্টেরলের ব্যাপারে খাদ্যের ফ্যাটের চেয়ে খাদ্যের কোলেস্টেরলের ভূমিকা অনেক কম। অর্থাৎ, রক্তে কোলেস্টেরল কমাতে চাইলে খাদ্যে কতখানি কোলেস্টেরল আছে তা যতটা দেখতে হবে তার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে হবে খাদ্যে ফ্যাট আছে কতটা।

ডেভিডসন ও পাসমোর বলেছেন, "Dietary cholesterol has little effect on plasma cholesterol over the range of intake usual in prosperous societies (300—500 mg daily) since increasing intake inhibits endogenous production. Very high intakes, only obtainable by eating two or more eggs daily, however, raise plasma concentration and this can be lowered significantly by eliminating from the diet all the main sources—eggs, meat and

offal. Dietary cholesterol is much less important than dietary fat in determining plasma cholesterol."

সুতরাং কোলেস্টেরলের ভয়ে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ডিম খাবেন না, এটা ঠিক নয়।

ডিমকে বলা হয়েছে 'nature's convenience food', কারণ ডিমের শক্ত খোলা ডিমকে বাইরের অনেক দূষণ থেকে আগলে রাখে, ডিম রাখা সহজ, ডিম সহজে ভাঙা যায় ও সহজে রান্না করা যায়। তাছাড়া ডিমের পুষ্টিমূল্য অনেক, ডিমে অপরিহার্য সমস্ত পুষ্টিদ্রব্যই আছে প্রচুর পরিমাণে। ৩০ গ্র্যাম ওজনের একটা ডিমে সাধারণত ৩ গ্র্যাম প্রোটিন আর ৩ গ্র্যাম ফ্যাট থাকে এবং শক্তি পাওয়া যায় প্রায় ৪০ ক্যালরি। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের যা খাদ্য তাঁর সেই খাদ্যের সমস্ত প্রোটিনের চেয়ে ডিমের প্রোটিনের জৈবমূল্য অনেক বেশি।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, খোঁয়াড়ে কি খাঁচায় আটকা মুর্গির চেয়ে ছাড়া মুর্গির ডিমে ফোলেট আর ভিটামিন-বি১২ বেশি থাকে। হাঁস ও মুর্গির ডিমে বিশেষ পার্থক্য নেই। হাঁসের ডিম দেখতে বড়ো, তার উপাদান আর গঠন মুর্গির ডিমেরই মতো। মানুষ যত রকম ডিম খায়, সব রকম ডিমেরই পুষ্টিমূল্য মোটামুটি গৃহপালিত মুর্গির ডিমের মতো।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে হাঁসমুর্গি ছাড়াও অন্য অনেক প্রজাতির পাখির ডিম মানুষে খেয়ে থাকে। সমস্ত ডিমেরই পুষ্টিমূল্য মোটামুটিভাবে মুর্গির ডিমের সমান।

আমাদের দেশে একটা মুর্গির ডিমের ওজন সাধারণত ৩০ থেকে ৩৭ গ্র্যাম। এই ওজনের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ সাদা অংশের, ৩০ ভাগ কুসুমের আর বাকি ১০ ভাগ খোলার। খোলার রং সাদাও হয় আবার বাদামীও হয়। সাদা বাদামী যা-ই হোক না কেন, ডিমের পুষ্টিমূল্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সাদা খোলার ডিমের পুষ্টিমূল্য আর বাদামী খোলার ডিমের পুষ্টিমূল্য সমান। একই মুর্গি কখনও সাদা, কখনও বাদামী ডিম প্রসব করতে পারে।

ডিম খোলার মধ্যে থাকে বলে একেবারেই দূষিত হতে পারে না, এমন মনে করার কারণ নেই। ডিমের খোলায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে—এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে দেখা যায় না। মুর্গি যদি নোংরা জায়গায় ডিম পাড়ে তাহলে সেইসব ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোগবীজাণু ডিমের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। তাপের প্রভাবে সেই রোগবীজাণু মরে যায়। তাই ডিম সব সময়

সিদ্ধ করে বা পোচ ওমলেট ডালনা ইত্যাদি করে খাওয়া উচিত। কাঁচা ডিমে ক্ষতি হতে পারে।

অনেকের ধারণা, কাঁচা ডিম বেশি পুষ্টিকর। কিন্তু তা নয়। কাঁচা ডিমের অ্যালব্যুমিনে অর্থাৎ সাদা অংশে শরীরে বায়োটিনের অভাব ঘটে। কাঁচা ডিমের অ্যালব্যুমিনে অ্যাভিডিন নামে একরকম প্রোটিন থাকে, অ্যাভিডিন বায়োটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বায়োটিনকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে, শরীরে বায়োটিনের অভাব ঘটে। বায়োটিন শরীরের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় একটি বি-ভিটামিন।

এছাড়াও কাঁচা ডিমের অ্যালব্যুমিনে এমন কিছু জিনিস থাকে যা হজম হতে চায় না। তাই কাঁচা ডিম খেলে হজম-না-হওয়া অ্যালব্যুমিন মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। তাপের প্রভাবে অ্যালব্যুমিনের ঐ জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়, ডিম তখন সুপাচ্য হয়।

অল্প-সিদ্ধ আর পোচ-করা ডিমই সবচেয়ে ভালো হজম হয়। অন্যান্য ফ্যাটের চেয়ে ডিমের কুসুমের ফ্যাট অনেক সহজে হজম হয়। শিশুরাও খুব সহজে হজম করতে পারে। ডিম ভাজলে বা ওমলেট করলে হজম হতে দেরি হয়। পুরো সিদ্ধ ডিমও হজম হতে কিছু দেরি করে। কাঁচা ছাড়া ডিম যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন, রক্তে সম্পূর্ণ পরিশোষিত হয়, এমন কি শক্ত করে সিদ্ধ করা ডিমও। ডিম সহজে হজম হয় এবং রক্তে সম্পূর্ণ পরিশোষিত হয় বলে রোগীদের একটা সুখাদ্য এবং খুব পুষ্টিকর বলে কেবল শিশু নয়, বয়স্কদেরও অনেক পুষ্টির প্রয়োজন মেটায়।

অনেকের ধারণা, ডিম খেলে পেট গরম হয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। পেট গরম বলে কিছু নেই। ডিম খুবই সহজপাচ্য। কেবল কাঁচা ডিম খেতে নেই।

ডিমের সাদা অংশ প্রোটিনে ভরপুর। এতে বি-গ্রুপের ভিটামিনও আছে প্রচুর। ডিমের কুসুমে আছে সহজপাচ্য ফ্যাট। ক্যারোটিনয়েড পিগমেণ্ট আর রিবোফ্লেভিন জাতীয় পিগমেণ্টের দরুন ডিমের কুসুম হলদে হয়। পিগমেণ্ট কম থাকলে রং ফিকে হয়। মুর্গিকে তেল কিংবা অ্যালকোহলে দ্রবণীয় রঞ্জক পদার্থ খাইয়ে কুসুমের রং গাঢ় করা যায়।

আমাদের দেশে সাধারণ একটা মুর্গির ডিমে মোটামুটিভাবে ১০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল থাকে। কুসুমে প্রোটিনও থাকে এবং ফ্যাটে-দ্রবণীয় ভিটামিন আর ক্যালসিয়ম, ফসফরস, লোহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যও থাকে প্রচুর।

যাঁরা অ্যাথেরোসক্লেরোসিস রোগে অথবা করোনারি হার্ট ডিজিজে ভোগেন তাঁদের রক্তে সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কোলেস্টেরল পাওয়া যায়। তার মানে এই নয় যে, শুধু কোলেস্টেরল খাওয়া বন্ধ করে দিলেই সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে।

ডিমের কুসুমে যে ফ্যাট থাকে তাতে অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডও থাকে। মুর্গিকে যদি (সূর্যমুখী ফুলের বীজের তেলের মতো) অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড খাওয়ানো হয় তাহলে তার ডিমে অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যাবে। মানুষ সেই ডিম খেলে তার রক্তে কোলেস্টেরল বাড়বে না, যেমন বাড়ে সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড-যুক্ত ডিম খেলে।

ডিম সম্বন্ধে শেষে একটা কথা বলি ; শুধু ডিম নয়, ডিম আর দুধ সম্বন্ধে—পরীক্ষায় দেখা গেছে, ডিম আর দুধে কিছু বিষনাশক গুণ আছে ; ডিম আর দুধ দুই-ই খুব সহজে সালফার আর ফসফরসের বিষক্রিয়া নষ্ট করে দিতে পারে। সুতরাং সালফার আর ফসফরসের দূষণ ঘটে যেসব কলকারখানায় সেইসব কলকারখানায় যাঁরা কাজ করেন অথবা সেইসব কলকারখানার ধারেকাছে যাঁরা বাস করেন তাঁদের পক্ষে দুধ আর ডিম খাওয়া ভালো।

দশ : আলুতে মোটা হয় না

আলুর জন্ম পেরুতে। দক্ষিণ পেরুর চাষীরাই পৃথিবীতে প্রথম আলু খায়। সেখানকার চাষীরা আজ এক-একজন রোজ গড়ে এক কিলো করে আলু খায়।

আলু পেরুর একটা প্রধান খাদ্য। পেরুবাসীদের খাদ্যে আলুর স্থান এমন যে, তার অভাবে অনেক সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা পর্যন্ত দেখা দেয়।

পেরুর লিমায় আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র আছে। সেখানে ২০টি দেশের প্রায় ৭০ জন বিশেষজ্ঞ আলু নিয়ে গবেষণা করছেন। সেখানে প্রায় ৬,০০০ জাতের আলুর বীজ সংরক্ষণ করা আছে এবং সেখান থেকে পৃথিবীর ৫০টিরও বেশি দেশে ২০০রও বেশি জাতের আলুর বীজ রপ্তানি করা হয়।

১৯৮৬ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, এই কেন্দ্র পেরুতে ১০,৮৬৮ জাতের আলুর সন্ধান পেয়েছে, বোলিভিয়ায় পেয়েছে ৮৫৫ জাতের, কলম্বিয়ায় ৪৯৭ জাতের, ভেনেজুয়েলায় ৩২৫ জাতের, ইকুয়াডোরে ২৪০ জাতের আর চিলিতে ২৩৩ জাতের॥

গল্পে আছে, স্প্যানিশ বিজেতারা কৌতূহলবশে পেরু থেকে প্রথম স্পেনে আলু নিয়ে যায়, তারপর তা উত্তর ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে আয়ারল্যাণ্ডে।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোটা ইয়োরোপীয় মহাদেশে অতি দ্রুত আলুর চাষ বিস্তার লাভ করে। ইয়োরোপে আলুর প্রবর্তন ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য হয়, কারণ চাষীরা খুব সহজেই দানাশস্যের একটা বিকল্প ফসল পেয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত দেশে অনাবৃষ্টি অথবা রোগব্যাধির দরুন প্রধান দানাশস্যের ফলন প্রায়ই মার খেত, ফলে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। আলু এসে তাদের রক্ষা করল।

স্কটল্যাণ্ডে শেষ মহাদুর্ভিক্ষ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালের **'six dear years'**-এ, আলুর চাষ ব্যাপকভাবে প্রচলন হবার আগে।

অনেকের ধারণা, আলু তেমন পুষ্টিকর খাদ্য নয়, এতে মেদবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বিখ্যাত জার্মান আলুবিশেষজ্ঞ ডঃ হান্স সীবেনাইক বলেছেন, **"It's just preju-**

dice. Potatoes don't make you fat. It's the sauces served with them."

ডঃ সীবেনাইক একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। ১৯৮৬ সালে যখন তিনি একথা বলেন তখন তাঁর বয়স আশি। সারা জীবন তিনি আলু নিয়ে গবেষণায় কাটিয়েছেন। আলু সম্বন্ধে তাঁর কাছে ১০০টির উপর বই আছে। তিনি নিজেও একটি বই লিখেছেন। তাঁর মতে আলু একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং পুষ্টিকর খাদ্য। তাঁর পরিবারের প্রত্যেকে রোজ আলু খায় এবং এক-একজন বছরে ৮৫ কিলোর বেশি খায়। তাদের কেউ মোটা নয়। এই ৮০ বছর বয়সে ডঃ সীবেনাইকের চেহারা খাড়া তরোয়ালের মতো। তাঁর বক্তব্য, ১০০ গ্র্যাম আলুতে থাকে মাত্র ৭০ ক্যালরি, সুতরাং পরিমাণমতো আলু খেলে মোটা হয় না। আলুতে শরীরে ভালো রক্তসঞ্চালন হয়, পেট পরিষ্কার থাকে।

ডঃ সীবেনাইক জোর গলায় বলেন, "A glass of potato juice a day keeps you young and healthy."

সে তাঁকে দেখলেই বোঝা যায়। তিনি নিজেকে দেখিয়ে বলেন, "Just look at me. I've no time to get old."

কিন্তু বাঙালীর মুখে তো কাঁচা আলুর রস রুচবে না, বাঙালীকে আলু সিদ্ধ করে কি রান্না করেই খেতে হবে। ডঃ সীবেনাইক তারও সমাধান দিয়েছেন। বলেছেন, ১৫ মিনিটের বেশি আলু জলের মধ্যে রাখবেন না। অল্প জলে অল্পক্ষণ সিদ্ধ করলে ৯০ শতাংশ ভিটামিন রাখা যায়। যত বেশি সিদ্ধ করবেন তত বেশি ভিটামিন নষ্ট হবে। এইভাবে ৪২ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে।

আলু খোসাসুদ্ধ রান্না করলে খোসার মধ্যেকার ভিটামিন-বি ও সি এবং নানারকম লবণ অনেকখানি বজায় রাখা যায়। খোসা ছাড়িয়ে এবং খণ্ড খণ্ড করে কেটে রান্না করলে ভিটামিন অনেকটাই নষ্ট হয়। রান্নার পর যদি আবার গরম করা হয় তাহলে আরও ভিটামিন নষ্ট হয়।

আলুতে প্রচুর শ্বেতসার আছে, আলু থেকে তাই প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়। তবে আলুতে প্রোটিন, খনিজ পদার্থ আর ভিটামিন খুব কম।

আলুর একটি অসাধারণ গুণ, কেবল আলু খেয়ে বেঁচে থাকতে হলে এমন সস্তা খাদ্য আর নেই। ১৯১৩ সালে হিণ্ডহেড নামে একজন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন, কাকরে একটি লোক রোজ সামান্য একটু মার্জারিন দিয়ে ২ থেকে ৪ কিলো আলু খেয়ে ৩০০ দিন সুস্থ শরীরে কাটিয়ে দিয়েছিল।

আলুতে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ জল। ১০০ গ্র্যাম আলুতে ৭০ থেকে ৯০ ক্যালরি মতো শক্তি পাওয়া যায়। এই শক্তির বেশির ভাগই আসে স্টার্চ অর্থাৎ শ্বেতসার থেকে, শতকরা মাত্র ৭·৬ ভাগ আসে প্রোটিন থেকে আর অতি নগণ্য পরিমাণে আসে ফ্যাট থেকে। আলুতে প্রোটিনের পরিমাণ খুব সামান্য—১০০ গ্র্যামে মাত্র ২ গ্র্যাম মতো। কিন্তু প্রোটিনখাদ্য হিসাবে শুধু আলু খেলে আলুর জৈবমূল্য ডিমের প্রোটিনের সমান। প্রচুর পরিমাণে আলু খেতে পারলে আলু থেকে ভালোরকম প্রোটিনই পাওয়া যায়। আলুতে ডায়েটারি ফাইবারও ভালো থাকে অর্থাৎ খাদ্যে যে আঁশ থাকা দরকার সেই আঁশ।

আলুতে সামান্য পরিমাণে খনিজ দ্রব্য আর বি-গ্রুপের ভিটামিন পাওয়া যায়। পটাসিয়মের একটা ভালো আধার আলু। আলুতে অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড খুব বেশি থাকে না, তবে প্রচুর পরিমাণে আলু খেলে অনেক সময় পর্যাপ্ত পরিমাণেই অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড খাওয়া হয়। আলুর অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডের পরিমাণ কখনও স্থির থাকে না। মাটি থেকে তোলা টাটকা আলু আর অনেক দিন ঘরে রাখা পুরনো আলুর অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডের পরিমাণে অনেক তারতম্য হয়। টাটকা আলুতেই বেশি অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড থাকে।

আলু খুব সহজে হজম হয় এবং শরীরে খুব ভালোভাবে পরিশোষিত হয়, তাই রুগ্‌ণদের পক্ষে আলু একটা সুখাদ্য।

আলু খেলে মোটা হয় বলে যে ধারণা আছে সেই ধারণার পিছনে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কোনো কারণ নেই। আলু ফ্যাট অর্থাৎ চর্বি তৈরি করে সত্যি, কিন্তু সে অনেক খেলে; দেহ দৈনিক যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে পারে, খাদ্যের শক্তিমূল্য তার চেয়ে বেশি হয়ে গেলে। অন্য সমস্ত খাদ্যের বেলায়ও তো তাই। তাহলে কেবল আলুর দোষ দেওয়া কেন? আলুর চেয়ে মাখনে ৯ গুণ বেশি ক্যালরি।

আলুর একটা দোষ অবশ্য আছে,—আলুতে সোলানাইন নামে এক ধরনের অ্যালক্যালয়েড থাকে যা কখনও কখনও বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ আলুতে প্রতি ১০০ গ্র্যামে প্রায় ৭ মিলিগ্র্যাম সোলানাইন থাকে—অধিকাংশই থাকে খোসায়; চোখে আর অঙ্কুরেও থাকে কিছু। তবে আলু থেকে বিষক্রিয়া কদাচিৎ হয়। আলু সিদ্ধ করলে বা ভাজলে বিষক্রিয়া অনেকাংশে নির্মূল হয়ে যায়।

এগার : মেদবাহুল্য

মেদবাহুল্যকে ইংরেজীতে বলা হয় ওবেসিটি। মেদবাহুল্যের সঙ্গে অতিভোজনের যে একটা সম্পর্ক আছে সে ঐ ওবেসিটি কথাটা থেকেই বোঝা যায়। লাতিন obesus থেকে ইংরেজী obese ও obesity—এবং obesus অর্থ having eaten completely.

ওবেসিটি অর্থাৎ মেদবাহুল্য প্রয়োজনাতিরিক্ত আহারের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং এ একরকম অসুখ—প্রধানত বড়োলোকের অসুখ, 'the most prevalent nutritional disorder in prosperous communities.'

দরিদ্র সমাজে এই অসুখ খুব কমই দেখা যায়। আদিম সমাজেও এই অসুখ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বন্যপ্রাণীদের মধ্যেও মেদবাহুল্য বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু সভ্য সমাজে যেখানেই লোভনীয় খাদ্যের প্রাচুর্য সেখানেই মোটা মানুষ, মোটা বিড়াল, মোটা কুকুর, মোটা গোরু, মোটা ছাগল।

শরীরে 'এনার্জি ব্যালান্স' নষ্ট হয়ে গেলেই সাধারণত এই অসুখ হয়। খাদ্য থেকে আমরা শক্তি পাই এবং শারীরিক পরিশ্রমে আমরা শক্তি ক্ষয় করি। এই দুইয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। তা যদি না থাকে, দৈনন্দিন কাজকর্মে যতখানি শক্তি ব্যয় হয় খাদ্যে যদি তার চেয়ে বেশি শক্তি পাওয়া যায় তাহলে বাড়তি শক্তি চর্বি হয়ে শরীরের চর্বিডিপোগুলিতে জমে, লোকে মোটা হয়। যদি এর উলটোটা ঘটে অর্থাৎ খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, দৈনন্দিন কাজকর্মে যদি তার চেয়ে বেশি শক্তি দরকার হয় তাহলে শরীর তার শক্তির অভাবপূরণের জন্য চর্বিডিপোগুলিতে হানা দিয়ে সেখান থেকে শক্তি টেনে এনে তার কাজ চালায়, এইভাবে চর্বি কমতে থাকে, লোকে রোগা হতে আরম্ভ করে।

বিংশ শতাব্দীতে কলকারখানায় বাড়িতে অফিসে সর্বত্র যন্ত্রের সাহায্যে অধিকাংশ কাজ হচ্ছে, মানুষের হাঁটাচলা, পরিশ্রম করা অনেক কমে গেছে—মানুষের পেশীশক্তি ব্যবহার করার তেমন দরকার হচ্ছে না। শুধু ইয়োরোপ অ্যামেরিকায় নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শক্তির চাহিদা মেটাতে অনেক কম খাদ্যের প্রয়োজন, আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহদের

তুলনায় অনেক অনেক কম। কিন্তু খাদ্যাভ্যাস আর রীতিনীতি মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে, আমরা এখনও পিতামহ-প্রপিতামহদের মতো খেয়ে চলেছি। সুতরাং আমাদের মেদবাহুল্য অস্বাভাবিক কিছু না।

আহার আর শারীরিক পরিশ্রম স্বভাবের ব্যাপার, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে, মেদবাহুল্য স্বভাবজাত অসুখ। বিপাক-ক্রিয়ায় গোলমাল অথবা কোনো অঙ্গবৈকল্যের কারণে এই অসুখ খুব কমই হয়।

অবশ্য মেদবাহুল্যের পিছনে জিনেটিক কারণও থাকতে পারে। কোনো কোনো প্রজাতির প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একটিমাত্র জিনে ত্রুটির দরুন তারা মোটা হয়। ইঁদুরের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট দেখা গেছে। মানুষের বেলায় দেখা গেছে, মেদবাহুল্য অনেক সময় বংশগত, কিন্তু জিনেটিক কারণকে পারিবেশিক কারণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায় না। মানুষের মেদবাহুল্যের জন্য কেবল জিন দায়ী নয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব মানুষকে আহার সংগ্রহের জন্য প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয় এবং প্রায়ই দুর্ভিক্ষ এসে তাদের দ্বারে হানা দেয় তারা যখন শহরে অথবা শহরতলিতে গিয়ে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করে তখন অস্বাভাবিক রকম মোটা হয়ে পড়ে।

মেদবাহুল্য বংশগত ব্যাপার, অ্যামেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওবেসিটি রিসার্চ গ্রুপের ক্লিনিক্যাল ডিরেকটর ডঃ টমাস ওয়াডেন একথা পুরোপুরি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ওজনের চেয়ে উচ্চতাই বেশি বংশগত বলে দেখা যায়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৭, এই ২০ বছরে জাপানে পুষ্টির কারণে মানুষের গড় উচ্চতা বেড়েছে দেড় ইঞ্চি: "There you have a genetically controlled physical characteristic strikingly modified by eating habits." ওজনের ব্যাপারেও একথা অনেকখানি সত্যি। একজন মানুষ মোটা হওয়ার কি রোগা হওয়ার প্রবণতা নিয়ে জন্মাতে পারে, কিন্তু পরে তার খাদ্য আর শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রাই স্থির করে দেবে শেষপর্যন্ত সে মোটা হবে, না রোগা হবে। অ্যামেরিকায় ১৯০০ সালের চেয়ে এখন মোটা লোকের সংখ্যা দ্বিগুণ, অথচ তাদের জিন-পুলে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি।

পরিবর্তন ঘটেছে পরিবেশে। এখন এমন পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে মোটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। অ্যামেরিকান সরকার মেদবাহুল্যরোধে এবং মেদবাহুল্যের চিকিৎসায় যত টাকা খরচ করেন তার ১০০ গুণ বেশি খরচ করেন খাদ্যব্যবসায়ীরা মানুষকে মোটা করার জন্য: "For every dollar spent

by the Surgeon General's office to prevent and treat obesity, one hundred dollars is spent by the food industry to entice consumers into eating more fattening foods."

অ্যামেরিকার খাদ্যে প্রচুর ফ্যাট, বিশেষ করে ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁর খাদ্যে—এবং অ্যামেরিকায় মানুষের শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রাও অনেক কমে গেছে। সুতরাং মানুষ মোটা হবেই।

ডঃ ওয়াডেন একটা মজার কথা বলেছেন, "অ্যামেরিকান ফোন কোম্পানি গর্ব করে বলে থাকে, অফিসে এক্সটেনশন ফোন থাকার দরুন একজন মানুষের বছরে ১০ মাইল হাঁটা বেঁচে গেছে। কিন্তু একমাত্র তাতেই দু পাউণ্ড ওজন বাড়ছে।"

ডঃ ওয়াডেন আরও একটা চিন্তার কথা বলেছেন, পরীক্ষায় দেখা গেছে, ম্যানুয়াল টাইপরাইটার ছেড়ে ইলেকট্রিক টাইপরাইটার ধরলে বছরে চার পাউণ্ড ওজন বাড়ে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, "Genetics and environment are *both* determinants in obesity. Your life-style can bring out (or suppress) any unfortunate tendency to be fat."

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, মোটা হওয়ার কারণ হিসাবে কেবল অধিক ক্যালরি বললে সবটা বলা হয় না এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক কারণও খাটে না। দেখা গেছে, অনেকে বেশি খেয়েও মোটা হয় না, আবার অনেকে অল্প খেয়েই মোটা হয়। যারা সহজে মোটা হয় না তাদের ক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে যে, তারা বেশি খেলেও তাদের দেহ তাড়াতাড়ি সেই খাদ্য কাজে লাগাতে পারে; আবার, যারা সহজেই মোটা হয় তাদের ক্ষেত্রে হয়তো পুরো কার্বোহাইড্রেট খরচ করে শক্তি উৎপাদনে কিছু অসুবিধা আছে এবং তাদের কার্বোহাইড্রেট শক্তির বদলে চর্বিতে পরিণত হয় বেশি।

যা-ই হোক, মেদবাহুল্যের দুটি কারণ খুব সহজেই বোঝা যায়। প্রথম, পুষ্টির অভাব। সাধারণত আমরা যে খাদ্য খাই তাতে পুষ্টির এত অভাব থাকে যে, শরীর সেই অভাবপূরণের চেষ্টায় আমাদের অজ্ঞাতসারেই আমাদের বেশি খেতে বাধ্য করে। কিন্তু আবারও সেই পুষ্টিহীন খাদ্য খাওয়ায় পুষ্টির অভাব পূরণ হতে পারে না। ফলে, আবারও বেশি খেতে হয়। এমনি করে ক্রমশঃ বেশি খেতে খেতে লোকে মোটা হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় কারণ, অনেকে খুব বেশি খাওয়ার পরিবর্তে খুব কম খান। তাতে মৌলিক বিপাকক্রিয়া স্বাভাবিকের অনেক নিচে নেমে যায়। ফলে, কাজের জন্য শক্তি পাওয়া যায় না, তাপে পরিণত করার জন্যও না। অল্প ক্যালরি খরচ হলে অল্প ক্যালরিই দরকার হয়। এই ধরনের লোকেরা বসে বসে, অল্প খেয়েই মোটা হয়।

১৯৮৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি অমৃত বাজার পত্রিকায় Believe It or Not বিভাগে একটা ছবি ছাপা হয়েছিল, ইংরেজীতে সেই ছবির যে ক্যাপশন ছিল তার বাংলা করলে দাঁড়ায়: এতাবৎকালের সবচেয়ে মোটা ইংরেজ ড্যানিয়েল ল্যাম্বার্ট (১৭৭০—১৮০৯)। তাঁর ওজন ছিল ৭৪২ পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ৩৩৭ কিলোগ্র্যাম)। তাঁর পায়ের বেড় ছিল ৩ ফুট ১ ইঞ্চি আর কোমরের বেড় ৯ ফুট ৪ ইঞ্চি। তাঁর খাদ্য কিন্তু ছিল একেবারে সাদামাটা, নিরেস—এবং তিনি পানীয় হিসাবে জল ছাড়া আর কিছুই খেতেন না।

আগেই বলেছি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খেলেই সাধারণত লোকে মোটা হয়—সে একবারে খেলেও হতে পারে, বারে বারে খেলেও হতে পারে। যেসব মহিলা বাড়ি থাকেন, ঘোরেন ফেরেন আর কিছু মুখে দেন তাঁরা মোটা হন। আবার, রান্না করতে করতে চেখে দেখার অভ্যাস যাঁদের বেশি তাঁরাও বেশি চাখার ফলে মোটা হয়ে পড়েন। প্রাগে একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যাঁরা দিনে পাঁচবার কি ছবার খান তাঁদের মোটা হবার যতখানি সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশি সম্ভাবনা যাঁরা দিনে তিনবার খান।

আবার, একটা কথা শোনা যায় যে, ধূমপান ছেড়ে দিলে লোকে মোটা হয়ে পড়ে। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। যাঁরা খুব বেশি ধূমপান করেন তাঁরা যদি হঠাৎ ধূমপান ছেড়ে দেন তাহলে মোটা হয়ে পড়তে পারেন। কিছুদিন আগে বস্টনে প্রকাশিত নিউ ইংল্যাণ্ড জার্নাল অভ মেডিসিনে চারজন সুইস গবেষকের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, অ-ধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীরা ১০ শতাংশ বেশি দ্রুত হারে ক্যালরি পোড়াতে পারেন। হঠাৎ ধূমপান ছেড়ে দিলে মোটা হয়ে পড়ার যে কারণ তা এরই মধ্যে নিহিত আছে। ধূমপায়ীরা যদি বেশি ক্যালরি পোড়াতে পারেন তাহলে তাঁদের মোটা হবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং ধূমপান ছেড়ে দিলে ক্যালরি যদি কম পোড়ে তাহলে মোটা হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

বস্টনের ঐ রিপোর্টে দেখা যায়, ১২ ঘণ্টার মধ্যে ২৪টা সিগারেট খেলে দেহের বিপাকক্রিয়ার হার শতকরা ১০ ভাগ বাড়ে। এই কারণে দেখা যায়,

ধূমপায়ীরা মোটা না হয়েও অ-ধূমপায়ীদের চেয়ে সাধারণত বেশি খেতে পারেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, যাঁরা খুব বেশি ধূমপান করেন তাঁরা রোজ অতিরিক্ত ২০০ ক্যালরি পোড়াতে পারেন, যা নাকি সাধারণ একটা চকোলেট বারের ক্যালরির সমান। সুতরাং যাঁরা দিনে ২৪টা সিগারেট খান তাঁরা যদি হঠাৎ সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেন তাহলে তাঁদের দেহের ওজন হঠাৎই ১০ কিলোগ্র্যাম বেড়ে যেতে পারে—অবশ্য যদি আহারের পরিমাণ কমান তো অন্য কথা। আহারের পরিমাণে হেরফের না করে হঠাৎ ধূমপান ছাড়লে মোটা হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।

মেদবাহুল্যের তরতম আছে। দেহে সামান্য মেদসঞ্চার অনেক কারণেই হতে পারে। এইরকম মেদসঞ্চারে শরীরে যদি অস্বস্তি না হয়, কোনো রোগের লক্ষণ দেখা না যায় তাহলে তেমন চিন্তার কিছু নেই। এই ধরনের লোককে মোটা না বলে সাধারণত গোলগাল বা নাদুসনুদুস বলা হয়।

একসময় পৃথিবীর অনেক দেশেই এই ধরনের গোলগাল চেহারার মানুষের কদর ছিল। বরং বলা যায়, গোলগাল হওয়াটা তখন ফ্যাশন ছিল।

মানুষের আচারব্যবহার অনেকখানি ফ্যাশনের উপর নির্ভর করে, বিশেষ করে অল্পবয়সী মহিলাদের। ফ্যাশন অনুসারে মানুষ তার চেহারা তৈরি করে এমন দৃষ্টান্ত দেশে দেশে আছে। আমাদের দেশে তন্বী শ্যামা যেমন কবিকে নন্দিত করেছে তেমনি গৌরী স্থূলাঙ্গীও পুরুষকে আকৃষ্ট করেছে। বহু ভারতীয় শিল্পী পীনপয়োধরা স্থূলাঙ্গী রমণীর মূর্তি গড়েছেন, ছবি এঁকেছেন। রুবেন্স আর রনোয়ার অনেক ছবিতে নগ্ন নারীদেহে 'ভলাপচুয়াস কার্ভ' দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, ১৬৩০ সালের কাছাকাছি বেলজিয়ামে আর ১৮৮০ সালের কাছাকাছি ফ্রান্সে স্থূলদেহী রমণীর কদর ছিল। রুবেন্স আর রনোয়া যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এখন এইরকম ছবি আঁকার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না, আজকের রমণীরা তাঁদের ঘেরাও করতেন।

আফ্রিকার উত্তরাংশে এই সেদিনও পুরুষেরা অতি স্থূলকায় নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করেছে। প্রসিদ্ধ বৃটিশ অভিযাত্রী জে এইচ স্পীক নীলনদের উৎস-সন্ধানে গিয়ে এক আফ্রিকান উপজাতি পরিবারে কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছেন, পুরুষ স্থূলাঙ্গী রমণীর রূপে হৃষ্ট হয় এবং অনেক যত্ন করে রমণীকে স্থূলাঙ্গী করা হয়। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত তাঁর 'জার্নাল অভ দি ডিসকভারি অভ দি সোর্স অভ দি নাইল' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

"After a long and amusing conversation with Rumarika in the morning, I called on one of his sisters-in-law. She was another of those wonders of obesity, unable to stand excepting on all fours. I was desirous to obtain a good view of her and actually to measure her... After getting her to sidle and wiggle into the middle of the hut, I took her dimensions: round arm 1 ft 11 in; chest 4 ft 4 in; thigh 2 ft 7 in; calf 1 ft 8 in; height 5 ft 8 in. All of these were exact except the height, and I believe I could have obtained this more accurately if I could have laid her on the floor. Not knowing what difficulties I should have to contend with in such a piece of engineering, I tried to get her height by raising her up. This, after infinite exertions on the part of both of us, was accomplished, when she sank down again fainting. Meanwhile, the daughter, a lass of 16, sat stark naked before us, sucking at a milk pot, on which the father kept her at work with a rod in his hand, for as fattening is the first duty of a fashionable female life, it must be duly enforced by the rod, if necessary. I got up a bit of flirtation with missy and induced her to rise and shake hands with me. Her features were lovely, but her body was as round as a ball."

সুখের কথা, ফ্যাশন কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ঐ যে ইংরেজীতে বলে, "Fashion is always fickle and unreliable whether in ideas or in clothes," সে বড়ো খাঁটি কথা। এই কথার সঙ্গে চেহারার কথাটাও যোগ করা যায়।

মোটা চেহারার মানুষ এখন আর কেউ পছন্দ করে না—সে পুরুষই হোক কি নারী। এখন স্লিম হওয়ার ফ্যাশন চলছে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে।

ফ্যাশন তো দেখতে ভালো লাগার জন্য, কিন্তু অনেকের পক্ষে রোগা হওয়া সত্যিই দরকার—কেবল দেখতে ভালো লাগার জন্য নয়, অনেক রোগব্যাধি এড়ানোর জন্যও।

মেদবাহুল্যের দরুন শরীরে নানারকম রোগব্যাধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কিছুটা পায় অতিরিক্ত টিস্যুর চাপে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ ব্যাহত হয় বলে ; আর কিছুটা পায়, অতিরিক্ত মেদের কারণে শরীরের বিপাকক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটে বলে। মেদবাহুল্য যখন গুরুতর আকার ধারণ করে তখন একই-সঙ্গে একাধিক রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে এবং তার জন্য স্বাস্থ্যহানি তো বটেই, মৃত্যু পর্যন্ত ত্বরান্বিত হতে পারে। সুতরাং মেদবাহুল্যকে কখনই অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত নয়।

বাড়তি ওজনে সব সময়েই বাড়তি বিপদ থাকে। মোটা লোকের শ্বাসকষ্ট হয়, হাই ব্লাড প্রেশার হয়, ডায়াবিটিজ হয়, হার্টের অসুখ হয়, আরথ্রাইটিস হয়, গল-ব্লাডারের অসুখ হয় এবং আরও অনেককিছু হয়। একটা হিসাবে দেখা যায়, যাঁরা ১০ শতাংশ বেশি মোটা তাঁদের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা ১৩ শতাংশ বেশি এবং যাঁদের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি তাঁদের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা ৪২ শতাংশ বেশি। সুতরাং এইসব লোকদের পক্ষে স্লিমিং ফ্যাশন নয়, প্রয়োজন।

মেদবাহুল্যের চাপটা হৃৎপিণ্ডের উপরই বেশি পড়ে। হৃৎপিণ্ডকে শরীরের অতিরিক্ত মেদপিণ্ডে রক্ত পৌছে দেবার ব্যবস্থা করতে হয় বলে তাকে বেশি কাজ করতে হয়। তাতে তাড়াতাড়ি তার কর্মক্ষমতা কমে এবং অকালে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন তার অনিবার্য ফল মৃত্যু।

তাছাড়া শরীরে অতিরিক্ত মেদের দরুন করোনারি থ্রম্বোসিস রোগের আশঙ্কাও বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডকে পরিবেষ্টন করে থাকে যেসব করোনারি ধমনী, এই রোগে সেইসব ধমনীর ভিতরকার দেওয়ালে ফ্যাট জমে। সেই জমা ফ্যাটকে বলে অ্যাথিরোমা। অ্যাথিরোমার দরুন করোনারি ধমনীর ভিতরে রক্ত-চলাচলের পথ সরু হয়ে যায়, তাতে রক্তচলাচল ব্যাহত হয়—এবং যদি কখনও রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে সরু পথটা বন্ধ করে দেয় তাহলে রক্তচলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে বলে হার্ট অ্যাটাক এবং এই হার্ট অ্যাটাক অনেক সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে প্রাণনাশের কারণ হয়।

বহুকাল যাবৎ অনেকের ধারণা ছিল, যেহেতু ফ্যাট জমে জমে অ্যাথিরোমা সৃষ্টি হয় এবং সেই ফ্যাট আসে খাদ্য থেকে সেইহেতু খাদ্যে ফ্যাট বর্জনীয়। কিন্তু পরে দেখা গেল, এ ধারণা ঠিক নয়। আমরা এখন জানি, আমাদের খাদ্যে

লাইনোলিক অ্যাসিড আর লাইনোলেনিক অ্যাসিড নামে দুটি অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকা খুবই দরকার। ফ্যাট সম্পর্কে সাম্প্রতিক কথা হল, অসংপৃক্ত ফ্যাটের চেয়ে সংপৃক্ত ফ্যাটেই অ্যাথিরোমার সম্ভাবনা বেশি, সুতরাং প্রাণিজ ফ্যাটের চেয়ে উদ্ভিজ্জ ফ্যাটই শরীরের পক্ষে ভালো। কারণ, উদ্ভিজ্জ ফ্যাটে সাধারণত অসংপৃক্ত স্নেহপদার্থই বেশি থাকে। তাই বলে অধুনা বহুলপ্রচলিত বনস্পতি জাতীয় উদ্ভিজ্জ ফ্যাট নির্দোষ নয়। বনস্পতি তেল তরল অবস্থায় অসংপৃক্তই থাকে, কিন্তু যখনই হাইড্রোজেন-সহযোগে জমানো হয় তখনই তা সংপৃক্ত হয়ে পড়ে এবং তাতে অ্যাথিরোমা সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে।

যা-ই হোক, করোনারি থ্রম্বোসিসের সঙ্গে সংপৃক্ত ফ্যাটের সম্পর্ক এখনও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি। এ বিষয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী কথা শোনা যায়।

কিছুকাল আগে এমনও শোনা গেছে যে, সংপৃক্ত ফ্যাটের দরুন কখনই অ্যাথিরোমা হয় না, অ্যাথিরোমার কারণ চিনি অর্থাৎ সুক্রোজ। কিন্তু এ সম্বন্ধেও জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে একথা হয়তো বলা যায় যে, কোনো একটিমাত্র কারণে করোনারি থ্রম্বোসিস হয় না, এই রোগের পিছনে অনেক কারণ কাজ করে। তার মধ্যে যেমন দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা আছে, মানসিক চাপ আছে তেমনি শারীরিক পরিশ্রমের অভাবও আছে।

মেদবাহুল্যকে সাধারণভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। মোটা লোকদের বেশির ভাগই প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। তাঁরা নিজেরাই ডায়েটিং আর একসারসাইজ করে শরীরের মেদ কমাতে পারেন। শরীরের বাড়তি মেদ তাঁদের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি করে না, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই জীবন যাপন করতে পারেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাঁরা পড়েন তাঁদের অনেকেই মেদ কমানোর জন্য ডাক্তার আর ডায়েটিশিয়ানদের শরণাপন্ন হন। তাঁদের অনেকের শরীরস্বাস্থ্য বাইরে থেকে দেখতে ভালো হলেও এবং তাঁরা মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারলেও সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে পড়েন, অস্বাভাবিক রকম ক্লান্ত হন। শরীরে তাঁরা যে অতিরিক্ত মেদভার বহন করেন তার জন্যই এমন হয়। অতিরিক্ত মেদের চাপে আর মেটাবলিক কারণে তাঁরা একই সঙ্গে একাধিক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, যেমন—মধুমেহ বা বহুমূত্ররোগ, অধিক রক্তচাপ, পিত্তাশয়ের রোগ, লিভারের স্ফীতি, গেঁটেবাত, ফুসফুসের রোগ, অস্টিওআরথ্রাইটিস, হার্নিয়া, ভ্যারিকোস ভেন্স অর্থাৎ শিরার অস্বাভাবিক রকম স্ফীতি ও প্রলম্বন, এবং এক

ধরনের চর্মরোগ। এই শ্রেণীর মোটা লোকদের আয়ু কমে যায়। দেহের ওজন যত বেশি হয়, মৃত্যুর হারও তত বেশি হয়। তাঁদের দেহে যদি কখনও অস্ত্রোপচার করার দরকার হয় তখন ডাক্তাররা সঙ্কটে পড়েন। কারণ, অ্যানিস্থিশিয়া তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, অস্ত্রোপচারের পর শরীরে নানারকম জটিলতাও দেখা দিতে পারে। তাছাড়া তাঁদের দেহে অস্ত্রোপচার করাও কঠিন হয়ে পড়ে।

তৃতীয় শ্রেণীর মোটা লোকদের সত্যিই মর্মান্তিক অবস্থা। তাঁদের দেখলে কষ্ট হয়। তাঁদের মনুষ্যজন্মই বৃথা। অত্যধিক মেদভারে দৈনন্দিন কাজকর্মে তাঁরা প্রায় সম্পূর্ণ অপারগ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বেলায় যেসব রোগের কথা বলেছি, অনেক সময় তার অনেকগুলিই তাঁদের সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাঁদের আয়ু অনেক কম। তাঁদের দারুণ মানসিক গণ্ডগোলও থাকে অনেক সময়। নীলনদের উৎসসন্ধানে গিয়ে স্পীক যে উপজাতীয় নারীর দেখা পেয়েছিলেন সেই নারী তৃতীয় শ্রেণীর মেদবাহুল্যের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উদাহরণ আরও দেওয়া যেতে পারে। দুবাইয়ের 'গালফ নিউজ' পত্রিকায় ১৯৮৭ সালের ২১ অকটোবর তারিখে 'Walter goes slimline' শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপা হয়, সংবাদদাতা ডেভিড জিমারম্যান। ওয়ালটার বলতে ওয়ালটার হাডসন। নিউ ইয়র্কের এক শহরতলির অধিবাসী। ভীষণ মোটা। মাসখানেক আগে তিনি তাঁর শোবার ঘরের দরজায় আটকে গিয়েছিলেন। কিছুতেই তাঁকে বার করা যাচ্ছিল না। শেষে ফায়ার ব্রিগেড ডাকতে হয়। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা দরজা কেটে তাঁকে বার করেন। তারপরই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়ে যান।

জিমারম্যান তাঁর সঙ্গে দেখা করে 'গালফ নিউজে' যে নিবন্ধ লেখেন তা থেকে জানা যায়—

হাডসনের বয়স ৪২ বছর, ওজন ৫৪৫ কিলোগ্র্যাম। লম্বায় তিনি প্রায় ৬ ফুট এবং বেড়ে ৯ ফুট। টকটকে লাল একখানা চাদর ঢাকা দিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় সব সময় তিনি শুয়েই থাকেন। কারণ, তাঁর শরীরের মাপে পোশাক তৈরি করা যায় না।

তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটে বাইবেল পড়ে: "I like the Psalms. Pslam 121 is one of my favourites because it tells you about what to do when you're down."

হাডসন নিউ ইয়র্কের এক শহরতলিতে তাঁর ভাইয়ের কাছে থাকেন। তাঁর ভাই মোটা নন, আর দশজনের মতোই স্বাভাবিক। তাঁর ভাইপো-ভাইঝিরাও স্বাভাবিক। সারা পরিবারে একমাত্র তিনিই অস্বাভাবিক রকম মোটা। তার প্রধান কারণ, ওভার-ঈটিং অর্থাৎ অতিভোজন। "I'm a compulsive over-eater," হাডসন স্পষ্ট স্বীকার করেন।

হাডসন সকালে দুপুরে এবং রাত্রে কী খান জানতে চাইলে অসঙ্কোচে বলেন, "For breakfast I'd eat one kg of bacon, a dozen eggs, a dozen rolls, jam and coffee. Then about noon I'd send out for four big macs, four double cheeseburgers, eight boxes of fries, six little pies and six quarts of soda. Then for supper I'd have maybe three ham steaks, about six baked sweet potatoes, six or seven baked white potatoes, butter stuffing. Then after that there'd be snacks—potato chips, cupcakes and sometimes ice cream."

হাডসন যে তাঁর শোবার ঘরের দরজায় আটকে গিয়েছিলেন এবং দরজা কেটে তাঁকে উদ্ধার করতে হয়েছিল, খবরের কাগজে এই খবর পড়ে বাহামা থেকে নিউ ইয়র্কের শহরতলিতে তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন ডিক গ্রেগরি নামে একজন সমাজকর্মী ও পুষ্টিবিশেষজ্ঞ। বাহামায় গ্রেগরির একটা ওয়েট-লস ক্লিনিক আছে। গ্রেগরি হাডসনকে বাহামায় নিয়ে যেতে চান, কিন্তু আপাতত হাডসনের বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা করছেন। চিকিৎসা বলতে প্রধানত 'স্ট্রিক্ট ডায়েট'। হাডসনের কথায়, "I eat fruit and vegetables and I take Mr. Gregory's powdered nutrition mix in orange juice. No meat at all. And I drink seven litres of water a day."

এই খেয়ে মাসখানেকের মধ্যেই হাডসনের ওজন প্রায় ২২ কিলোগ্র্যাম কমেছে। গ্রেগরি বলেছেন, তাঁর কথামতো চললে বছর দু-তিনের মধ্যে হাডসনের ওজন তিনি ৫৪৫ কিলোগ্র্যাম থেকে কমিয়ে ৮৬ কিলোগ্র্যামে আনবেন। গ্রেগরি এমনভাবে হাডসনের রোজকার খাদ্য বেঁধে দিয়েছেন যাতে ১২০০ ক্যালরির উপর না ওঠে।

হাডসন নিজেই বলেছেন, তাঁর বয়স যখন ৬ তখন থেকেই তিনি রাক্ষসের মতো খেতে শুরু করেন। তাঁর বয়স যখন ১৫ তখন তিনি এত মোটা হয়ে

পড়েন যে, জামাকাপড়ে আর কুলোয় না। তিনি বিবস্ত্র হয়েই থাকতে আরম্ভ করেন। বাড়ি থেকে আর বার হন না। তাঁর মনে আছে, ১৭ বছর আগে একবার তিনি মোটরগাড়িতে করে খানিকক্ষণের জন্য বেরিয়েছিলেন। তার পর থেকেই গৃহবন্দী। গত ১৭ বছরের মধ্যে একবারও তিনি বাড়ির বার হন নি। টেলিভিশন দেখে, টেপ শুনে আর বাইবেল পড়েই তাঁর সময় কাটে।

জিমারম্যানের লেখা থেকে জানা যায়, এত মোটা হয়েও হাডসনের মনে তেমন ভার চেপে বসে নি, তাঁর দেহযন্ত্র যতখানি বিকল হওয়া উচিত ছিল হয় নি। জীবনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় শুয়ে কাটালেও তাঁর দেহে বেডসোর অর্থাৎ শয্যাক্ষত হয় নি। গ্রেগরি বলেছেন, **"We think what might have happened is, in 27 years of lying around, he might have, because of the reading of his Bible, taken on the same characteristics of Buddhist monks – slowed down the biological processes. But we just don't know."**

জিমারম্যানের লেখা থেকে আরও জানা যায়, হাডসন ওজনের দিক থেকে তাঁর সময়কার রেকর্ড-হোলডার টি. জে. ফ্যাট অ্যালবার্ট জ্যাকসনকে ছাড়িয়ে গেছেন (জ্যাকসন মিসিসিপির অধিবাসী, তাঁর ওজন ৪০৯ কিলোগ্র্যাম), কিন্তু মিনোকের রেকর্ড ভাঙতে পারেন নি : **"The all-time heaviest was the late John Brower Minnoch of Washington State, who tipped the scales at 636 kg."**

মেদ কমানোর জন্য নানারকম অস্ত্রোপচারের কথা শোনা যায়, যেমন— ইনটেষ্টিন্যাল বাইপাস সার্জারি, স্টম্যাক স্টেপলিং ইত্যাদি। কিন্তু এইসব অস্ত্রোপচারে বিপদ আছে। ইনটেষ্টিন্যাল বাইপাস সার্জারিতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে দেখা গেছে এবং স্টম্যাক স্টেপলিংয়ে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অস্ত্রোপচারের আগে লোকে সাধারণত অন্যান্য ব্যবস্থার আশ্রয় নেন। তার মধ্যে ডায়েটিং আর একসারসাইজই প্রধান।

অনেক জায়গায় চতুর ব্যবসায়ীরা মেদ কমানোর জন্য 'স্তনা বাথ' খুলে বসে আছে। 'স্তনা বাথ' আসলে 'স্টীম বাথ'। স্টীম বাথে প্রচুর ঘাম হয়, তাতে শরীর থেকে অনেক জল বেরিরে যায় এবং দেহের ওজন অবশ্যই কমে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য? শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যাবার পর জলপিপাসা পাবে, তখন জল খেতে হবে—এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার দেহের ওজন বেড়ে যাবে। সুতরাং স্যনা বাথে দেহের যে ওজন কমে তা বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না। অতএব দেহের মেদ কমানোর জন্য স্যনা বাথের আশ্রয় নেওয়া নিরর্থক।

মেদ কমানোর জন্য বিদেশের দেখাদেখি আমাদের দেশেও আজকাল জগিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কোনোদিন সকালে একবার যদি কলকাতার ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল অথবা লেক কিংবা ঐরকম কোনো মুক্ত জায়গায় যান তাহলে বেশ মজার মজার দৃশ্য দেখতে পাবেন: কতরকম চেহারার কতরকম বয়সের কতরকম লোক জগ করছেন, জোরে জোরে হাঁটছেন, দৌড়চ্ছেন। মেদ কমানোর কী 'অসাধারণ' প্রচেষ্টা তাঁদের। 'অসাধারণ' বলছি এই কারণে যে, মেদ কমানোর ব্যাপারে তাঁদের সবাইকে খুব একটা সিরিয়স মনে হয় না। শুধু এই প্রচেষ্টায় তাঁদের কতখানি মেদ কমে তাঁরাই জানেন। কারণ, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর তাঁদের অনেককে একইরকম দেখা যায়।

আসলে শুধু দৌড়লেই তো মেদ কমে না, মেদ কমানোর জন্য একসঙ্গে অনেকগুলি উপায় অবলম্বন করতে হয়। তাঁরা তা করেন বলে মনে হয় না।

তবে সকালে ওঠা ভালো, সকালে মুক্ত বাতাসে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করাও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

জগিং সম্বন্ধে বিদেশেও এখন ধারণা পালটাচ্ছে। একজন বৃটিশ মেদ কমানোর জন্য একের পর এক নানা পন্থা ধরে শেষে জগিং সম্বন্ধে বলছেন, **"I work in a company of joggers but most of them don't lose weight. It is good for the heart to work off that excess energy but it does have its drawbacks. One of our joggers damaged his knee and if you are old and overweight it is not a very convenient solution."**

তাঁর মতে কনভিনিয়েন্ট সল্যুশন হল, পাকস্থলীর মধ্যে একটা প্লাস্টিকের বেলুন পুরে পেটটাকে সব সময় 'ভরা' রাখা। এইভাবে পেট 'ভরা' থাকলে বেশি খাওয়া যাবে না এবং তাহলেই মেদ কমবে। এই সল্যুশনের আশ্রয় নিয়ে তিনি চারদিনে তিন কিলোগ্রাম মেদ কমিয়েছেন এবং চারমাসে পনের কিলোগ্রাম কমাতে পারবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন।

সল্যুশনটা তাঁর নিজের নয়, উইলিয়ম লার্কওয়ার্দি নামে একজন বৃটিশ

চিকিৎসকের। ডঃ লার্কওয়ার্দির টেকনিক হল, পাকস্থলীতে প্রথমে একটা বেলুন ঢুকিয়ে তারপর সেটাকে বাতাস দিয়ে ফোলানো। বেলুনটা ১৬ সপ্তাহ পেটের মধ্যে ঐরকম ফোলানো অবস্থায় থাকবে। তারপর বেলুনের ভিতরকার বাতাস বার করে দিয়ে সেটাকে ফরসেপের সাহায্যে বার করে আনা হবে। পেটের মধ্যে ফোলানো বেলুন থাকার দরুন খাদ্যের অনেকখানি জায়গা বেলুনটা নিয়ে নেবে, ফলে অল্প খেলে পেট ভরা মনে হবে। অর্থাৎ, অল্প খেয়েই ভরা পেটের আরাম পাওয়া যাবে। এতে লোকে অল্প খাবে এবং তাতে শরীরের মেদ কমবে। ডঃ লার্কওয়ার্দির মতে এই উপায়ে শরীরের ৪০ কিলোগ্র্যাম পর্যন্ত মেদ কমানো যেতে পারে।

ডঃ লার্কওয়ার্দি দুবাইয়ে 'লণ্ডন ক্লিনিক' নামে একটা ক্লিনিক খুলেছেন। সেখানে তিনি বেলুনের সাহায্যে মেদ কমানোর চিকিৎসা করেন। তিনি বলেন, "The beauty of the balloon is that it is a completely reversible procedure." অর্থাৎ, বেলুনের সাহায্যে রোগা হবার পর কেউ যদি আবার মোটা হতে চান তাহলে বেলুনটা বার করে দিয়ে আগের মতো চললেই হবে।

আবার, ডঃ এন কে পাণ্ডেয় নামে একজন অ্যামেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় প্লাষ্টিক সার্জন শরীরের মেদ কমানোর এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর পদ্ধতি হল, চামড়ার নিচেকার অতিরিক্ত চর্বি নিষ্কাশন করে আনা। এই পদ্ধতির নাম লাইপো-সাকশন। অ্যামেরিকায় এই পদ্ধতি এখন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ডঃ পাণ্ডেয় আইওয়া অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ডি ময়েনে মার্কিন বিমানবাহিনীর কমাণ্ড হাসপাতালের একজন বিশিষ্ট সার্জন। ঐ হাসপাতালে লাইপো-সাকশন অপারেশন করে তিনি বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। লাইপো-সাকশন পদ্ধতিতে নিতম্ব আর পাকস্থলীর অতিরিক্ত চর্বি বার করে আনা হয়। কয়েকটা জায়গায় লম্বায় তিন মিলিমিটারেরও কম চিরে শোষকযন্ত্রের সাহায্যে বাড়তি ফ্যাটি টিস্যু টেনে আনা হয়।

কিন্তু আহারের পরিমাণ না কমিয়ে এবং কায়িক পরিশ্রমের মাত্রা না বাড়িয়ে কেবল এই ধরনের চিকিৎসায় স্থায়ী সুফল পাওয়ার আশা বৃথা।

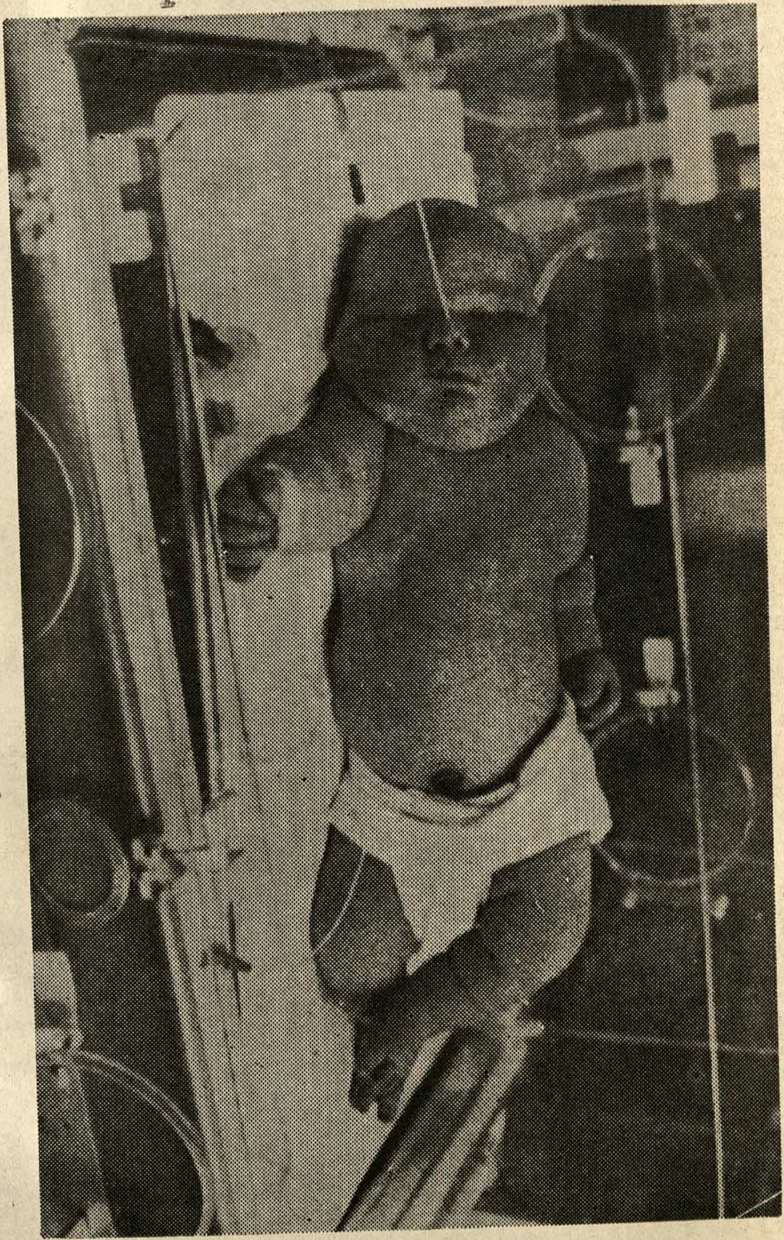
স্থায়ী সুফল পাওয়ার জন্য বহুমুখী চেষ্টা দরকার: "To lose weight effectively, scientifically and permanently, you must eat less, increase your activity and modify your behaviour." একথা



নিউইয়র্কের বাড়িতে বাঁদিকে পিটার কেফালাইড্‌স্‌ আর ডানদিকে মাইক পার্টিলেনো। তাঁদের মাঝখানে পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডিক গ্রেগরি। পিটারের বয়স ১৭ বছর, ওজন সাড়ে ২৫৯ কিলোগ্র্যাম; মাইকের বয়স ৩০ বছর, ওজন সাড়ে ৩৪৩ কিলোগ্র্যাম। ওজন কমাবার জন্য ডিক তাঁদের দুজনকে প্রথমে ৪০ দিন উপবাসে থাকতে বলেছেন।



মৃত সন্তান কোলে বাংলাদেশের এক মা। উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রতিদিন এইরকম ৪০,০০০ শিশুর মৃত্যু হয় — এবং এই মৃত্যুর অধিকাংশই খুব অল্প খরচেই নিবারণ করা যায়।



পোর্তুগালের এক প্রসূতিসদনে সদ্যোজাত এক শিশু। নাম রোজারিও পাওলো আলাভিস ডা সিলভা। জন্মের সময় তার ওজন ছিল ৭·৬১০ কিলোগ্র্যাম। স্মরণকালের মধ্যে গোটা পোর্তুগালে এত মোটা শিশু আর জন্মায়নি।



পুণের এক ব্যাঙ্ক অফিসার শরদ কুলকার্ণি আর তাঁর পত্নী সঞ্জোত ভারতের 'সর্ব্বোচ্চ' দম্পতি। শরদের উচ্চতা ৭ ফুট ২ ইঞ্চি, সঞ্জোতের ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। তাঁদের এই উচ্চতা সম্পূর্ণটির জন্য একথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

না জেনে বহু লোকই স্লিমিংয়ের দিকে ছোটেন এবং ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়ে পড়েন।

স্লিমিং এখন একটা বড়ো ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতুড়ে ডাক্তারবদ্যিরও অভাব নেই। স্লিমিং সম্বন্ধে প্রচুর বইপত্র বেরিয়েছে, নানা পত্রপত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধনিবন্ধ ছাপা হচ্ছে। কিন্তু এইসব বইপত্র আর প্রবন্ধনিবন্ধে যেসব কথা লেখা হচ্ছে তার অধিকাংশই ভুল তথ্যে কিংবা অর্ধসত্য অথবা অসম্পূর্ণ তথ্যে ভরা। এইসব তথ্যের উপর নির্ভর করা বিপজ্জনক। তবু অসংখ্য মানুষ নির্ভর করছে—এবং ঠকছে।

যাঁরা স্লিম হতে চান তাঁদের উপদেশ দেবার জন্য নানা পত্রপত্রিকা আর রেডিও-টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনদাতারা ওৎ পেতে বসে আছে। কিন্তু খবরদার, তাদের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। মনে রাখবেন, তারা ব্যবসা করতে নেমেছে, আপনার উপকার করতে নামে নি। তাদের কথায় ভুলে বিপদ ডেকে আনবেন না। স্লিমারদের জন্য আলাদা কোনো খাদ্য নেই। 'স্লিমার্স ডায়েট' বলে কিছু নেই। বিশেষজ্ঞরা যে খাদ্য খেতে বলেন তা হিসাব-করে-কমানো সাধারণ মানুষেরই খাদ্য। তাতে প্রয়োজনমতো সমস্ত রকম পুষ্টিই পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া নিজেরা খেয়ালখুশিমতো ডায়েটিং করলে তার ফল মারাত্মক হতে পারে। ১৯৮৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে দুবাইয়ের 'খালিজ টাইমস' পত্রিকায় একটা ভয়াবহ খবর বেরিয়েছিল—

The popular craze for slim figures through dieting can cause bulimia, an illness that often leads to suicide. This warning is given by a group of West German doctors and psychologists who have studied this illness suffered by women who force themselves to become slim. Women develop eating disorders due to the pressure created by the concept that slenderness means attractiveness and success.

The team, led by Dr Karl Martin Pirke of the Max-Planck-Institute for Psychiatry in Munich, has done research on the biological changes linked with bulimia.

The research has revealed malnutrition causes a malfunctioning of carrier substances in the brain responsible for the

chemical transmission of impulses between nerve cells. This can create a lack of serotonine, which on the one hand causes bulimia and on the other brings on depressive disorders.

রোগা হবার জন্য যে খাদ্যই খান না কেন, দেখতে হবে তাতে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম পুষ্টিই যেন থাকে। অর্থাৎ, 'স্বাভাবিক' খাদ্যের চেয়ে তার পার্থক্য যেন বেশি না হয়। যাঁরা কার্বোহাইড্রেট সহজে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারেন না অর্থাৎ যাঁদের শরীরে কার্বোহাইড্রেটের বেশির ভাগটাই চর্বি হয়ে জমে তাঁরা ফ্যাট ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য না কমিয়ে কার্বোহাইড্রেট-খাদ্য দারুণভাবে কমাতে পারেন। কার্বোহাইড্রেট কমাতে গিয়ে প্রথমেই চিনি কমাতে পারেন, এমন কি সম্পূর্ণ বাদও দিতে পারেন। কারণ, সাদা চিনি শুধুই কার্বোহাইড্রেট, সাদা চিনি থেকে ক্যালরি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু চাল গম আলু প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যে ক্যালরি ছাড়া পুষ্টিও পাওয়া যায়, যেমন—প্রোটিন, ভিটামিন ও বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য।

প্রথমেই বুঝতে হবে, ওবেসিটি বা মেদবাহুল্য প্রয়োজনাতিরিক্ত আহারের অনিবার্য ফল এবং স্লিম হওয়ার জন্য অর্থাৎ মেদহ্রাসের জন্য প্রথমেই দরকার আহারের পরিমাণ কমানো। কিন্তু কেবল খাদ্যের পরিমাণ কমিয়েই যদি মেদহ্রাসের চেষ্টা করা হয় তাহলে তাতে স্থায়ী ফল কিছু পাওয়া যাবে না। কারণ, কম খাওয়ার দরুন সব সময়েই কিছু-না-কিছু ক্ষুধা থাকবে। ফলে, লোকে বেশিদিন কম খেয়ে থাকতে পারবে না। কয়েকদিন পরেই আবার আগের মতো খাওয়া ধরবে এবং আবার মোটা হবে।

এই কারণেই অধিকাংশ বাজার-চলতি কাগজে যেসব 'স্লিমিং ডায়েট'-এর কথা বলা হয় এবং চোখ-ধাঁধানো মন-মাতানো বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাতে বিশেষ কাজ হয় না। তাই বিশেষজ্ঞরা অধিকাংশ 'স্লিমিং ডায়েট'-কে 'gimmicky and fashionable diet' বলেন। তাঁরা বলেন, "The very term 'slimming diet' is probably unfortunate because it suggests something artificial whereas, to be effective, slimming must involve a permanent change in everyday eating habits."

রোগা হবার জন্য বাজারে বেশ কিছু ওষুধও পাওয়া যায়। সেইসব ওষুধ হয় আহারেচ্ছা কমিয়ে দেয় নয়তো দেহ যে হারে খাদ্য ভাঙে সেই হারটা বাড়িয়ে দেয়। এইসব ওষুধের কিছু বিপদ আছে। সুতরাং না বুঝেসুঝে, ডাক্তারের

পরামর্শ না নিয়ে এই জাতীয় কোনো ওষুধই খাওয়া উচিত নয়।

শরীরে সব সময় প্রয়োজনমতো পুষ্টি দরকার। সেইজন্যই একবেলা না খেয়ে কি দুবেলা কম খেয়ে অথবা লোকের মুখে 'অমুক জিনিস খেলে মোটা হয়' শুনে দরকারী খাবার বাদ দেওয়া ঠিক নয়। অত্যধিক খাদ্যনিয়ন্ত্রণে বিপদ হতে পারে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ আর তত্ত্বাবধান ছাড়া কখনই খাদ্যের পরিমাণ ১০০০ ক্যালরির নিচে নামানো উচিত নয়।

রোগা হবার জন্য অনেকে সপ্তাহে একদিন উপোস করেন। এতে ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু উপকারও কিছু হয় না, কারণ উপোসের পরদিন লোকে সাধারণত বেশি খায়—এবং একদিন না খেয়ে পরের দিন বেশি খেলে ক্ষতিটা পূরণ হয়ে যায়। ফলে, লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে ফেলে।

অনেকের ধারণা, প্রচুর পরিমাণে ছোটো মাছ খেলে শরীরের মেদ কমে। ছোটো মাছ কেন, কোনো 'বিশেষ' খাদ্যেই শরীরের মেদ কমে না।

আবার, এমন কথাও শোনা যায় যে, লেবু খেলে মেদ কমে—লেবুর রস শরীরের চর্বি গলিয়ে দেয়। একথাও ঠিক নয়। কোনো খাদ্যই শরীরের চর্বি গলাতে পারে না—তা সে কঠিন খাদ্যই হোক কি তরল খাদ্য।

ক্যালরি যতখানি খরচ হয় তার চেয়ে কম খেয়ে শরীরের মেদ কমানো সম্ভব। বিকল্পে, ক্যালরির আয় না বাড়িয়ে শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা বেশি করে ক্যালরির ব্যয় বাড়িয়ে শরীরের মেদ কমানো যেতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত উপায়ে রোগা হওয়া কিছু কঠিন, কারণ বেশি পরিশ্রমে ক্ষুধাতৃষ্ণাও বেশি হয়, তাতে ক্যালরির আয় ব্যয়ের চেয়ে বেড়ে যায়। সুতরাং এই উপায়ে রোগা হওয়ার চেষ্টা করলে হিতের বদলে অহিত হতে পারে।

তার চেয়ে বরং প্রথম উপায়টাই ভালো। দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য শরীরের যা প্রয়োজন তার চেয়ে ৫০০ থেকে ১০০০ ক্যালরি কম শক্তি পাওয়া যায় এমন খাদ্য খেলেই মেদ ঝরতে শুরু করবে। খাদ্যে শক্তির যে অভাবটা থেকে যাবে সেটা পূরণ হবে দেহের অতিরিক্ত চর্বি থেকে শক্তি টেনে এনে। এমনি করে আস্তে আস্তে শরীরের চর্বি কমবে।

কিন্তু অনেকের পক্ষেই কম খাওয়াটা কঠিন। তার জন্য অনেকদিনের পুরনো অভ্যাস পালটাতে হয়, অথচ চট করে নতুন অভ্যাস গড়ে তোলা খুব সহজ নয়। তবে চেষ্টায় কী না হয়! কে কীভাবে চেষ্টা করবেন সেটা তিনি নিজেই ঠিক করে নেবেন। তবে চেষ্টাটা ধরিয়ে দেবার জন্য মোটামুটি একটা গাইড-

লাইন দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

১. খেতে বসে প্রথমেই এক কাপ স্যুপ বা ঐ জাতীয় জিনিস খেয়ে নেবেন। স্যুপের বদলে কোনো 'লো-ক্যালরি' পানীয়ও চলতে পারে। নিদেনপক্ষে, বিশুদ্ধ জল। এতে ক্ষুধা কিছু কমে যাবে।

২. ছোটো প্লেটে বা থালায় খাবার নেবেন এবং বাটি ব্যবহার না করার চেষ্টা করবেন। প্লেটে বা থালায় অল্প খাবার এমনভাবে সাজাবেন যেন অনেক খাবার বলে মনে হয়। অর্থাৎ, উঁচু উঁচু করে না সাজিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সাজাবেন। ইংল্যাণ্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এই উপায়ে কম খাওয়া অভ্যাস করেছেন বলে শুনেছি।

৩. যদি একা খেতে না বসে বাড়ির আর পাঁচজনের সঙ্গে খেতে বসেন তাহলে আর সবাই খেতে আরম্ভ করার পর আপনি খেতে শুরু করবেন—এবং আপনার খাওয়া হয়ে গেলেই অমনি উঠে যাবেন, গল্প করার জন্য বসে থাকবেন না। গল্প করতে বসলেই আপনার আবার কিছু খেতে ইচ্ছা করবে।

৪. মুখে অল্প খাবার নিয়ে আস্তে আস্তে অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবেন। তাতে হজম যেমন ভালো হবে তেমনি বেশি সময় ও বেশি পরিশ্রমের জন্য খাওয়ার পরিমাণও কিছু কমে যাবে।

৫. কয়েক গ্রাস অন্তর অন্তর একটুখানি করে স্যালাড খাবেন। তাতে স্যালাডের উপকারিতা যেমন পাবেন তেমনি আসল খাবার কম খেলেই চলবে।

৬. সাধারণত এমনসব খাবার বেশি নেবেন যা খেতে বেশি সময় লাগে, যেমন—কাঁটাওয়ালা মাছ, ডাঁটা, শাক, অল্প-সিদ্ধ তরিতরকারি ইত্যাদি। ফলে, বেশি খেতে পারবেন না।

৭. খাওয়ার সময় গল্প করবেন না, কাগজ পড়বেন না, রেডিও শুনবেন না, টেলিভিশন দেখবেন না। অর্থাৎ, মন অন্যদিকে নিবদ্ধ রেখে খাবেন না। খাওয়ার সময় কেবল খাওয়ার দিকেই মন থাকবে। অন্যদিকে মন গেলে বেশি খাওয়া হয়ে যাবে।

৮. নেমন্তন্ন-বাড়ি যাওয়ার আগে অল্প কিছু খেয়ে নেবেন, লো-ক্যালরি কিছু স্ন্যাকও খেতে পারেন। ক্ষিধে নিয়ে কখনও নেমন্তন্ন-বাড়ি যাবেন না এবং লোভনীয় খাদ্যে খুব হিসাব করে হাত দেবেন।

৯. পিঠে পায়েস মিষ্টি কেক পুডিং আইসক্রীম চকোলেট ইত্যাদি খেতে খুব ইচ্ছা হলে একেবারেই ছোঁবেন না একথা বলি না। ছুঁতে না পারলেই ভালো, কিন্তু অনেক সময় মনের প্রবল ইচ্ছা জোর করে দমন করা শরীরমনের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং মনে যদি খুব ইচ্ছা হয় তাহলে 'নিষেধাজ্ঞা' ভাঙার জন্যই একটুখানি মুখে তুলতে পারেন।

খাদ্যের ব্যাপারে সব সময়েই মনে রাখা দরকার, পরিমাণ কমানোটাই বড়ো কথা নয়; বেহিসাবীভাবে পরিমাণ কমালে শরীরে পুষ্টির পরিমাণ কমে গিয়ে অনেক সময় বিপদ ঘটতে পারে। খাদ্যের পরিমাণ কমাতে হবে হিসাব করে এবং অপ্রয়োজনীয় খাদ্য যতখানি সম্ভব বাদ দিতে হবে। এ ব্যাপারে সকলের ক্ষেত্রে এক নিয়ম নয়। জনে জনে পার্থক্য, গুরুত্ব অনুযায়ী প্রভেদ। রামের প্রেসক্রিপশন শ্যামের বেলায় না-ও খাটতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দরকার।

অনেকে শরীরের মেদ কমানোর জন্য ভাতের বদলে রুটি খান, আলু খান না, তেল ঘি মাখন ছোঁন না। তাঁরা ভুল করেন। তাঁদের যা দরকার তা হল ক্যালরির হিসাব করা—তা সে খাদ্য যা-ই হোক না কেন। কোন্ খাদ্যে ক্যালরি বেশি আর কোন্ খাদ্যে ক্যালরি কম সেটা জেনে নিয়ে তাঁরা যদি হিসাব করে পছন্দসই খাদ্য খান তাতে আপত্তির কিছু নেই।

তাঁদের জানা দরকার. যেসব খাদ্য বিশেষ পুষ্টিকর সেইসব খাদ্যের অধিকাংশেই বেশি ক্যালরি থাকে না, যেমন—ফল, শাকসবজি, চর্বিহীন মাংস, সমুদ্রের মাছ, ডিম, দুধ, চীজ ইত্যাদি। সেই কারণে যাঁরা নিয়ম মেনে পুষ্টিকর খাদ্য খান তাঁদের দেহে সাধারণত মেদ জমতে পারে না, তাঁরা মোটা হন না। পুষ্টিকর খাদ্যে স্বাস্থ্য ভালো হয়, ভালো স্বাস্থ্যে ভালো প্রাণশক্তি পাওয়া যায়—এবং ভালো প্রাণশক্তি মানুষকে কর্মপথে ঠেলে দেয়। তখন আলস্য করা যায় না, পরিশ্রম করতে হয়। তাতে ক্যালরি খরচ হয় এবং ক্যালরি খরচ হলে শরীরের মেদ কমে।

প্রথমেই বলেছি, মেদবাহুল্য প্রয়োজনাতিরিক্ত আহারের অনিবার্য পরিণতি এবং মেদহ্রাসের জন্য প্রথমেই দরকার আহারের পরিমাণ কমানো। কিন্তু কেবল আহারের পরিমাণ কমালেই স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। মেদহ্রাসের জন্য পরিমিত আহার ও শারীরিক পরিশ্রম দুই-ই দরকার। তবে পরিমিত আহারের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়। তার কারণ—আহারের পরিমাণ কমিয়ে অন্তত খাতায়-কলমে ৫০০ ক্যালরি কম শক্তি নেওয়া সহজ, কিন্তু দৈহিক শ্রম বাড়িয়ে ৫০০ ক্যালরি বেশি শক্তি খরচ করা কঠিন। আলস্য ছাড়াও আধুনিক

যন্ত্রসভ্যতাই প্রধানত তার জন্য দায়ী। তাছাড়া মোটা লোকদের পরিশ্রম করার ক্ষমতাও কম।

কিন্তু মোটা মানুষ হাঁটতে পারেন। হাঁটলে শক্তি খরচ হয়। এ নিয়ে বহু দেশে পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। হাঁটলে কী পরিমাণ শক্তি খরচ হয় তা অনেকগুলি ব্যাপারের উপর নির্ভর করে, তার মধ্যে হাঁটার দ্রুতি আর দেহের ওজন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিচে একটা তালিকা দেওয়া হল, এই তালিকা থেকে বার করা যাবে, কত ওজনের মানুষ কত জোরে হাঁটলে কী পরিমাণ শক্তি খরচ করতে পারবেন—তবে এই হিসাব সমতলভূমিতে হাঁটার। দ্রুতি দেওয়া হয়েছে মাইলের হিসাবে, প্রতি ঘণ্টায়; আর ওজন কিলোগ্র্যামে।

দ্রুতি	ওজন					
মাইল/ঘণ্টায়	৪৫কিলো	৫৫কিলো	৬৫কিলো	৭৫কিলো	৮৫কিলো	৯৫কিলো
২˙০	১৫০	১৮৫	২০০	২২৫	২৫০	২৭৫
২˙৫	১৮৫	২৫১	২৪০	২৭৫	৩০০	৩৩৫
৩˙০	২১৫	২৫০	২৮৫	৩১৫	৩৬০	৩৯০
৩˙৫	১৫০	২৯০	৩২৫	৩৬০	৪১০	৪৫০
৪˙০	২৮৫	৩২৫	৩৬৫	৪১৫	৪৬০	৫১০

এই অঙ্কগুলিকে ০˙০১৪৪ দিয়ে গুণ করলে প্রতি মিনিটে কত কিলোক্যালরি খরচ হয় তা জানা যাবে। যেমন, ৬৫ কিলোগ্র্যাম ওজনের একজন মানুষ ঘণ্টায় ৪ মাইল হিসাবে ৩০ মিনিট হাঁটলে ৩৬৫ × ৩০ × ০˙০১৪৪ = ১৫৭˙৬৮ অর্থাৎ প্রায় ১৫৮ কিলোক্যালরি শক্তি খরচ হয়। প্রায় ১৮ গ্র্যাম ফ্যাট থেকে এই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়—তা সে খাদ্যের স্নেহপদার্থও হতে পারে, আবার দেহের চর্বিও হতে পারে। তার মানে, কেউ যদি ঘণ্টায় ৪ মাইল হিসাবে ৩০ মিনিট হাঁটেন তাহলে তিনি তাঁর শরীরের ১৮ গ্র্যাম মেদ কমাতে পারেন।

মেদ কমানোর জন্য পরিমিত খাদ্য ছাড়াও ব্যায়াম দরকার। উপযুক্ত ব্যায়াম ছাড়া কেবল কম খাদ্যে মেদ কমানো যায় না। কিন্তু মেদভার যদি বেশি হয় তাহলে ব্যায়াম করাও সুসাধ্য হয় না। তখন আর-একটা নতুন বাধা এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সে বাধা অতিক্রম করতে মনের জোর আর ধৈর্য যেমন চাই তেমনি চাই কঠোর সঙ্কল্প। মাসের পর মাস, কখনও কখনও বছরের পর বছরও লেগে যেতে পারে অভীষ্ট ফল লাভ করতে। মেদ কমানোর জন্য

কোনো জাদুদণ্ড নেই কারও হাতে।

হাতুড়েদের হাতে পড়ে কিংবা বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে তাড়াতাড়ি মেদ কমাতে গেলে বিপদ হতে পারে। সব সময়েই দরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ।

মেদবাহুল্য রোধ করা যায় এবং দূরও করা যায় কেবল জীবনধারা পালটে। কেবল ওষুধ দিয়ে মেদবাহুল্যের চিকিৎসা অসম্ভব। কেবল ব্যায়াম করেও মেদ কমানো যায় না। আবার একবেলা না খেয়ে অথবা দুবেলা অল্প খেয়েও মেদ ঝরানো যায় না। 'Dietitians and doctors have no cure for obesity' —তবে কেউ যদি সত্যি সত্যিই মেদ হ্রাস করতে চান, ডায়েটিশিয়ান আর ডাক্তাররা তাঁকে খাদ্য আর ব্যায়াম সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়ে সেই পরামর্শ মেনে চলতে পারলেই ফললাভ সম্ভব।

শেষে একটা কথা মনে রাখা দরকার, মা-বাবা যদি প্রথম থেকেই সতর্ক হন তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের মেদবাহুল্য রোধ করা যায়। জন্মের পর শিশুর দেহে চামড়ার ঠিক নিচে অ্যাডিপোজ সেল অর্থাৎ স্নেহকোষ তৈরি হয়—এবং তার মধ্যে ফ্যাট জমে। মোটামুটি তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর দেহে স্নেহকোষ সংখ্যায় বাড়ে। তারপর আর বিশেষ বাড়ে না, প্রায় স্থির হয়ে যায়। সুতরাং তিন বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে খুব বেশি ফ্যাটযুক্ত খাদ্য খেতে দিতে নেই। এই সময় শিশুকে বেশি ফ্যাট খাওয়ালে তার শরীরে স্নেহকোষের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং তার ফলে শিশুর মোটা হবার সম্ভাবনাও বাড়বে। মা-বাবা যদি এই সময়টা শিশুর খাদ্যের দিকে বিশেষ নজর দেন এবং শিশুকে বেশি ফ্যাট না খাওয়ান তাহলে ভবিষ্যতে তার মোটা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমবে।

মা-বাবা নিজেরাই যদি মোটা হন এবং বংশে মেদবহুল লোক যদি বেশি থাকে তাহলে অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন। তখন বেশি করে শিশুর যত্ন নেওয়া দরকার। তিন বছর বয়স পর্যন্ত ফ্যাট জাতীয় খাদ্য অবশ্যই কম খাওয়াতে হবে এবং নিয়মিত শিশুর দেহের ওজন নিতে হবে। শরীরে স্নেহকোষের সংখ্যা যাতে বাড়তে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মোটকথা, শিশু পরে মোটা হবে কি হবে না তার বেশ খানিকটা নির্ভর করে মা-বাবার উপর। মা-বাবা যদি সন্তানকে নধরকান্তি দেখে উৎফুল্ল হবার জন্য গোড়া থেকেই বেশি করে ঘি মাখন ইত্যাদি ফ্যাট জাতীয় জিনিস খাওয়ান তাহলে শিশুকে পরে দুর্ভোগ ভুগতে হতে পারে। একবার শরীরে মোটা হবার বীজ ঢুকে গেলে পরে তাকে দমন করা কঠিন।

বার : কোষ্ঠবদ্ধতা

সমগ্র প্রাণিজগতে কেবল মানুষই কোষ্ঠবদ্ধতার শিকার। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগে বলে জানা যায় না।

কোষ্ঠবদ্ধতা আসলে মলত্যাগে বিলম্ব। মলত্যাগ একটা প্রতিবর্তী ক্রিয়া, ইংরেজীতে বলে রিফ্লেক্স অ্যাকশন। মলনালী যখন মলভারে স্ফীত হয়ে ওঠে তখনই এই ক্রিয়া উদ্দীপ্ত হয়। তবে তা মানুষের ইচ্ছাধীন। সময় ও পরিবেশ অনুকূল থাকলেই সাধারণত এই ক্রিয়া শুরু হয়। পাকস্থলীতে খাদ্য থাকলে পাকস্থলী ও মলাশয়ে তা প্রতিবর্তী ক্রিয়া ঘটায়, ফলে মলাশয়ে একটা আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের দরুন অনেক সময় মলনালীতে মল চলে আসে।

দিনের প্রথম আহারের পরই সাধারণত এই প্রতিবর্তী ক্রিয়া ঘটে। কারও কারও ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে জল অথবা অন্য কোনো তরল পদার্থ পড়লেই রিফ্লেক্স শুরু হয়। সেই কারণে সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে জল খেলে মলত্যাগের ইচ্ছা জাগে। এই একই কারণে অনেকে সকালে চা খাবার পর মলত্যাগের বেগ অনুভব করেন। অনেকের আবার প্রাতরাশের পরেই মলত্যাগের বেগ আসে, তার কারণ ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরিভাগে খাদ্য প্রবেশ করলে মলাশয়ে চাপ বৃদ্ধি পায় আর তখনই বেগ সৃষ্টি হয়। যাঁদের পেটের অসুখ আছে, এই কারণেই তাঁরা প্রতিবার আহারের পর পায়খানায় যান।

অধিকাংশ মানুষই দিনে একবার মলত্যাগ করেন। তবে কেউ কেউ দিনে দুবারও করে থাকেন। আবার, এমন মানুষও আছেন যাঁরা একদিন অন্তর কি দুদিন অন্তর মলত্যাগ করেন। সপ্তাহে একবার কি দুবার মলত্যাগ করেন এমন মানুষও দেখা যায়। তাঁদের কোনো রোগব্যাধি দেখা যায় না, তাঁরা কোনোরকম অস্বস্তিও বোধ করেন না। তাঁদের কোষ্ঠবদ্ধ বলা চলে না। মলত্যাগে বিলম্বের কারণে যখন শরীরে অস্বস্তি হয় এবং খাদ্য জীর্ণ হয় না অর্থাৎ বদহজম হয় তখনই তা কোষ্ঠবদ্ধতার পর্যায়ে পড়ে।

কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিকার না করলে মল জমে শক্ত হয়ে যায়। তখন জোর করে মলত্যাগ করতে গেলে মলদ্বারে চিড় সৃষ্টি হতে পারে, অর্শ দেখা দিতে পারে, মলনালীতে স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে অথবা ইঙ্গুইন্যাল হার্নিয়া হতে পারে।

যাঁদের করোনারি হার্ট ডিজিজ আছে তাঁরা যদি জোর দিয়ে মলত্যাগের চেষ্টা করেন তাহলে বিপদ ঘটতে পারে। অধিক মল জমে যাবার দরুন মলাশয় স্ফীত হলে একটা অস্বস্তি হতে পারে, মাথা ধরতে পারে এবং আরও কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তখন কৃত্রিম উপায়ে মলত্যাগের ব্যবস্থা করলে অবিলম্বে সমস্ত উপসর্গ দূর হয়।

অনেকের ধারণা, আমাদের বৃহদন্ত্র যাবতীয় রোগের বীজ ও বিষের আশয়, সুতরাং যেভাবেই হোক মলাশয় 'খালি' করতে হবে ও 'পরিষ্কার' রাখতে হবে—তা সে পার্গেটিভ বা এনিম্যা দিয়েই হোক কি বাওয়েল ওয়াশ করেই হোক। কিন্তু তাঁদের জানা দরকার, অন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে যেসব ব্যাকটিরিয়া থাকে, আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য তা থাকা দরকার। ঐসব ব্যাকটিরিয়া অন্ত্রের কাজে সহায়তা করে, ভিটামিন তৈরি করে এবং অন্যান্য রোগজীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে।

মলাশয় 'পরিষ্কার' রাখার জন্য যদি দিনের পর দিন বাওয়েল ওয়াশ করা হয় তাহলে শেষে দারুণ ক্ষতি হতে পারে। যাঁরা পার্গেটিভ, এনিম্যা বা বাওয়েল ওয়াশে অভ্যস্ত তাঁরা সাবধান। প্রকৃতি মলাশয়ের নিচের অংশ এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে যাতে খাদ্য পরিপাকের পর বর্জ্য জিনিসগুলি দেহ থেকে বেরিয়ে যাবার আগে সেখানে জমা হতে পারে। এতে অসুখ অস্বাস্থ্য হয় না। যে মানুষ বাইরের কোনোরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার অন্ত্রকে আপনা-আপনি কাজ করতে দেয় সে-ই সুখী।

পার্গেটিভ হিসাবে অনেকে ক্যাস্টর অয়েল খান। অনেকদিন ধরে নিয়মিত ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ার দরুন অনেক প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়েছে, কিন্তু কোষ্ঠ-বদ্ধতা সারে নি। পার্গেটিভে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আলসারেটিভ কোলাইটিসও হতে পারে। এনিম্যা বা বাওয়েল ওয়াশের অভ্যাস গড়ে উঠলে কোষ্ঠবদ্ধতা বেড়ে যেতে পারে, কারণ স্বাভাবিক রিফ্লেক্সকে তখন কাজ করতে দেওয়া হয় না। প্রয়োজনের অনুরোধে কখনও সখনও এনিম্যা ব্যবহার করলে তাতে তেমন ক্ষতি হয় না। বাওয়েল ওয়াশের বেলায়ও এই একই কথা।

প্রতিদিন সাধারণত ৭৫ গ্র্যাম থেকে ২০০ গ্র্যাম মল নির্গত হয়, তার মধ্যে জলের ভাগই ৫০ গ্র্যাম থেকে ১৭৫ গ্র্যাম। মলের বেশির ভাগটাই জল। মলের মধ্যেকার জলের পরিমাণ নির্ভর করে খাদ্যে কী পরিমাণ ফাইবার অর্থাৎ ছিবড়ে জাতীয় জিনিস আছে এবং সেই ছিবড়ে জাতীয় জিনিসের জলধারণের

ক্ষমতা কতখানি তার উপর। খাদ্যে ছিবড়ে জাতীয় জিনিসের পরিমাণ কম থাকলে কোষ্ঠবদ্ধতার সম্ভাবনা অধিক।

মলত্যাগের বেগ যদি বারংবার দমন করা হয় তাহলে রিফ্লেক্স মেকানিজমের ক্ষমতা কমে যায় এবং তখন কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। প্রয়োজনের সময় পায়খানা যদি খালি পাওয়া না যায়, পায়খানা যদি অপরিচ্ছন্ন হয় এবং যাতায়াতের যদি অসুবিধা থাকে তাহলেও এমন হতে পারে। শিশুরা সামান্য অছিলা পেলেই পায়খানায় যেতে চায় না। মা-বাবার দেখা কর্তব্য যাতে এমন না হয়। শিশুকাল থেকেই নিয়মিত পায়খানায় যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়।

আন্ত্রিক রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা আসতে পারে। আবার, মলাশয় ও মলনালীতে ক্যান্সার হলে কখনও কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। সেই কারণে মধ্যবয়স্ক ও পূর্ণবয়স্ক মানুষের যদি হঠাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বৃহদন্ত্র পরীক্ষা করানো দরকার। মানসিক গোলযোগের দরুন যখন একটা ডিপ্রেশন অর্থাৎ বিষণ্নতা আসে তখন কোষ্ঠকাঠিন্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো স্নায়ু-রোগে লাম্বার কর্ড অর্থাৎ কটিদেশের তন্ত্রীতে গোলমাল দেখা দিলে মলত্যাগের নির্দেশ আসে যে রিফ্লেক্স সেণ্টার বা প্রতিবর্তী কেন্দ্র থেকে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে।

গর্ভবতী নারী ও বৃদ্ধরা প্রায়শই কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগেন। তাঁদের কোষ্ঠ-বদ্ধতার কারণ স্পষ্ট করে জানা যায় না। যতদূর মনে হয়, গর্ভিণী নারীর মলাশয়ের উপর ভারী জরায়ুর চাপ পড়ে বলে মলনির্গমনে বিলম্ব ঘটে ; এবং বৃদ্ধদের মলাশয়ে নিউরোমাসকিউলার রিফ্লেক্সের সেন্সিটিভিটি হয়তো নষ্ট হয়ে যায় কিংবা মলনালীতে মল জমলেও বৃদ্ধরা হয়তো অনেক সময় তা বুঝতে পারেন না, সেই কারণে তাঁদের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়।

খাদ্যে ছিবড়ে জাতীয় জিনিস কম থাকলেও এক ধরনের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে।

কোষ্ঠবদ্ধতার অনেক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে খুব সাধারণ কারণ হল—

১. খাদ্যে তরল পদার্থের অভাব। আমাদের এই উষ্ণমণ্ডলীয় দেশে গ্রীষ্ম-কালে প্রচুর ঘাম হয়, তখন বেশি করে জল না খেলে মলাশয়ের জল তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। ফলে, মল যেমন শুকিয়ে কঠিন আকার ধারণ করে তেমনি মলের আয়তনও কমে যায়। তাতে ক্ষুদ্রান্ত্রে এমন

স্ফীতি আসতে পারে না যাতে মলত্যাগের জন্য একটা রিফ্লেক্স সৃষ্টি হতে পারে।

২. খাদ্যে ছিবড়ে জাতীয় জিনিসের অভাব। প্রয়োজনীয় সব খাদ্যের খালি নির্যাসটুকু খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। ইংরেজীতে যাকে **bulk** বলে, খাদ্যে সেটাও খুব দরকার। খাদ্যের আয়তন বাড়ে বেশি করে শাকপাতা আর তরিতরকারি খেলে। শাকপাতা আর তরিতরকারিতে এমন সব সেল্যুলোজ থাকে যা হজম হয় না, তাতে মলগঠনে সুবিধা হয়। সুতরাং যাঁরা পরিমাণে খুব কম খান অথবা শাকসবজি খেতে চান না তাঁদের কোষ্ঠবদ্ধতা অস্বাভাবিক কিছু না।

৩. খাদ্যে ভিটামিন-বি'র অভাব। খাদ্যে ভিটামিন-বি'র যদি অভাব ঘটে তাহলে অন্ত্রের দেওয়ালের মাংসপেশীর স্থিতিস্থাপকতা বা টান কমে যায়। তাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

৪. খাদ্যে পটাসিয়মের অভাব। খাদ্যে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাসিয়ম না থাকে অথবা পার্গেটিভ ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে শরীর থেকে যদি অত্যধিক পরিমাণে পটাসিয়ম বেরিয়ে যায় তাহলেও অন্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে।

৫. মলত্যাগে অনিয়ম। মলত্যাগে অনিয়ম ঘটলে অর্থাৎ বার বার মলত্যাগের বেগ দমন করলে রিফ্লেক্স মেকানিজম নষ্ট হয়ে গিয়ে কোষ্ঠবদ্ধতা সৃষ্টি করে, একথা আগেই বিশদভাবে বলা হয়েছে।

৬. পার্গেটিভ বা এনিম্যা। কৃত্রিম উপায়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার করার অভ্যাস কোনো সুস্থ অভ্যাস নয়। এই অভ্যাস একবার গড়ে উঠলে তখন নানারকম বিপদ। সবচেয়ে বড়ো বিপদ স্বাভাবিক রিফ্লেক্স নষ্ট হয়ে যায়। তখন আর ইচ্ছা করলেও স্বাভাবিকভাবে মলত্যাগ করা যায় না। পার্গেটিভ বা এনিম্যার অভ্যাসে কেবল স্বাভাবিক রিফ্লেক্সই নষ্ট হয় না, সেইসঙ্গে অন্ত্রের টোন অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকতাও নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে শিশুদের কোষ্ঠ 'পরিষ্কার' রাখার জন্য সপ্তাহে একবার ক্যাস্টর অয়েল অথবা অন্য কোনো রেচক পদার্থ খাওয়ান। তাতে শিশুর অন্ত্রের মাংসপেশীর ক্ষতি হয় এবং শেষে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় আর সেই কোষ্ঠবদ্ধতা সারা জীবন ধরে চলে। সুস্থ স্বাভাবিক শিশুকে কখনই রুটিনমাফিক পার্গেটিভ দেওয়া উচিত নয়।

কোষ্ঠবদ্ধতার এই ৬টি সাধারণ কারণ ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে। খুব বেশি ঝালমসলা দেওয়া খাবার খেলে, মনের উপর অত্যধিক চাপ পড়লে, মানসিক অশান্তি থাকলে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দিতে পারে। আমাদের মলাশয়ে আমাদের মনের ভাব-আবেগের প্রতিবিম্ব পড়ে। মানসিক চাপে মলাশয়ে একটা স্প্যাজ্‌ম্‌ অর্থাৎ মাংসপেশীর আক্ষেপ সৃষ্টি হয়—আর তখনই যত গণ্ডগোল।

স্বাভাবিক মলত্যাগের ব্যাপারটা নির্ভর করে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম আর খাদ্যের রকমের উপর। অটোনমিক বলতে স্বায়ত্ত অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাধীন। যেহেতু অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম আপনা থেকেই কাজ করে তাই ওষুধবিষুধ দিয়ে তার কাজে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য বাজারে অনেক রকম ওষুধ পাওয়া যায়। সেইসব ল্যাক্সেটিভ বা রেচক পদার্থের ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত নয়। দীর্ঘদিন এই জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের ফলে মলের সঙ্গে শরীর থেকে অত্যধিক পরিমাণে পটাসিয়ম, সোডিয়ম ও জল বেরিয়ে যেতে পারে এবং তাতে শরীরের ক্ষতি হতে পারে। তেমন দরকার হলে স্বল্পকালের জন্য মৃদু রেচক ব্যবহার করলে ক্ষতির সম্ভাবনা কম।

ইসবগুল আসলে এক ধরনের সেল্যুলোজ। মানুষের আন্ত্রিক রসে সেল্যুলোজ হজম হয় না, কিন্তু গবাদি পশু অতি সহজেই সেল্যুলোজ হজম করতে ও দেহের নানাবিধ কাজে লাগাতে পারে। গবাদি পশুর প্রধান খাদ্যই হল সেল্যুলোজ—খড় বিচালি ঘাস ভুসি ইত্যাদি।

ইসবগুলের ভুসি তার ওজনের ২৫ গুণেরও বেশি জল শোষণ করতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতায় ইসবগুলের ভুসির বহুলপ্রয়োগ, কারণ এই ভুসি প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করে বিশাল আয়তন লাভ করে। তার ফলে আন্ত্রিক পেশীতে একটা আন্দোলন শুরু হয়, তাকে বলে ইন্টেষ্টিন্যাল পেরিস্ট্যালসিস। এই ইন্টেষ্টিন্যাল পেরিস্ট্যালসিসের দরুন মলনির্গমন সহজ হয়।

ইসবগুলের প্রয়োগে কোষ্ঠবদ্ধতার চিকিৎসা অনেকটাই সুচিকিৎসা। এতে পার্গেটিভ বা রেচক পদার্থ দিয়ে অন্ত্রকে উত্তেজিত করতে হয় না। একে বলা যায় 'physiological way of treating constipation.'

কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার সবচেয়ে ভালো উপায় খাদ্যে ছিবড়ে জাতীয় জিনিসের পরিমাণ বাড়ানো এবং নিয়মিত একই সময়ে পায়খানায় গিয়ে বসা—তা সে মল নির্গত হোক বা না হোক।

আটার ভুসি কখনও চেলে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। ভারতের বহু অঞ্চলে মুগ মসুর প্রভৃতি অনেক ডাল খোসাসুদ্ধ গোটাই রান্না করা হয়, তাতে অনেক ছিবড়ে পাওয়া যায়। তরিতরকারি শাকপাতা আর ফলপাকড় নিয়মিত খাওয়া উচিত। খোসাসুদ্ধ খাওয়া যায় এমনসব তরিতরকারি আর ফলপাকড় বেশি করে খাওয়া উচিত, যেমন বাঁধাকপি ফুলকপি ঢেঁড়স শসা গাজর পেয়ারা আপেল কুল খেজুর। কমলালেবুর ছিবড়ে ফেলে না দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলা উচিত।

সবচেয়ে বড়ো কথা হল ছিবড়ের জলধারণক্ষমতা। কমলালেবু আপেল গাজর আর বাঁধাকপি বর্গের ফল আর তরিতরকারির ছিবড়ের জলধারণক্ষমতা অনেক বেশি। সুতরাং শাকপাতা আর তরিতরকারি ছাড়াও রোজ গোটা দুয়েক এই জাতীয় ফল খাওয়া ভালো। অনেক কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর ক্ষেত্রে পাকা কলা মৃদু রেচক হিসাবে কাজ করে। অনেক সময় পাকা পেয়ারায়ও কাজ হতে দেখা যায়।

শিশুরা যাতে রোজ নিয়মিত একই সময়ে পায়খানায় যায় তা দেখা মা-বাবার অবশ্য কর্তব্য। বড়োরা কখনও আলস্যের কারণে, কখনও তাড়াহুড়োর জন্য আবার কখনও পছন্দসই জায়গা না পাওয়ার দরুন পায়খানায় যাওয়ার অভ্যাসটা নষ্ট করে ফেলেন। একবার রিফ্লেক্স নষ্ট হয়ে গেলে তা উদ্ধার করা কঠিন। তার জন্য কিছু ধৈর্যের দরকার। মল নির্গত হোক বা না হোক, প্রতিদিন একই সময়ে পায়খানায় গিয়ে বসা উচিত এবং কোনোরকম তাড়াহুড়ো না করে, জোর না দিয়ে মলত্যাগের চেষ্টা করা দরকার। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ক্লান্তি অবসাদ প্রভৃতি ছাড়াও কাজের ধরনে পরিবর্তনের দরুন মলনির্গমন ব্যাহত হতে পারে। অনেক সময় কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য বেশি করে জল খেতে ও শারীরিক পরিশ্রম করতে বলা হয়; দুটোই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার পক্ষে কতখানি ভালো, জোর দিয়ে বলা যায় না।

ফ্যাট যেমন পিত্তনির্গমনে সাহায্য করে তেমনি অন্ত্রের ভিতরটা পিছলও করে দেয়। রোগা লোকেরা একটু বেশি ঘি মাখন তেল খেয়ে দেখতে পারেন। তবে ভাজা খাবার না খাওয়াই উচিত।

মনে রাখা দরকার, কোষ্ঠবদ্ধতা কোনো একটা উপায়ে দূর করা যায় না। কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য একসঙ্গে অনেকগুলি ব্যবস্থা নিতে হয়। তবে নিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাসই প্রথম ব্যবস্থা। সকালে খালি পেটে বড়ো এক গেলাস জল খেয়ে শক্ত বিছানায় পবনমুক্তাসন করে পায়খানায়

যাবেন—তা সে পায়খানা হোক বা না হোক। তখন যদি পায়খানা না হয় পরে যখন পায়খানা পাবে তখন আবার যাবেন। কয়েকদিন অভ্যাস করলেই সকালে পায়খানা হবে।

পবনমুক্তাসন করার জন্য মোটা শতরঞ্জি, কম্বল বা পাতলা তোষকের উপর চিৎ হয়ে শোবেন। মাথায় বালিশ থাকবে না। শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রেখে প্রথমে ডান পা হাঁটু থেকে মুড়ে দু হাত দিয়ে হাঁটু টেনে পেট ও বুকের সঙ্গে চেপে ধরবেন। পেটে চাপ পড়বে। যদি দেখেন তেমন চাপ পড়ছে না তাহলে প্রথম প্রথম পেটের উপর পাতলা একটা বালিশ দিয়ে নেবেন। কিছুদিন পরে বালিশ ছাড়াই পেটে চাপ পড়বে, তখন বালিশ ছাড়াই করবেন। হাঁটু জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে ডান হাতের তালু বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর এবং বাঁ হাতের তালু ডান হাতের কনুইয়ের উপর রেখে হাঁটু টেনে নামাবেন। যদি এক হাতের তালু দিয়ে অপর হাতের কনুই ধরা সম্ভব না হয় তাহলে এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে ধরবেন। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে মনে মনে ১০ গুনবেন অর্থাৎ হাঁটুটা ১০ সেকেণ্ড পেটের উপর চেপে রাখবেন। তারপর হাঁটু ছেড়ে দিয়ে পা সোজা করে ঠিক আগের মতো বাঁ হাঁটু ধরবেন। আবার মনে মনে ১০ গুনবেন। তারপর বাঁ হাঁটু ছেড়ে দিয়ে পা সোজা করবেন। এবার ঐ আগেরই মতো দু হাঁটু একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে পেটে চাপ দেবেন আর মনে মনে ১০ গুনবেন। তারপর দু হাঁটুই ছেড়ে দিয়ে দু পা সোজা রেখে শবাসনে বিশ্রাম নেবেন—১০ সেকেণ্ড অর্থাৎ মনে মনে ১০ গুনতে যতক্ষণ সময় লাগে। এই হল একবার। এইরকম তিনবার করবেন। প্রতিবারই ১০ সেকেণ্ড করে শবাসনে বিশ্রাম নিবেন। শ্বাসপ্রশ্বাস সব সময়েই স্বাভাবিক থাকবে, কখনও কোনোরকম টান থাকবে না।

দশ সেকেণ্ড থেকে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ৩০ সেকেণ্ড আসন করবেন। যতক্ষণ আসন করবেন ততক্ষণ শবাসনে বিশ্রাম নেবেন—১০ সেকেণ্ডে ১০ সেকেণ্ড, ১৫ সেকেণ্ডে ১৫ সেকেণ্ড এইভাবে।

পবনমুক্তাসন কেবল পেটে বায়ুর পক্ষেই ভালো নয়, অম্বল অজীর্ণ আমাশয় কোষ্ঠবদ্ধতা অক্ষুধা পায়ে-বাত হাঁপানি ডায়াবিটিজ কোলাইটিস ও লিভারের অসুখেও উপকারী।

শবাসন করারও নিয়ম আছে। কেবল শুয়ে থাকলেই শবাসন হয় না। শব মানে মড়া, মড়ার মতো শুয়ে থাকতে হবে, একেবারে নিঃসাড় হয়ে। প্রথমে

চিৎ হয়ে শুয়ে পা দুটি লম্বা করে ছড়িয়ে দিন। মাথায় কিন্তু বালিশ থাকবে না। পা দুটি ৩০ ডিগ্রি কোণে এবং হাত দুটি শরীর থেকে প্রায় ১৫ ডিগ্রি কোণে রাখুন। দু হাতের মুঠি অর্ধেক বন্ধ থাকবে। দাঁতের পাটি থাকবে ঈষৎ আলগা—মুখ কিন্তু বন্ধ। এইবার পায়ের দিক থেকে আস্তে আস্তে ওজন ছাড়তে ছাড়তে উপরের দিকে ঐ ভাবটা ছড়িয়ে দিন। এই সময় শরীরটা ক্রমশ ভারী মনে হবে। শরীরে কোনো সাড় থাকবে না। সারা শরীর অবশ মনে হবে। এখন কেউ যদি একটা হাত ধরে খানিকটা তুলে ছেড়ে দেয় তাহলে ধপাস করে মাটিতে পড়ে যাবে, মড়ার হাত যেমন পড়ে। অর্থাৎ, আপনি মড়ার মতো শুয়ে থাকবেন। মড়ার মনে যেমন ভালোমন্দ কোনো চিন্তাভাবনা থাকে না তেমনি এই সময় আপনার মনেও থাকবে না। মনটা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকবে—অচঞ্চল। খুব শক্ত ব্যাপার। দেখবেন, এই সময়েই যত চিন্তা মনে এসে ভিড় করছে। চেষ্টা করলে আস্তে আস্তে এটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। মনে রাখবেন, দেহটাকে শুধু নিঃসাড় করাই শেষ কথা নয়, মনটাকে নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ অচঞ্চলও করতে হবে—নইলে সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া যাবে না। শবাসনের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ রাখবেন না। শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকবে। এই সময় ঘুম আসতে পারে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেন না।

তের : পেটে বায়ু

পেটে বায়ু বলতে পাকস্থলীতে বা অন্ত্রে যে দূষিত বায়ু জন্মায় তা-ই। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশেই এই অসুখ বেশি দেখা যায়। পাকস্থলীতে খাদ্যাবশেষ বেশি থাকলে, বেশি মসলা দেওয়া খাবার খেলে, অধিক আঁশযুক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যের পরিমাণ বেশি হলে এবং অন্ত্রে প্যারাসাইট অর্থাৎ পরাশ্রয়ী জীবাণুর আধিক্য ঘটলেই সাধারণত এই অসুখ হয়। দুভাবে এই বায়ু বা গ্যাস পেট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে—মুখ দিয়ে ঢেকুরের আকারে এবং মলদ্বার দিয়ে বাতকর্মের ফলে।

পাকস্থলীতে গ্যাস যেমন জন্মায় তেমনি বাইরে থেকেও আসে। বাইরে থেকে আসে বাতাস শোষণ করার অথবা গেলার ফলে এবং গ্যাস-আছে এমনসব খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে। খাদ্য পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে প্রবেশের দ্বারে বাধা পেলে পাকস্থলীতে তা গেঁজে গিয়ে গ্যাস জন্মায়।

আমরা সকলেই আমাদের অজান্তে খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে কিছু-না-কিছু বাতাস গিলে ফেলি। অজ্ঞানতা বা অনবধানতার জন্য নানাভাবে আমাদের অত্যধিক পরিমাণে বাতাস গেলা হয়ে যায়। সপসপ শব্দ করে তাড়াতাড়ি খাবার খেলে পেটে অনেক বাতাস ঢোকে, আবার চা কফি ইত্যাদি হিস্‌হিস শব্দ করে টেনে খেলে কিংবা ঢক ঢক করে জল অথবা অন্য কোনো পানীয় গলাধঃকরণ করলেও পেটে অনেক বাতাস যায়। অনবরত পান চিবোনোর ফলেও কিছু বাতাস ঢোকে, বিড়ি সিগারেট ইত্যাদিতে সুখটান দেবার ফলেও বেশ বাতাস ঢোকে। বোতলে কোল্ডড্রিঙ্কের মধ্যে অনেক গ্যাস থাকে, স্ট্র দিয়ে কোল্ড-ড্রিঙ্ক শরবৎ ইত্যাদি টেনে খেলে পেটে আরও বেশি বাতাস যায়।

খাবার পর ঢেকুর তোলা পরিতৃপ্তির লক্ষণ। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, ঢেকুর তুললে বাতাস যেমন বেরিয়ে যায় তেমনি ভিতরে ঢোকেও।

পাকস্থলীতে খাদ্য যাবার মোটামুটি তিনঘণ্টা পরে সাধারণত পাকস্থলী খালি হয়ে যায়। কিন্তু পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে প্রবেশের পথে খাদ্য যদি বাধা পায় তাহলে পাকস্থলীতে তার মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। তখন খাদ্য গেঁজে গিয়ে গ্যাস সৃষ্টি করে। অন্ত্রের গ্যাসে থাকে হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন ডাই-অকসাইড আর নাইট্রোজেন। অনেকের নিশ্বাসে অস্বাভাবিক রকম দুর্গন্ধ বার হয়, তাকে বলে

হ্যালিটোসিস। অন্ত্রে পরিশোষণ হবার পর ফুসফুসের সাহায্যে যে গ্যাস বার হয় তাতেই এই দুর্গন্ধ থাকে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রেখে হ্যালিটোসিস দূর করা যেতে পারে।

আগেই বলেছি, আমাদের অজান্তে আমরা অনেক বাতাস গিলে ফেলি। বাতাসের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেন পাকস্থলীতে শোষিত হয় না এবং পাকস্থলী থেকে এই নাইট্রোজেন যদি বার করা না যায় তাহলে তা ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়ে সীক্যাম অর্থাৎ বদ্ধনালীতে গিয়ে পৌছয়, তারপর আধঘণ্টার মধ্যে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়।

অন্ত্রের ভিতর শতকরা প্রায় ২০ ভাগ গ্যাস আসে রক্ত থেকে। রক্তপ্রবাহ থেকে অন্ত্রের ভিতর গ্যাসের পরিব্যাপণ ঘটে।

মলাশয়ে অনেক ব্যাকটিরিয়া থাকে। ভাত রুটি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য, ডাল এবং অধিক সেলুলোজ যুক্ত শাকসবজি যদি কিছু অপরিশোষিত অবস্থায় মলাশয়ে অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেইসব ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় তা গেঁজে ওঠে, তার ফলে কার্বন ডাই-অকসাইড, মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি গ্যাস উৎপন্ন হয়।

আবার, অপাচ্য প্রোটিন মলাশয়ে এসে অবায়ুজীবী ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় পচে হাইড্রোজেন সালফাইড আর অ্যামোনিয়া সৃষ্টি করে। ডালে আর শিম বরবটি বীন মূলো প্রভৃতিতে একটা অ্যান্টিট্রিপটিক জিনিস থাকে, তার দরুন পরিপাক বিঘ্নিত হয়। ডাল ভালো করে সিদ্ধ করলে ঐ জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায়। তখন হজম হয়। অসিদ্ধ ডাল বেশি খেলে বায়ুর প্রকোপ বাড়ে।

ভাজা খাবার সহজে হজম হতে চায় না। অপাচ্য কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন মলাশয়ে গিয়ে ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় গ্যাস সৃষ্টি করে।

খুব বেশি পরিমাণে কড়া পার্গেটিভ বা রেচক পদার্থ খেলে অন্ত্রে একটা গতিবেগ সৃষ্টি হয় এবং সেই গতিবেগ অপাচ্য খাদ্য ঠেলে মলাশয়ে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে খাদ্য গেঁজে ওঠে এবং পচে। তাতে গ্যাস উৎপন্ন হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে মলাশয়ে বেশি মল জমে গেলে ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা-বৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের ক্রিয়া বেড়ে যায়। ফলে, বায়ুর প্রকোপ বাড়ে। পার্গেটিভ বা ল্যাকসেটিভে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয় না, বরং দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেই কারণে এইসব রেচক ব্যবহার না করে সঠিক খাদ্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত। তাতে কোষ্ঠবদ্ধতা আর বায়ুর প্রকোপ দুয়েরই উপশম হবে।

বায়ুর প্রকোপ নিবারণ করা দুঃসাধ্য কিছু নয়। তার জন্য কঠিন পরিশ্রম করার দরকার হয় না। যা করা দরকার তা হল—

১. পেটে যাতে বেশি বাতাস না ঢোকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি হড়বড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস থাকলে ছাড়তে হবে। সপসপ করে দ্রুত খাওয়া বন্ধ করতে হবে। চা কফি ইত্যাদি শব্দ করে সোস টেনে খাওয়া চলবে না। ঢেকুর না তুললেই ভালো হয়, যদি তুলতেই হয় তাহলে মুখ যতখানি সম্ভব কম খুলে, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে এবং চিবুক উঁচু না করে ঢেকুর তুলতে হবে। খাওয়ার সময় বেশি কথা বলা চলবে না। আমাদের যে একসময় খাওয়ার সময় কথা বলা নিষেধ ছিল তার পিছনে কারণ ছিল। ইংরেজরা বা অ্যামেরিকানরা খাবার টেবিলে অনেকক্ষণ ধরে যে গল্প করে তার কারণ, জীবনসংগ্রামে বাড়ির সকলকেই সকাল থেকে রেসের ঘোড়ার মতো ছুটতে হয়। রাত্রে খাবার টেবিলে ছাড়া তাদের দেখা হয় না। তাই তখনই তাদের যত কাজের আর অকাজের কথা। খাওয়ার সময় তাদের কথা না বলে উপায় নেই। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা ভিন্ন, আমরা কেন অকারণে তাদের অনুকরণ করব?

২. খাবার খেতে হবে আস্তে আস্তে এবং চিবিয়ে চিবিয়ে। খাবার ভালো করে না চিবোলে ভালো হজম হতে পারে না।

৩. পেপটিক আলসার জাতীয় রোগ থাকলে অবিলম্বে চিকিৎসা করিয়ে সারাতে হবে। অ্যামিবা বা জিয়ার্ডিয়ার উৎপাত থাকলে তা দূর করতে হবে।

৪. ডাল ও শিম বরবটি বীন জাতীয় খাদ্যে যে গ্যাস হয়, অ্যান্টিবায়োটিক আর ব্যাকটিরিওস্ট্যাটিক এজেন্টের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়া কমিয়ে সেই গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করা যেতে পারে।

৫. কোষ্ঠবদ্ধতা রেচক প্রভৃতি পদার্থ দিয়ে নয়, খাদ্য দিয়ে দূর করতে হবে। যেসব খাদ্যে বায়ু হয় সেইসব খাদ্য বাদ দিতে হবে।

৬. মোটা লোকেরা প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার করলে প্রায়শ তাঁদের পেটে বায়ু হতে দেখা যায়। তাঁদের খাদ্যে মোট ক্যালরির পরিমাণ কমাতে হবে। তাতে বায়ুর প্রকোপ যেমন কমবে তেমনি শরীরের মেদও হ্রাস পাবে।

৭. বায়ুতে যদি দুর্গন্ধ থাকে তাহলে বুঝতে হবে, প্রোটিনের পচনের ফলেই সম্ভবত সেই দুর্গন্ধ। তখন খাদ্যে মাংস ডিম ইত্যাদির পরিমাণ যতখানি সম্ভব কমাতে হবে। ডাল বাদ দিতে হবে। ভাত আর আলু কম খেতে হবে। বাঁধাকপির মতো আঁশযুক্ত তরিতরকারি বন্ধ করতে হবে।

৮. ভাজা জিনিস খাওয়া চলবে না।

৯. ভেজিটেবল স্যালাড, শুকনো ফল, বাদাম, আচার চাটনি কাসুন্দি জাতীয় জিনিস ও পাঁপর খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

১০. অত্যধিক মসলা দেওয়া খাবারও বন্ধ। মসলা হিসাবে হলুদ ও রসুন ব্যবহার করা ভালো। মলাশয়ে ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি রোধে হলুদ ও রসুনের একটা ভূমিকা আছে এবং মলাশয়ে ব্যাকটিরিয়া কমাতে পারলে পেটে বায়ুর প্রকোপও কমবে। ভাত খাওয়ার ঠিক আগে দু-তিন কোয়া কাঁচা রসুন খোসা ছাড়িয়েই অমনি সঙ্গে সঙ্গে চিবিয়ে খেলে কাজ হয়। বাজারে ক্যাপস্যুলে যে রসুনের নির্যাস পাওয়া যায় তাতে আশানুরূপ কাজ হয় না।

১১. দুধ খেলে যাঁদের পেটে বায়ু হয় তাঁরা দই খেতে পারেন। দইয়ে ঠাণ্ডা লাগে বলে যে ধারণা আছে তা ভুল। দইয়ে ঠাণ্ডা লাগে না।

১২. চিনি এবং চিনি দেওয়া জিনিস যতখানি সম্ভব কম খেতে হবে। সারা দিনেরাতে দু চামচের বেশি চিনি নয়। রসের মিষ্টি একেবারেই নয়।

১৩. রোজ ৮ থেকে ১০ গেলাস জল বা জলীয় জিনিস খেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা সহজ হয়, তাতে পেটে বায়ু প্রশমিত হয়। তবে গেলাস উঁচু করে গলায় ঢেলে ঢক ঢক করে গিলে খাবেন না। স্ট্র দিয়ে টেনেও না। জল মিনিট ২০ ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে খেতে পারলে ভালো হয়।

১৪. দিনেরাতে দুবার আহার না করে সেই পরিমাণ আহার তিন-চারবারে ভাগ করে খেতে হবে। রাত্রের খাবার হবে হালকা এবং শোবার অন্তত দু ঘণ্টা আগে সেই খাবার খেতে হবে।

১৫. পেটের আয়তন যদি বড়ো হয় এবং পেট ঝুলন্ত হয় তবে পেটে বায়ু হয়। ব্যায়াম করে পেটের এই অস্বাভাবিকতা দূর করা যায়।

১৬. পেটে বায়ু নিবারণের সবচেয়ে ভালো উপায় ব্যায়াম করা—তা সে ডাম্বেল বারবেল নিয়েই হোক কি খেলাধুলা করে অথবা যোগাসন করে।

যোগাসনে পেটের বায়ু সহজেই দূর হয়। আগের দিন বিকেলে এক গেলাস জলে এক চামচ কাঁচা মৌরি, এক ইঞ্চি মতো একখণ্ড চিরতা (কাঠি ফুল পাতা যা-ই হোক) আর একটুকরো মিছরি ভিজিয়ে রাখবেন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জলটা ছেঁকে নিয়ে খালি পেটে খাবেন। তারপর পবনমুক্তাসন করবেন, সঙ্গে শবাসন—যেমন আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

চোদ্দ : চুল পাকা ও চুল ওঠা

অ্যান্টিয়া বলেছেন, "Fame and fortune await any person who can prevent greying of hair." খুব সত্যি কথা। যদি কেউ চুল পাকা বন্ধ করার উপায় বার করতে পারেন তাহলে রাতারাতি তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে যাবেন এবং আর-কিছু না করেই সারা জীবন টাকার গদিতে শুয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখতে পারবেন।

সুতরাং পঞ্জিকায় কিংবা কাগজে 'পাকা চুল কাঁচা করে' বিজ্ঞাপন দেখে কোনো ওষুধবিষুধ অথবা তেল কদাচ কিনবেন না। মনে রাখবেন, পাকা চুল কাঁচা করার কোনো উপায় এখনও পর্যন্ত বার হয় নি।

চুল পাকা বন্ধ করা নিয়ে অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে। জন্তুজানোয়ারের উপর যেমন হয়েছে, মানুষের উপরও তেমনি হয়েছে। কিন্তু, অ্যান্টিয়ার কথাই উদ্ধৃত করে বলি, "The anti-grey fur factor for the rat was pantothenic acid but even large doses over a prolonged period have failed to affect human hair. It is not certain that greying in adult humans is even caused by dietary deficiency."

শেষের কথাটায় পরিষ্কার, চুল পাকার কারণ অসম খাদ্য একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। অর্থাৎ, খাদ্যের সঙ্গে মানুষের চুল পাকার সম্পর্ক আছে এমন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি।

বি-ভিটামিন নিয়ে আলোচনার সময় বলা হয়েছে, প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অ্যাসিডকে একটি অতিপ্রয়োজনীয় বি-ভিটামিন বলা হয়। এই ভিটামিন প্রথমে anti-gray-hair vitamin অর্থাৎ চুল-পাকা বন্ধ করার ভিটামিন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, কারণ এই ভিটামিনের অভাবে কালো রঙের প্রাণীর গায়ের লোম সাদা হয়ে যেতে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের চুল-পাকা বন্ধে কিংবা পাকা চুল কাঁচা করায় এই ভিটামিনের কোনো ভূমিকা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

চুল পাকার মতো চুল ওঠাও আজকাল একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে।

বি-ভিটামিন নিয়ে আলোচনার সময় বলা হয়েছে, ইনোসিটল নামে একটি বি-ভিটামিন আছে। মেটে, ঈস্ট, গমের অঙ্কুর, গমের আটার রুটি, ভুট্টা আর অপরিশোধিত গুড়ে এই ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, এই ভিটামিনের অভাবে যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, একজিমা হয়, চোখে গণ্ডগোল হয় তেমনি মাথার চুলও উঠে যায়। পুরুষের মাথায় টাক হবার একটা কারণ সম্ভবত খাদ্যে ইনোসিটলের অভাব। অ্যাডেল ডেভিস একসময় বেশকিছু টাক-মাথা পুরুষকে অন্যান্য বি-ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্যের সঙ্গে ইনোসিটলও খেতে দেন। কিছুদিন পরে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই চুল-ওঠা বন্ধ হয়েছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে নতুন করে চুল গজাতেও দেখা গেছে।

চুল সম্বন্ধে প্রথমেই জানা দরকার, একজন মানুষের মাথায় সাধারণত এক লক্ষের উপর চুল থাকে এবং স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিদিন ৫০টা থেকে ১০০টা চুল উঠে যায়। চুল যেমন ওঠে তেমনি আবার গজায়ও। সুতরাং চুল উঠতে দেখলেই অমনি চিন্তিত হবার কিছু নেই।

কিন্তু যখন বেশি ওঠে তখনই চিন্তার কারণ ঘটে। চুল ওঠার অনেক কারণই থাকতে পারে। অন্যতম প্রধান কারণ, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, বিশেষ করে থাইরয়েড গ্রন্থি। এছাড়া ধুলোবালি আর কলকারখানার তেলকালিও একটা কারণ। প্রতিদিন নানারকম ধুলোবালি আর কলকারখানার তেলকালি বাতাসের সঙ্গে উড়ে এসে চুলে মেশে। তার সঙ্গে মেশে মাথার ঘাম। তারপর মাথায় জোরে জোরে ঘস ঘস করে তেল মেখে স্নান করলে চুলের গোড়া আলগা হয়ে যেতে পারে এবং সেবোরিক ডার্মাটাইটিস অর্থাৎ মরামাস হতে পারে। তাতে চুল উঠে যেতে পারে।

আবার, মানসিক অশান্তি, পেটের গণ্ডগোল, শারীরিক দুর্বলতা, লোহা তামা সালফার ক্যালসিয়ম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ, প্রোটিন এবং ভিটামিনের অভাবেও চুল উঠে যেতে পারে। এছাড়া মেয়েদের নিজস্ব কিছু রোগের জন্যও চুল উঠতে পারে।

চুল ওঠার সঙ্গে খাদ্যের যে একটা সম্পর্ক আছে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের খাদ্যে অত্যাবশ্যক প্রোটিন আর লোহার অভাব বেশি তাদেরই চুল ওঠে বেশি। পরীক্ষায় এ-ও দেখা গেছে যে, সুষম খাদ্যে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। সুষম খাদ্য খাওয়ার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই চুল পড়া বন্ধ হয়েছে এমন নজিরও আছে।

চুল সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট ত্বকবিশেষজ্ঞ বলেছেন, **"Take care of it while you've got it—and forget about it when it's gone."**

কিন্তু বাস্তবে এর উলটোটাই দেখা যায়। চুল যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কেউ বড়ো একটা যত্ন নেন না, উঠে যেতে শুরু করলেই টনক নড়ে। কিন্তু তখন আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। তবু অনেকে হাল ছাড়েন না। লোশন টনিক ওষুধবিষুধ ফার্টিলাইজার—এইরকম কত কী-র আশ্রয় নেন। তাতেও যখন কাজ হয় না তখন পাকা-চুল 'কাঁচা' করতে কলপ আর টাক মাথা ঢাকতে উইগ অর্থাৎ পরচুলার শরণ নেন। তার মানে ব্যবসাদারদের হাতে পড়েন।

১৯৮৯ সালের ৮ মে টোকিও থেকে ডি-পি-এ নামক সংবাদ সংস্থা একটা মজার খবর পাঠিয়েছিল—

There are no balding men in Japan, at least that's the impression gained by many first-time visitors to the Land of the Rising Sun.

The Japanese men and especially those in responsible positions take care to present a youthful, dynamic image which includes having a full head of black, well-cut hair. But appearances can be deceptive. Japan's leading Shiseid Cosmetic discovered in a recent survey that 16 million Japanese are battling baldness or have already lost the struggle.

A third of them regularly smear their remaining hair with a variety of waters, tonics, pastes and powder mixtures and the turnover of such products has doubled in the past 10 years to an annual 50 billion yen (around $378 million). According to the firm's research, receding hairlines are likely to remain big business and they expect a further doubling of sales in the next five years.

শুধু জাপানে নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ এই অবস্থা। আমাদের দেশেও। কিন্তু ঐ ত্বকবিশেষজ্ঞের কথাটা মনে রাখলে এই অবস্থা হয়তো অনেকটাই ঠেকানো যায়। সুতরাং চুল উঠে যাবার আগেই চুলের যত্ন নেবেন—

১. চুলের গোড়া সব সময় পরিষ্কার রাখবেন। রোজ ৮ থেকে ১০ মিনিট মাথায় ম্যাসাজ করবেন। এখানে বলা প্রয়োজন, ভালো হেয়ার লোশন কিংবা তেল যতখানি-না দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি দরকার ম্যাসাজ। চুলে জট থাকলে প্রথমে তা ছাড়িয়ে মোটা দাঁড়ার চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নেবেন, তারপর চুল ফাঁক করে আস্তে আস্তে মাথায় ম্যাসাজ করবেন।

২. আগে বলা হত, চুলে তেল মাখার তেমন দরকার নেই; কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, সপ্তাহে দু-তিনদিন চুলের গোড়ায় খাঁটি নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল সামান্য গরম করে আস্তে আস্তে মালিশ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। স্নানের আগে নয়, স্নানের পরেই এই মালিশ দরকার—ভালো করে চুলের গোড়া জলে ধুয়ে পরিষ্কার করার পর।

৩. সপ্তাহে অন্তত একদিন মাথা পরিষ্কার করবেন। বেসন, রিঠে, শ্যাম্পু, সাবান যা ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। শ্যাম্পু ব্যবহার করলে দামী ভালো শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন আর সাবান ব্যবহার করলে গায়ে-মাখা সফ্‌ট্ সোপ। কাপড় কাচা সাবান বা সোডা কদাচ মাথায় ঠেকাবেন না।

৪. অনেকে বলেন, মাঝে মাঝে মাথায় পাতিলেবুর রস মাখা ভালো। আয়ুর্বেদিক মতে ভৃঙ্গরাজ পাতার রস বা কেশুতের রস মাথায় মাখলে ও চিরতার জল দিয়ে মাথা ধুলে চুল-ওঠায় উপকার পাওয়া যায়।

৫. মহিলারা তিন-চারমাস অন্তর চুলের ডগা আধ ইঞ্চি পরিমাণ ছেঁটে দেবেন। চুলের ডগা ফাটা থাকলে বাড়তে অসুবিধা হয়। ফাটা চুলের ডগা কেটে দিলে চুল সহজে বাড়তে পারে।

৬. রাত্রে শোবার আগে মহিলারা নিয়মিত ভাল করে চুল আঁচড়ে গোড়াটা একটু ঢিলা করে বিনুনি বেঁধে শোবেন। খুব আঁট করে চুলের গোড়া বেঁধে শোবেন না।

৭. ভালো করে চুল ভিজিয়ে রোজ স্নান করবেন। মহিলারা ভিজে চুল বেঁধে রাখবেন না। চুল ভালো করে শুকিয়ে তারপর বাঁধবেন।

৮. মনে রাখবেন, চুল ভিজে অবস্থায় ভঙ্গুর থাকে। তাই সাবান শ্যাম্পু বেসন রিঠে যা দিয়েই মাথা ঘষুন না কেন, জোরে জোরে ঘষবেন না; আবার, মাথা মোছার সময় তোয়ালে বা গামছা দিয়ে জোরে জোরে ঘষে মুছবেন না।

৯. চুলে হাওয়া লাগাবেন। সকালের নরম রোদ আট-দশ মিনিট চুলে লাগানো ভালো।

১০. অপরের চিরুনি বা ব্রাশ ব্যবহার করবেন না। চিরুনি বা ব্রাশ নিয়মিত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবেন।

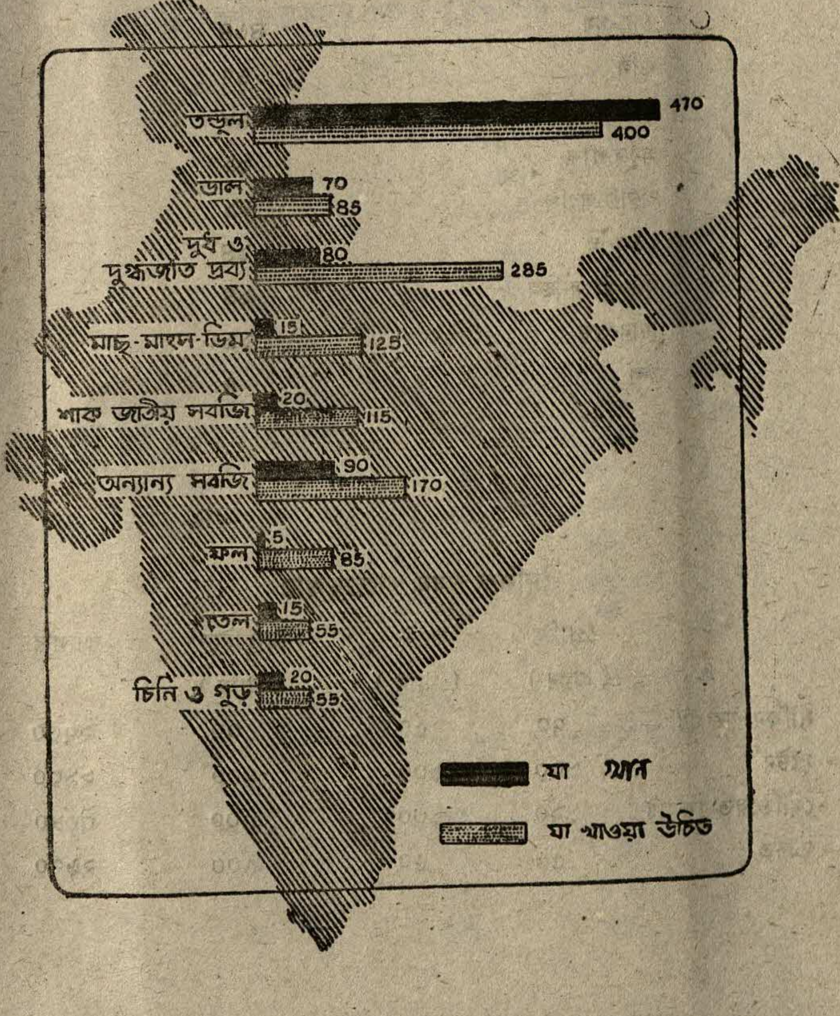
১১. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য আর শাকসবজি ও ফলমূল একটু বেশি করেই খাবেন। বইয়ের শেষে চার্টে দেখে নেবেন, কিসে প্রোটিন লোহা তামা গন্ধক ক্যালসিয়ম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য আছে এবং বেছে বেছে সেগুলি বেশি খাবেন। বি-ভিটামিন ইনোসিটল কিসে কিসে আছে, এই অধ্যায়ের গোড়াতেই বলা হয়েছে। তা-ও খাবেন। ভাজা জিনিস বেশি খাবেন না।

১২. যোগব্যায়াম-বিশারদরা বলেন, যোগাসনেও উপকার পাওয়া যায়—বজ্রাসন, শশঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন ও শীর্ষাসনে। বজ্রাসন সকলেই করতে পারেন, কিন্তু শশঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন ও শীর্ষাসন কখনই উপযুক্ত শিক্ষকের পরামর্শ ছাড়া করবেন না।

বজ্রাসন করার জন্য প্রথমে 'নীল ডাউন' হোন। তারপর হাঁটু ভেঙে পায়ের পাতা মুড়ে গোড়ালি ছুটো ফাঁক করে তার উপর পাছা রেখে বসুন। হাঁটু ছুটো পাশাপাশি জোড়া থাকবে। শিরদাঁড়া সোজা থাকবে। ছু হাত ছু হাঁটুর উপর থাকবে। এইবার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে মনে মনে আস্তে আস্তে এক ছুই করে তিরিশ পর্যন্ত গুনুন। অর্থাৎ, তিরিশ সেকেণ্ড আপনাকে ঐভাবে বসে থাকতে হবে। তিরিশ সেকেণ্ড পর শবাসনে তিরিশ সেকেণ্ড বিশ্রাম নেবেন। এইরকম তিনবার করবেন। অর্থাৎ, তিনবার তিরিশ সেকেণ্ড করে ঐভাবে বসবেন এবং প্রতিবার ঐভাবে বসার পর তিরিশ সেকেণ্ড করে শবাসনে বিশ্রাম নেবেন। তিরিশ সেকেণ্ডেই আটকে থাকবেন না, তিরিশ সেকেণ্ড দিয়ে আরম্ভ করবেন, তারপর ক্রমশ সময় বাড়িয়ে ছু মিনিট করবেন। মনে রাখবেন, যতক্ষণ আসন করবেন, মানে ঐভাবে বসে থাকবেন, ঠিক ততক্ষণই শবাসনে বিশ্রাম নেবেন। অর্থাৎ, এক মিনিট বজ্রাসন করলে এক মিনিট শবাসন, দেড় মিনিট বজ্রাসন করলে দেড় মিনিট শবাসন, ছু মিনিট বজ্রাসন করলে ছু মিনিট শবাসন। শবাসনের নিয়ম কোষ্ঠবদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনার শেষে বলা হয়েছে।

পরিশিষ্ট—২

ভারতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সাধারণত যা খান, গ্র্যাম হিসাবে



সূত্র : Diet Atlas of India, Nutrition Research Laboratory, Hyderabad, 1964

ভারতে একজন সাধারণ মানুষ গড়ে দৈনিক যা খান

	(গ্র্যাম)
চাল-গম	৪৬৪
ডাল	৬৭
দুধ	৭৮
সবুজ শাক	১৯
অন্যান্য সবজি	৮৯
তেল-ঘি	১৪
মাছ-মাংস-ডিম	১৪
চিনি-গুড়	১৯
ফল	৫

দৈনিক সুষম খাদ্যের হার

	প্রোটিন (গ্র্যাম)	ফ্যাট (গ্র্যাম)	কার্বোহাইড্রেট (গ্র্যাম)	ক্যালরি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৭০	৫০	৫০০	২৭৩০
বৃটেন	১০০	১০০	৪০০	২৯০০
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র	১২০	১০০	৫০০	৩৩৮০
ভারত	৫৫	৫০	৫০০	২৬৭০

কোন্ খাদ্যে কত ক্যালরি

১ গ্র্যাম	প্রোটিনে	৪ ক্যালরি
১ গ্র্যাম	ফ্যাটে	৯ ক্যালরি
১ গ্র্যাম	কার্বোহাইড্রেটে	৪ ক্যালরি

stine

on

gus

system

uble

uice

ion

প্রথায় ও প্রেশার কুকারে রান্নায় পুষ্টিমূল্যের তারতম্য, *

প্রোটিন

প্রচলিত প্রথায়	প্রেশার কুকারে
৯৪	৯৩
১০০	১২০
৯৮	১০০
৯৯	৯৯
৯২	৯৯

মোট খনিজ		ক্যালসিয়ম	
প্রচলিত প্রথায়	প্রেশার কুকারে	প্রচলিত প্রথায়	প্রেশার কুকারে
৭৯	১০০	৪৪	৮২
১০০	৮৩	৮৫	১০০
৯০	৯৮	৭৫	৯২
১১০	৮৯	—	৮৮
৮৭	৯৬	—	—

ভিটামিন-বি$_1$ (থায়ামিন)		ভিটামিন-বি
প্রচলিত প্রথায়	প্রেশার কুকারে	প্রচলিত প্রথা
৬৬	৬৬	৭৮
১০৭	৫৩	১০০
৬৯	৯৭	৮৩
—	৫৮	১০৬
৬৭	৯৬	—

প্যাসরিচা, Journal of Indian Dietetic Association, Vol. I,

কৈশিক—c

কোষ—cell

কৌষিক—cellular

ক্ষার—alkali

…ization

পরিব্যাপণ—diffusion

পরিরক্ষণ—conservation

পরিশোধিত—refined

ভারত

তকরা হিসাবে

	ফ্যাট	
	প্রচলিত প্রথায়	প্রেশার কুকারে
চা	২৫	২৫
ডা	১০০	৯৬
দুধ	১০০	১০০
সব	৮১	৯১
অ	১০৫	৯৮

	ফসফরস		লোহা	
	প্রচলিত প্রথায়	প্রেশার কুকারে	প্রচলিত প্রথায়	প্রেশার কুকারে
ত	৫৭	৮৪	৯২	৮৯
ম	৮৬	১০০	৫৬	১৩
চি	৬৭	৬৫	৩৬২	৩৮৮
ফ	—	৮৯	—	—
	১০৩	১০২	৭১	৭১

	(রিবোফ্লেবিন)	নায়াসিন	
	প্রেশার কুকারে	প্রচলিত প্রথায়	প্রেশার কুকারে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮৫	৫০	৯৫
বৃটেন	১০৩	—	৬৯
সোভিয়েত যুক্তর	৯৮	৭৭	৭৪
ভারত	৮৪	৯০	১১৯
	—	৬৮	৫৭

No. 1, December 1963

১ গ্রাম ফ্যাটে ৯ ক্যালরি

১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটে ৪ ক্যালরি

পরিভাষা

অগ্ন্যাশয়—pancreas
অজৈব—inorganic
অণু—molecule
অতিবেগুনী—ultraviolet
অদ্রবণীয়—insoluble
অধিবিষ—toxin
অনাময়ব্যবস্থা—sanitation
অনুঘটক—catalyst
অনৈচ্ছিক পেশী—involuntary muscle
অন্ত্র—intestine/bowel
অপজাতিক—degenerative
অপরিপৃক্ত—unsaturated
অপরিবাহী—non-conductor
অবদ্রব—emulsion
অবায়ুজীবী—anaerobic
অম্লধর্মী—acidic
অসংপৃক্ত—unsaturated
অস্থিমজ্জা—bone marrow
আক্ষেপ—convulsion
আচ্ছন্নতা—coma
আত্তীকরণ—assimilation
আয়ন—ion
আয়নিত—ionized
আহারেচ্ছা—appetite
উদ্বর্তন—survival
উদ্বায়ী—volatile
উদাসীন—neutral
উপজাত—by-product
উষ্ণতা—temperature
এক-সংপৃক্ত—monosaturated
কলা—tissue
কৈশিক—capillary
কোষ—cell
কৌষিক—cellular
ক্ষার—alkali
ক্ষুদ্রান্ত্র—small intestine
খনিজ—mineral
গাঁজন—fermentation
গ্রন্থি—gland
গ্রহণী—duodenum
গ্রাসনালী—oesophagus
ঘিলু—brain
ঘ্রাণতন্ত্র—olfactory system
জড়ধী—idiot
জড়িমা—lethargy
জরায়ু—uterus
জলদ্রাব্য water soluble
জারক-রস—gastric juice
জীর্ণসংস্কার—repair
জীবাণু—microbe
জৈব—organic
ঝিল্লী—membrane
ডিম্বাণু—ovum
ডিম্বাণুনির্গমন—ovulation
ডিম্বাশয়—ovary
দহন—combustion
দ্রবণীয়—soluble
দ্রবীভূত—dissolved
দ্রাবক—solvent
দ্রাব্য—soluble
দ্রুতি—speed
নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র—ileum
নিরুদন—dehydration
নিষিক্ত—fertilized
পরিপাক—digestion
পরিপৃক্ত—saturated
পরিবাহক—conductor
পরিব্যবহার—utilization
পরিব্যাপণ—diffusion
পরিরক্ষণ—conservation
পরিশোধিত—refined

পরিশোষণ—absorption
পাকমণ্ড—chyme
পাকস্থলী—stomach
পাচকতন্ত্র—digestive system
পাচক-রস—gastric juice
পায়ু—anus
পারিবেশিক—environmental
পিত্ত—bile
পিত্তকোষ – gall-bladder
পিত্তনালী—bile-duct
পিত্তলবণ—bile-salt
পিত্তাশয় – gall-bladder
পেশী—muscle
পোষণ—nourishment
পৌষ্টিক নালী—alimentary canal
প্রতিবর্তী কেন্দ্র—reflex centre
প্রতিবর্তী ক্রিয়া—reflex action
প্রতিস্থাপন – replacement
প্রদাহ—inflammation
প্রাণরাসায়নিক—biochemical
প্লীহা—spleen
বদ্ধনালী—caecum
বন্ধনী—ligament
বর্জ্য—waste
বহুলীভবন—multiplication
বহু-সংপৃক্ত—polysaturated
বংশগতি—heredity
বায়ুরোধী—air-tight
বিক্রিয়ক—reactor
বিক্রিয়া—reaction (chemical)
বিচলন—movement
বিপাক—metabolism
বিশোষণ—absorption
বৃহদন্ত্র—large intestine
ভেদ্যতা—permeability
মলনালী—rectum
মলাশয়—colon
মিথোজীবী—symbiotic
মূত্রস্থলী—urinary bladder
যকৃৎ—liver
যন্ত্রশক্তি—mechanical energy
যৌগ—compound
রক্তবাহ—blood vessel
রক্তরস—plasma
রক্তাল্পতা—anaemia
রন্ধ্রবহুল—porous
রেচক—purgative
লসিকা—lymph
লসিকানালী—lymphatic vessel
শক্তি—energy
শর্করা—sugar
শারীরবিজ্ঞানী—physiologist
শারীরবৃত্ত—physiology
শারীরস্থান – anatomy
শ্বসন—respiration
শ্বেতসার—starch
শ্রোণীচক্র—pelvis
শ্লেষ্মা—mucous
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী—mucous membrane
সংজ্ঞাবহ—sensory
সংপৃক্ত—saturated
সংবেদন – sensation
সংযোজক-কলা—connective tissue
সংশ্লেষণ—synthesis
সন্ধি—joint
সরন্ধ্র—porous
সালোকসংশ্লেষ—photosynthesis
সুবহ—portable
সোপকর্ম—active
স্থিতিস্থাপকতা—elasticity
স্নেহদ্রব্য—fat
স্বাদকুঁড়ি—taste bud

যেসব গ্রন্থ থেকে বেশি সাহায্য পেয়েছি

Adelle Davis, Let's Eat Right To Keep Fit

R. Passmore : M. A. Eastwood, (Davidson and Passmore) Human Nutrition and Dietetics

F. P. Antia, Clinical Dietetics and Nutrition

Gordon G. Birch : Michael Spencer : Allan G. Cameron, Food Science

Magnus Pyke, Man and Food

F. E. Deatherage, Food For Life

W. R. Aykroyd, Food For Man

Miriam E. Lowenberg : E. Neige Todhunter : Eva D. Wilson : Moira C. Feeney : Jane R. Savage, Food & Man

Mary T. Dowd : Alberta Dent, Elements of Foods and Nutrition

P. R. Reddy, Food & Nutrition

Indian Council of Medical Research, report

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস, খাদ্য-বিজ্ঞান

কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, বাঙ্গালীর খাদ্য

রায়বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু, খাদ্য

কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য, পথ্যবিজ্ঞান

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, জীবের ক্রমবিকাশ

সমর রায়চৌধুরী, খাদ্য ও পথ্য

যোগী সঙ্ঘ (বনহুগলী, কলকাতা-৩৫): প্রকাশিত 'যোগদর্পণ' (দ্বাদশ বার্ষিক সংখ্যা —১৯৮৭-৮৮)

রবীন্দ্রপুরস্কার পাওয়ার অনেক আগে, বইটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন—

● লেখক বিজ্ঞানের কৃতবিদ্য ছাত্র। তিনি জানেন কীভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক চেতনা সাধারণ পাঠকের মনের দরজায় পৌঁছে দেওয়া যায়। এই বইটি যদি আমাদের রান্নাঘরের চেহারা কিছুমাত্রও পাল্টাতে পারে তবেই লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে। লেখক আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাঁচার জন্যই খাওয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। হৃতস্বাস্থ্য ও দুর্বলমস্তিষ্ক বাঙালির জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য এই বইটির নির্দেশ মেনে চলা দরকার।...আগ্রহী পাঠকপাঠিকা অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞান বইটিতে পাবেন।

—আরতি চন্দ

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

● বইটি সুখের আহার সম্বন্ধে নয়। ডঃ মজুমদার লিখেছেন, সুখাদ্য মানে শুধু স্বাদিষ্ঠ আহার নয়। শরীরের ওপর কী প্রতিক্রিয়া হয়, তাই দিয়ে সুখাদ্যের বিচার। বইটিতে খাদ্য বা আহার্যের গুন, পুষ্টি ও স্বাদের সঙ্গে তার যোগ, শরীরের রাসায়নিক গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি বিবিধ গুরুতর বিষয় সরল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। খাদ্যের বিজ্ঞান এবং ইতিহাস উভয় শাখাতেই লেখক প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন। তারই ফল খাদ্য সম্বন্ধে এই পূর্ণাঙ্গ বই। ডঃ মজুমদারের সুলিখিত বইটি নিঃসন্দেহে আদৃত হবে।

—প্রতাপ কুমার রায়

(যুগান্তর)

● এই বইয়ে আছে মানুষের দেহযন্ত্রের বিবরণ, খাদ্যের ইতিহাস ও প্রকার, কোন্ খাদ্যে কি কি গুন, কোন্ খাদ্য কিভাবে শরীরের কাজে লাগে আর কেমন করে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করে, এবং কোন্ খাদ্যের অভাবে কোন্ রোগ হয়। এককথায়, এই বই মানুষের খাদ্যাখাদ্যের এক পরিপূর্ণ ইতিবৃত্ত।...বিজ্ঞান-লেখক হিসাবে রমেন মজুমদার সুপরিচিত। পাঠকের চাহিদার কথা মনে রেখে তিনি এই বইটি যথেষ্ট পরিশ্রম করে লিখেছেন। বাংলায় এরকম বই বিশেষ নেই। লেখার ভাষা, শব্দনির্বাচন এবং অধ্যায়-সাজানোও প্রশংসনীয়।

—প্রদীপচন্দ্র বসু

(দেশ)

● পুষ্টিবিজ্ঞানের সমস্ত তথ্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। খাদ্য সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধিগ্রাহ্য করে নিরসনের চেষ্টা হয়েছে। ...খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান থেকে কীকরে শরীরগঠন হয়, পুষ্টির অভাবে কেন শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র ঠিকমত কাজ

করে না, পুষ্টির উপাদানগুলি শরীরে কী কী কাজ করে, কোন্ কোন্ খাদ্য থেকে আমরা পুষ্টি আহরণ করতে পারি—এ সমস্ত তথ্য এই গ্রন্থে আছে। ...অনেক কম খরচে সাধারণ খাদ্য থেকেও যে আমরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেতে পারি, লেখক সে সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। ...এই গ্রন্থ জনসাধারণ, স্কুলকলেজের শারীরবৃত্ত অধ্যয়নরত ছাত্র, এমন কি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদেরও পড়া বাঞ্ছনীয়। বাংলা ভাষায় পুষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ে এমন গ্রন্থ পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। এর বহুল প্রচার দেশের ও দশের মঙ্গল করবে।

—**ডাঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়**, এম. বি., এম. এস-সি., ডি. এস-সি., এফ.এ.এ.এ.এস., এফ. এন. এ., এফ. এ. এম. এস., অ্যামেরিকান ডায়াবিটিজ অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার, বীকানেরের সর্দার প্যাটেল মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক, এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
(আজকাল)

● খাদ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে আমাদের অবহেলা এতই বেড়ে চলেছে যে, সমগ্র পাঠক-সমাজের কাছে এমন একটি বই তুলে ধরার খুবই প্রয়োজন ছিল। লেখক বইটি গল্পের মত লিখে গেছেন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা ও বৈজ্ঞানিক তথ্য বাদ যায় নি।...খাদ্য যে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু, একথা তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। ...পুষ্টি, প্রাণ-রসায়ন ও শারীরবিদ্যার অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য তিনি সহজ ও সরলভাবে বুঝিয়েছেন। এর ওপর বারবার খ্যাতনামা পুষ্টিবিশারদদের 'কোটেশন' দিয়ে বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। খাদ্য ও পুষ্টির গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে অপুষ্টির প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী, সেকথাও তিনি বলেছেন বারবার।...বইটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজন যে সবচেয়ে বেশি, একথা জোর দিয়ে বলা। ডঃ রমেন মজুমদার বলেছেন, কোন দেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সে দেশের অগ্রগতির অবস্থা আন্দাজ করা যায়। এত বড় সত্য জোর গলায় আমরা কদাচিৎ বলি।

—**সুনীত মুখোপাধ্যায়**, এম. সি-এইচ. ই., এম. এন. এস. (কর্নেল), এ. এম. আই. ই., এ. এম. আই. আই. সি-এইচ. ই., যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক
(আকাশবাণী)

● ডঃ রমেন মজুমদারের 'সুখাসনে সুখাহার' বইটি পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। বইটি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। রসনাতৃপ্তিই আহারের মূলকথা নয়, খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে নানান কথা ডঃ মজুমদার এই বইটিতে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে পরিবেশন করেছেন। খাদ্যের উপাদান ও উপযোগিতা নিয়ে বাংলাভাষায় এই ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক বই নতুনত্বের দাবীদার। বইটির জন্য ডঃ মজুমদারকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

—**ডাঃ নীলাঞ্জনয়ন সারেঙ্গী** এম. ডি., পি-এইচ. ডি., কলকাতার বাঙ্গুর ইন্সটিটিউট অভ নিউরোলজি এবং ইন্সটিটিউট অভ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ-এর নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

● বাঙলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারটা বহুদিনের হলেও আড়ষ্টতা, কৃত্রিমতা ও দুরূহতা থেকে খুব কম লেখকই মুক্ত হতে পেরেছেন। ফলে, জনমানসে অধিকাংশ লেখারই খুব একটা প্রভাব পড়ে নি, অধিকাংশ লেখাই মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজনে লাগে নি। এদিক দিয়ে ডঃ রমেন মজুমদার এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। সাহিত্যরসে অভিসিঞ্চিত অতি সুখপাঠ্য তাঁর লেখা। সহজ, সাবলীল, ঝরঝরে প্রাঞ্জল ভাষা। কোথাও হোঁচট খেতে হয় না, বেগ পেতে হয় না। পাঠকপাঠিকাকে আকর্ষণ করে রাখে সব সময় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শেখায়। পুস্তকটিতে খাদ্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানকে একসঙ্গে গ্রথিত দেখতে পাই। লেখক শুরু থেকে শেষ অবধি কৌতূহল ও জ্ঞানতৃষ্ণা জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হন অদ্ভুত মুন্সিয়ানার সঙ্গে তাঁর অননুকরণীয় কায়দায়। বিজ্ঞানে এই ধরনের স্বাদু পুস্তক বাঙলাভাষার গর্বের সামগ্রী। আরও গুণ,—নিষ্ঠা ও শ্রমস্বীকার। কী কঠোর পরিশ্রম করেছেন গ্রন্থকার যুক্তি ও বুদ্ধি সাজিয়ে প্রতিটি বিষয় ব্যাখ্যা করার সময়। এত বড় বইয়ে বিজ্ঞানবিচ্যুতি নেই এতটুকুও। লেখক জানা অজানা ঝুড়ি ঝুড়ি নানা জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করেছেন, সাজিয়েছেন, তুলে ধরেছেন পাঠক-পাঠিকার সামনে—এবং রচনার প্রসাদগুণে সবই হয়েছে রমণীয় ও উপভোগ্য। বস্তুত, সমাজবিজ্ঞানের প্রাঙ্গণে এটি একটি বিস্তৃত নিরলস উপকারী গবেষণার উৎকৃষ্ট ফসল।... চিকিৎসাবিজ্ঞানী, স্বাস্থ্যকর্মী ও সমাজবিজ্ঞানীর কাছে তো বটেই, আজকের দিনে প্রতিটি ঘরে, বিশেষ করে গৃহলক্ষ্মীর কাছে বইটির মূল্য অপরিসীম বলে বিবেচিত হবে। বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রচলিত মানসিকতা বদলে অল্প আয়াসে বেশি পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য যে করায়ত্ত করা সম্ভব, সেইদিকে স্পষ্ট অঙুলি নির্দেশ করে ডঃ মজুমদার একটা গুরুকর্তব্য পালন করেছেন। পুষ্টি সংক্রান্ত যেসব বই বাঙলাভাষায় চোখে পড়ে, তার মধ্যে 'সুখাসনে সুখাহার'

সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বসাধারণের জন্য বিদেশী ভাষায় লেখা অনেক বইয়ের মধ্যেও অগ্রগণ্য।...এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ রচনা করার জন্য ডঃ মজুমদারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

—**ডাঃ অমিয়কুমার হাটি**, এম. বি. বি. এস., পি-এইচ. ডি., কলকাতার স্কুল অভ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে মেডিক্যাল এন্টোমোলজি বিভাগের অধ্যাপক এবং
প্যারাসাইটোলজি প্রভাগের চেয়ারম্যান

● খাদ্যের ব্যাপারে সাধারণ জনের নানা চিরন্তন জিজ্ঞাসার উত্তর ডঃ রমেন মজুমদারের 'সুখাসনে সুখাহার'।...মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে ডঃ মজুমদার সুষম, পুষ্টিকর, চিত্তাকর্ষক, সুপাচ্য ও স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করেছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে। তাঁর 'সুখাসনে সুখাহার' দৈনন্দিন চিকিৎসা-বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় একটি তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য পুস্তক, যার ভাষা গতিশীল ও আবেদনময়। স্বাস্থ্য-রক্ষায় ও সাধারণ রোগপ্রতিরোধে খাদ্যেরও যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, ডঃ মজুমদার তা সাধারণ জনকে অবহিত করেছেন এই পুস্তকের মাধ্যমে। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে ডঃ মজুমদারের এই পুস্তক একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

—**ডাঃ জে. বি. মুখার্জী**, এম. বি. বি. এস., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন), এফ. আর. সি. প্যাথ (লণ্ডন), ডি. এম. জে. (লণ্ডন), এফ. এ. এফ. এস-সি., এম. আই. এ. এফ. এম., কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ এবং ফরেনসিক অ্যাণ্ড স্টেট মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

● শুধু ভক্ষ্য আর অভক্ষ্যই নয়, পরিপাক, বিপাক এবং পুষ্টি সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যসমৃদ্ধ এই বইটি বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'সুখাসনে সুখাহার' বৈজ্ঞানিক তথ্যনিষ্ঠ অথচ অত্যন্ত সুখপাঠ্য একটি বই। লেখকের কৃতিত্ব এখানেই।...ডঃ রমেন মজুমদার চিকিৎসাবিজ্ঞানী না হয়েও চিকিৎসাবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি অনায়াসে সহজ সরলভাবে পরিবেশন করেছেন। এই সাফল্য রীতিমত বিস্ময়কর। সুস্বাস্থ্য-অভিলাষী প্রত্যেকেরই এই বইটি অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত।

—**ডাঃ রণবীর মুখোপাধ্যায়**, এম. এস., ডি. ও. এম. এস., পি-এইচ. ডি., কলকাতার ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু-বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

● খাদ্য মানুষের জীবনে অপরিহার্য। কিন্তু এই খাদ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান খুবই সীমিত। অসুস্থ অবস্থায় খাদ্যজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা যত বেশি তার চেয়ে অনেক বেশি

সুস্থ অবস্থায়। কারণ বইটি পড়লেই বোঝা যাবে।...ডঃ মজুমদার এই বইয়ে খাদ্যজ্ঞানের অনেক নতুন দিক তুলে ধরেছেন এবং খাদ্য বিষয়ে বহু প্রচলিত ভুল ধারণা নিরসন করেছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই বইটি পড়া খুবই প্রয়োজন, দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা উপকৃত হবেন। আবার, ডাক্তারদেরও এই বইটি বিশেষ করে পড়া দরকার, কেননা এই খাদ্যজ্ঞান বাস্তব জীবনে রোগীদের খাদ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্র দিতে তাঁদের খুবই সাহায্য করবে।

—**ডাঃ শ্যামলকুমার দে**, এম. বি. বি. এস., এফ. আর. সি. এস. (এডিনবরা ও গ্লাসগো),
ডি. এল. ও. (লণ্ডন), ডিপ্লোমা ইন মাইক্রো-ইয়ারসার্জারি (বোর্দো এবং হল্যাণ্ড),
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফেলো, কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের
নাক-কান-গলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

● ডঃ রমেন মজুমদারের 'সুখাসনে সুখাহার' বইটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়েছি। খাদ্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রায় 'সম্পূর্ণ পুস্তক' বাংলাভাষায় কেন, ইংরাজীতেও বিরল। লেখক খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধীয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যগুলি সংক্ষেপে ও মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মূল্যবান তথ্যগুলি সরল ও সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। ··· আমরা বাঙালীরা বোধ হয় সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন রোগে ভুগি। তার অন্যতম প্রধান কারণ, দেহ ও খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও কতকগুলি ভুল ধারণা। এই ভুল ধারণাগুলি বংশপরম্পরায় চলে আসছে। এমন কি, ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকের মনে এইসব ধারণা দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে রয়েছে। রমেনবাবু এ প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন।...বইটি বাঙালী পাঠকদের, বিশেষত যাঁরা এই বায়ুদূষিত, জলদূষিত ও শব্দদূষিত ঘনবসতিপূর্ণ বড় বড় শহরে বাস করেন তাঁদের বারবার পড়া উচিত, কেননা একবার পড়লে সব জিনিস মনে থাকবে না।... এম. বি. বি. এস. ডাক্তারী কোর্সে খাদ্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই পড়ানো হয় না। আমি দীর্ঘদিন বহু পুরাতন (ক্রনিক) রোগ ও রোগীর সংস্পর্শে এসে দেখেছি, খাদ্যের পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে দুরারোগ্য বহু রোগ সারাতে সহায়তা করে। কাজেই, এই বইটি আমার মতে বাঙালী ডাক্তারদেরও অবশ্য-পাঠ্য হওয়া উচিত।

—**ডাঃ গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায়**, এম. বি. বি. এস.,
এম. ডি. (জার্মানি), যোগীরাজ (হৃষীকেশ)

● ডঃ রমেন মজুমদারের 'সুখাসনে সুখাহার' বইটি থেকে অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র, বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে

সুষম খাদ্যের, বিশেষ করে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।...খাওয়ার জন্য যে বাঁচা নয়, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার জন্যই যে খাওয়া—এই সত্যটি তিনি উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়েছেন।...ডঃ মজুমদারের বইটি আমার মনে হয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্রদের এবং শিক্ষকদেরও বিশেষ সহায়ক হবে।

—**ডাঃ দুর্গাচরণ ঘোষ**, এম. ডি., এফ. আর. সি. পি. (লণ্ডন), এফ. সি. সি. পি. (ইউ. এস. এ.), কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের হৃদ্‌রোগ বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

● 'সুখাসনে সুখাহার' ডঃ রমেন মজুমদারের একটি সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পুস্তক, খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য বই। লেখক তাঁর পরিণত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বইটি লিখেছেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর বক্তব্য জোরাল করেছেন। আমরা ডাক্তাররাও এই বই থেকে অনেককিছু জানতে পারি।...বইটির নামকরণ সার্থক। আমিও বিশ্বাস করি, সুখাসনে সুখাহার না হলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় না।

—**ডাঃ সুনীলকুমার ঠাকুর**, এম. বি. বি. এস., এম. এস. (জেনারেল সার্জারি), এম. এস. (অর্থোপীডিক্স), প্রেসিডেন্সি সার্জন এবং কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের অস্থিরোগ বিভাগের অধ্যাপক

● আলোচ্য গ্রন্থটি খাদ্য সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বইটির নামও অর্থবহ। খাদ্যের উপাদান ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আধুনিক তথ্য নির্ভর করে লেখক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সাধারণ মানুষের অজানা অনেক তথ্যও দিয়েছেন। প্রতিটি বিষয়ের ইতিহাস এবং বিজ্ঞান ভালোভাবে আলোচনা করেছেন।...গ্রন্থটির প্রচার বাঞ্ছনীয়।

—**ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**, এম. বি., ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের হেলথ এডুকেশন অ্যাণ্ড হেলথ ডে সাব-কমিটির আহ্বায়ক

● আপনি যদি আর কিছু না-ও লেখেন, আমার বিশ্বাস, এই বইটির জন্য বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে আপনার আসন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। অনেক তথ্য দিয়েছেন, অনেক তত্ত্ব কথার রেফারেন্স দিয়েছেন অথচ সাধারণ পাঠকের বুঝতে কোথাও অসুবিধা হয় নি। একটা বহতা নদীর মত আপনার ভাবনাচিন্তা সাবলীল ভঙ্গিতে আমাদের সাধারণের ভাবনাচিন্তার তীর ছুঁয়ে গেছে। এখানেই আপনার সার্থকতা।...শুধু সাধারণের জন্য

এই বই নয়, এই বই চিকিৎসক, চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রছাত্রী, হোম সায়েন্স ও নিউট্রিশন-বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী এবং ফিজিওলজির ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই। আচার্য সত্যেন বসুর উত্তরসূরী হিসেবে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে আপনার এই অবদানের জন্য আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

—**ডাঃ শ্যামাপদ রায়চৌধুরী,** লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অভ ট্রপিক্যাল মেডিসিন
অ্যাণ্ড হাইজিনের প্রাক্তন ফেলো, অ্যামেরিকান কলেজ অভ চেস্ট
ফিজিশিয়ান্সের প্রাক্তন সদস্য, কলকাতার স্কুল অভ
ট্রপিক্যাল মেডিসিনের প্রাক্তন
রিসার্চ ফেলো

১৯৮৯ সালের মে মাসে কায়রোয় রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্ব খাদ্য পরিষদের এক অধিবেশনে বলা হয়, গোটা পৃথিবীতে আজ প্রতি দশজনের মধ্যে অন্তত একজন অনাহারে দিন কাটায়। পরিষদের সভাপতি এডুয়ার্ডো প্রেসকোয়েইরা বলেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন ৫২০ কোটি, তার মধ্যে ৫৫ কোটিকে এই ১৯৮৯ সালের শেষে অনাহারে থাকতে হবে। ১৯৮৫ সালের চেয়ে এই সংখ্যা চার কোটি বেশি। অর্থাৎ, পৃথিবীতে অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এশিয়া, আফ্রিকা আর লাতিন অ্যামেরিকার বহুদেশেরই আজ অন্যতম প্রধান সমস্যা খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি।

পঞ্চাশ বছর আগেও আমাদের দেশে চাল ছিল আড়াই টাকা মন, মাছ বিকোত আট আনা থেকে বার আনা সের, খাঁটি দুধ মিলত টাকায় পাঁচ থেকে ছ সের—আর চার-ছ আনার তরিতরকারিতে গোটা পরিবারের প্রয়োজন মিটে যেত। তখন জমির ফলন ছিল ভালো, জনসংখ্যার চাপ ছিল কম। তবু তখনও অনেক লোক অর্ধাহারে অনাহারে থাকত, অপুষ্টিতে ভুগত।

অর্ধ শতাব্দীকাল পরে এখন খাদ্যসামগ্রীর দাম বেড়েছে ৪০ থেকে ৫০ গুণ, জনসংখ্যার চাপে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম—কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে জমিতে ফলন বেড়েছে অনেক, একফসলী জমি হয়েছে দোফসলী তেফসলী। এখন অনাহারে মানুষ মরে না। কিন্তু প্রায় সেই আগেরই মতো কোটি কোটি লোক পুষ্টিহীনতায় ভোগে।

খাদ্য সহজলভ্য হলেই অপুষ্টি দূর হয় না। শুধু অ্যামেরিকা নয়, পশ্চিমের অনেক দেশেই এখন খাদ্য সহজলভ্য, কিন্তু সেখানে অপুষ্টির দাপটও প্রবল।



ডঃ রমেন মজুমদার। জন্ম বিহারের কাটিহার শহরে। শিক্ষা প্রথমে কাটিহারে, তারপর কাটিহারের কাছে মণিহারীতে, তারপর আবার কাটিহারে। শেষে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেছেন পি-এইচ. ডি.।
কর্মজীবনের সূচনাপর্বে ছিলেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে। দীর্ঘদিন যুগান্তর পত্রিকার প্রধান সহ-সম্পাদক। যুগান্তরে যখন পৃথক বিজ্ঞানবিভাগ ছিল তখন তিনি তার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন।
পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরেছেন—কখনও সরকারী আমন্ত্রণে সরকারী অতিথি হিসাবে, আবার কখনও কর্মোপলক্ষে। পূর্ব ও পশ্চিমের কয়েকটি দেশে সাংবাদিক হিসাবে কাজও করেছেন। আধুনিক বাংলা লোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নাম অগ্রগণ্য। দীর্ঘকাল ধরে তিনি লোকবিজ্ঞানের প্রসার ও প্রচার অভিযানের সঙ্গে যুক্ত। পঁচিশ বছরের উপর বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তিনি লিখছেন। স্বরচিত ও অনূদিত গ্রন্থ আর পত্রপত্রিকার ক্ষেত্র ছাড়াও বেতারে ও দূরদর্শনে সুপরিচিত।